গ্রন্থাগার

ত্রয়োদশ খণ্ড : ১৩৭০

: সম্পাদক :

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : কলিকাতা-১২

সাময়িক কার্যালয় : ৩৩, হুজুরীমল লেন : কলিকাতা-১৪

গ্রন্থাগার

নির্ঘণ্ট : ত্রয়োদশ খণ্ড : ১৩৭০

নির্ঘণ্টটি তিন অংশে বিন্যস্ত :—

১ম অংশ : **লেখক-আখ্যাসূচী :** বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম, আখ্যা প্রভৃতি পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ নির্দেশিত। বিন্যাস অভিধানিক তালিকা পর্যায়ের।

২য় অংশ : **বিষয় সূচী :** নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধ বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ।

৩য় অংশ : **বিভাগসূচী :** গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়মিত বিভাগের প্রকাশিত নিবন্ধ ও সংবাদ বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত, যথা—গ্রন্থাগার সংবাদ, গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, চিত্রসূচী, পরিষদ কথা, বার্তা বিচিত্রা, সম্পাদকীয়।

সর্বত্র সংশ্লিষ্ট সংলেখের পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশিত।

এই সূচীটি সংকলন করেছেন পরিষদ সদস্য, শ্রীকুমুদনাথ দত্ত

লেখক—আখ্যাসূচী

বিষয় সূচী

বিভাগ সূচী

গ্রন্থাগার সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ-জেলাভিত্তিক

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ

গ্রন্থসমালোচনা

চিত্রসূচী

পরিষদ কথা

বার্তা বিচিত্রা

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

ত্রয়োদশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

ত্রয়োদশ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৩৭০ [দ্বিতীয় সংখ্যা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়ার নেশা

নানা-ঘটনা-সংস্থানে চারপাশে বই নিয়ে আমার জীবন গড়ে উঠেছে। ছোট ঘরের সংকীর্ণ তক্তপোশের অর্ধেকটা এখনো বই দিয়ে ভরা থাকে। কখনো কখনো শুধু পুস্তকের সান্নিধ্যটাই অনেকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলতে দ্বিধা নেই, এককালে এটা কিছু আত্মতৃপ্তি দিত। কিন্তু আজকাল মোহ দূর হয়ে গেছে। সিনেমা, সংগীত, চিত্রকলা বা ফুটবল খেলা থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার চেয়ে বই পড়ার আনন্দ বেশী মর্যাদা পাবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ দেখতে পাইনে।

অবশ্য আনন্দের আগে আছে প্রয়োজন। আজকাল বই ও সংবাদপত্রের সাহায্য ছাড়া জীবন চলা দায়। সভ্যতার অনেকগুলি ধাপ পার হয়ে আমরা এসে পৌঁছেছি কাগজ বা পুস্তকের যুগে। সাহিত্য পাঠের আনন্দ কিংবা বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চার কথা বাদ দিলেও, দৈনন্দিন জীবনে বই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পূর্বে ছিল গুরুবাদ ; গুরুরা ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞানের নির্মম পুঁজিপতি। তাঁদের হাতে-পায়ে ধরে শিষ্যবৃন্দ ছিঁটে-ফোটা জ্ঞান লাভ করতেন। গুরুকে যে কোনো উপায়ে তুষ্ট করা ছাড়া পথ ছিল না। গুরুগৃহে শিক্ষার্থীরা থাকত অনেকটা আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো। ঘরঝাট দেওয়া, জল আনা, গরু রাখা এবং গুরুর পা টিপে দেওয়া প্রভৃতি ছাড়াও শিক্ষা শেষে গুরু দক্ষিণার দাবীটা ছিল আরো কঠিন। একলব্যের মতো শুধু আঙুল কেটে দিলেই যথেষ্ট হতো না, প্রস্তুত থাকতে হতো মাথা দেবার জন্যেও। কিন্তু এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেও সকলের পক্ষে গুরুর চরণে আশ্রয় পাওয়া সহজ ছিল না। শিষ্য হিসেবে কাউকে গ্রহণ করা না করা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করত গুরুর ইচ্ছার উপর। এই খেয়ালী মেজাজের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। এক ঋষি তাঁর ব্রাহ্মণী স্ত্রীর ছেলেদের যথারীতি পড়াতে আরম্ভ করলেন ; কিন্তু তাঁর শূদ্রাণী পত্নীর গর্ভজাত ছেলে যখন

পড়তে এলো তখন তাকে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ফিরিয়ে দিলেন। অভিমানী বালক মার কাছে ফিরে এসে কঠোর সংকল্প নিয়ে নিজের চেষ্টায় সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করল এবং ঋগ্বেদের উপর সবচেয়ে বিখ্যাত টীকা লিখল 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'। শূদ্রা বা ইতরার ছেলে বলে একদিন যে তিনি উপেক্ষিত হয়েছিলেন 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' নামের মধ্যে সেই অভিমানটুকু চিরস্থায়ী করে রেখেছেন। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে গুরুদেবদের ক্যাপিটালিষ্ট মনোবৃত্তির জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্থীও অনেক সময় অধ্যয়নের সুযোগ পেত না।

প্রাচীনকালে বই ছিল না বলেই এমনটা সম্ভব হতো। তালপাতার পুঁথি প্রচলিত হবার পরও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। একে তো লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাছাড়া নিজেদের প্রভাব কমে যাবার আশংকায় পুঁথির প্রচলন করতে গুরুরা চাইতেন না। য়ুরোপে তো প্রথম দিকে বইগুলো মঠের গ্রন্থাগারে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো, যাতে কেউ বাইরে নিয়ে নকল করে প্রচার করতে না পারে। প্রাচীনকালের কথা নাইবা বললাম কয়েক শতাব্দী পূর্বেও রঘুনন্দন মিথিলা থেকে গুরুকে এড়িয়ে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে বাঙলা দেশে নিয়ে এসেছিলেন। নকল করে আনবার অনুমতি পাওয়া যায় নি। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পারলেই গুরু তাঁর সম্পূর্ণ বিদ্যা গোপনীয়তার শপথ করিয়ে প্রিয়তম শিষ্যকে দিয়ে যেতেন। এমনি করেই যুগ যুগ ধরে গোপনীয়তা রক্ষিত হয়ে এসেছে। কিন্তু মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে এলো নতুন যুগের সূচনা। জ্ঞানের রাজ্যে গণতন্ত্র নিয়ে এলো বই।

যে জ্ঞানের ভাণ্ডার আবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের মধ্যে, আজ সকলের জন্য তার দ্বার মুক্ত হয়েছে। আর সব চেয়ে বড় কথা জ্ঞান বর্তমানে আর্থিক বিনিময়ের সহজ পর্যায়ে অনেকটা নেমে এসেছে। আগে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হতো গুরুর উপর। টাকা দিয়ে বই পাওয়া যায়, শিক্ষকের সাহায্য পাওয়াও স্বাভাবিক। গুরুর বাড়ীতে রাখাল হয়ে থাকবার প্রস্তাব তো দূরের কথা, আজকাল কোন অধ্যাপক ছাত্রকে বলবার কল্পনাও করতে পারেন না যে, লাইনে দাঁড়িয়ে আমার রেশনটা এনে দাও, তার বদলে লজিকটা বুঝিয়ে দেব। ছাত্ররা আগের মতো শিক্ষককে সমীহ করে চলে না। ক্লাশে পড়া না শুনে নিশ্চিন্ত মনে গল্প করে। কারণ জানে শিক্ষকের সাহায্য অপরিহার্য নয়। বই পড়ে নিজেই জেনে নিতে পারবে। না পারে তো পরীক্ষায় অভিধানের কিম্বা টিউটরের সাহায্য নিলেই চলবে। ভবিষ্যতে শিক্ষকের মর্যাদা আরো কমে গেলে আশ্চর্যের কিছু নেই। যারা মেধাবী ছাত্র তারা নিজেরাই বই পড়ে বুঝতে পারে, আর যারা মেধাহীন তারা না বুঝে নোট মুখস্ত করে পরীক্ষা পাশের আপাতত প্রয়োজনটা মিটিয়ে নিতে পারে। সুতরাং শিক্ষকের আবশ্যক কি? প্রয়োজনের সঙ্গে শ্রদ্ধার মাত্রাও কমে আসছে।

তবুও এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক প্রভৃতি যাঁরা লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা আজও একটু বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন। এটা পুরনো

সংস্কারের অবশেষ ছাড়া কিছু নয়। লিপি আবিষ্কারের পরই সকল দেশে তাকে ধর্ম সাধনার সহায়করূপে ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষের প্রথম রচিত গ্রন্থগুলি ধর্মসম্বন্ধীয়। বইগুলি সযত্নে রাখা হতো মঠ ও মন্দিরে। জনসাধারণ এসব ধর্ম পুস্তকের পাঠ শুনতে আসত চণ্ডীমণ্ডপে এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানে। দেবনাগরী, দেবভাষা প্রভৃতি নাম ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক দ্যোতক। প্রাচীন মিশরীয়দের চিত্রলিপি হায়রোগ্লিফিক 'Hieroglyphic'-এর গোড়ার অর্থও হলো "Sacred carving" লেখক ও পাঠকরা সবাই ছিলেন ঈশ্বরভক্ত ধর্মসাধক। সুতরাং জনসাধারণের শ্রদ্ধালাভ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ধর্ম থেকে বিযুক্ত হলেও বই ও বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক আছে, তাঁদের প্রতি সম্মানটা এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

যোগ্য হলে নিশ্চয়ই তাঁরা সম্মান পাবেন। বই সমাজের কতটা উপকার করেছে তা বিচার করলে বোঝা যাবে একে কেন্দ্র করে যাঁরা আছেন তাঁরা এখনো বিশেষ সম্মানের যোগ্য কি না। এককালে পৃথিবী ছিল পুস্তকহীন; বর্তমানে সাময়িক পত্রিকা বাদ দিয়ে বিভিন্ন ভাষায় অন্তত পোনে দু'লক্ষ বই (টাইটেল) প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয়। কত লক্ষ লক্ষ লোক পড়ছে এসব বই। গ্রেট বৃটেনের কথাই ধরা যাক। এখানে শুধু লাইব্রেরী থেকে বার্ষিক প্রায় বত্রিশ কোটি বই পড়বার জন্য ধার দেওয়া হয়। এগুলো কিনে পড়তে হলে দাম লাগত দু'শ দশ কোটি টাকা। অন্য দেশ এখনো এতটা বই পাগল হয়নি। কিন্তু শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র বইএর চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এত বই পড়েও কি আমরা বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের সন্ধান পেয়েছি। তিন হাজার বছর আগে যে সুখ ও শান্তি ছিল না, আজ কি তা এসেছে আমাদের জীবনে? ক্ষুধা, মড়ক ও যুদ্ধকে দূর করা আজও সম্ভব হয় নি। হবে যে, এমন ইঙ্গিতও চোখে পড়ে না। বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক জীবনে প্রকৃত মহৎ বিপ্লব নবযুগের শুভ সূচনা করেনি এখনো। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বই গৌণ; হাতে-কলমে পরীক্ষাটাই মুখ্য। তবে বই পড়ে কি হয়? কেন তার এত সম্মান?

আপনার মতো আমিও পুস্তক পাঠের শতেক গুণ দেখিয়ে জবাব দিতে পারি। শুধু তাই নয়, বিশ্বাসও করতাম কিন্তু সে বিশ্বাস ক্রমশ শ্লথ হয়ে আসছে। এত ভালো বই আছে, ইতিহাসের শিক্ষা আছে, তবু কি সত্যকে চিনতে পেরেছি? ক্রুশবিদ্ধ করবার পর যীশুখৃষ্টকে আমরা স্বীকার করেছি ঈশ্বরের পুত্র বলে। আবার জোয়ানকে পুড়িয়ে মেরে সেণ্টদের দলভুক্ত করা হয়েছে। এমন দুটো জাজ্জল্যমান ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থাকা সত্তেও গান্ধীজীকে আমাদের হাতে প্রাণ হারাতে হলো। ভালো বইয়ের পৃষ্ঠায় বন্দী মহৎ আদর্শগুলি নিরুপায় সাক্ষী হয়ে রইল। নিষ্ঠুর নির্বুদ্ধিতা থেকে আমাদের বাঁচাতে পারল কই?

গান্ধীজীর জীবন যত বড়ই হোক, তাঁর মৃত্যু অন্ততঃ এক দিক থেকে অনন্য-

পূর্ব। আর কোন মৃত্যু পৃথিবীর সর্বত্র এমন শোকোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করতে পারে নি। শালবনের নিভৃতে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর। চারপাশে ক্রুদ্ধ জনতার উল্লাসধ্বনি শুনতে শুনতে যীশু পরলোকগমন করেছিলেন। লাঞ্ছনার ভয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁর বন্ধুরাও সামনে এগিয়ে যেতে পারে নি। পায়ে হেঁটে মন্থরগতিতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। সুতরাং মহতের মৃত্যু হৃদয় পরিবর্তনের যে সুযোগ আনে, সেকালে তা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদ কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিজ্ঞানের সাহায্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। বই, সংবাদপত্র, রেডিও, ফিল্ম প্রভৃতি আগেই তাঁর নামকে পরিচিত করে পটভূমিকা তৈরী করেছে। তাই আশা করেছিলাম যে বেদনা অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর হৃদয়কে এক করেছে, তারই সাহায্যে এক মহৎ আদর্শ গোড়াপত্তনের সুযাগ আসবে; গান্ধীজীর জীবনবেদ পথ দেখাবে আমাদের। বই ও সংবাদপত্রের সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যে তাঁর আদর্শ প্রচারের যতটা সুযোগ পেয়েছে আর কোন মহাপুরুষই তা পান নি। কিন্তু এতে ফল কিছুই হলো না। চেস্টারটন এক জায়গায় বলেছেন যে, বর্তমান যুগে আমরা অতীতের মতো ঢিল ছুঁড়ে মহাপুরুষদের হত্যা করি না; গোলাপ ফুলের তোড়ার নীচে চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে মারি। প্রশংসার গোলাপ ফুল আজকাল ফোটে বইয়ের পৃষ্ঠায়। গান্ধীজীকে আমরা বুঝতে চাইনি, চাইনি গ্রহণ করতে; তাকে ভাসিয়ে দিয়েছি প্রশস্তির বন্যায়।

শোপনহাওয়ার সম্বন্ধে এক গল্প আছে। তিনি হোটেলে গিয়ে প্রত্যহ একটি স্বর্ণ মুদ্রা টেবিলের উপর রেখে খেতে বসতেন। ওয়েটার ভাবত ভালো করে খাওয়ালে বুঝি ঐ মুদ্রাটি পুরস্কার পাবে। কিন্তু রোজই শোপনহাওয়ার ওটি পকেটে ফেলে চলে যান। কৌতূহল দমন করতে না পেরে ওয়েটার একদিন প্রশ্ন করল যে, রোজ স্বর্ণ মুদ্রার লোভ দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে নেবার কী অর্থ? দার্শনিক জবাব দিলেন, আমার চারপাশের টেবিলে যে সব লোক খেতে বসে তারা যেদিন কুকুর, ঘোড়া ও মেয়েদের সম্বন্ধে কথা না বলে কোনো গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে শুনতে পাব সেদিন এই মোহরটি ভিখারীদের দিয়ে দেব।" শোপনহাওয়ার স্বর্ণ মুদ্রাটি বিলিয়ে দেবার সুযোগ পাননি। আজকে সে সুযোগ আরও সুদূর পরাহত। কোন গভীর বিষয় উপলব্ধি করবার মতো মানসিক স্থৈর্যের অভাব ঘটেছে। সমাজে চলতে গেলে পৃথিবীর সব খবরই রাখা চাই। খেলাধুলো, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম সব বিষয়েরই কিছু কিছু খবর না রাখলে সাধারণ আলাপ আলোচনাও চলতে পারে না। একালের কালচার মনকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার মধ্যে, সকল বিষয়ে দু' একটা কথা বলবার ক্ষমতা থাকা চাই; না হলে লোকে আপনার শিক্ষায় সন্দেহ প্রকাশ করবে। যিনি সাহিত্যের চর্চা করেন, তাদের শুধু সাহিত্যের খবর রাখলেই চলবে না, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট খেলা, কোরিয়ার যুদ্ধ, পিকাসোর শিল্পনীতি,

ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক সংক্রামক ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফরাসী মন্ত্রীসভা, খাদ্যশস্যের পরিসংখ্যান প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে দু' চারটে মন্তব্য করবার মতো পটভূমিকা না থাকলে অবজ্ঞার পাত্র হওয়াই সম্ভব। বিজ্ঞান পৃথিবীকে ছোট করে দিয়েছে; বইয়ের মারফৎ টেবিলের উপর সংগৃহীত হয়েছে দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার কিন্তু এদের সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই। বিজ্ঞান নানাবিষয়ের উন্নতি করলেও আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেনি। পূর্বে যে মস্তিষ্কের সাহায্যে স্বল্প পরিধির মধ্যে দু একটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর হতো আজ তাকে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুচ্ছ ও অমূল্য সকল প্রকার জ্ঞান আয়ত্ত করতে চাই। সুতরাং আমরা সব কিছুর উপর চোখ বুলিয়ে যাই, মন বুলাতে পারি না। পারি না গভীর বস্তুকে আয়ত্ত করতে। গোয়েন্দা কাহিনী ও রম্য রচনা তাই এ যুগের বিশেষ সৃষ্টি।

চীনা দার্শনিক তাওয়াই বলেছেন, অন্যকে যে জানে সে চতুর, নিজেকে যে জানে সে জ্ঞানী। বইয়ের যুগ আমাদের চতুর করেছে; অন্যকে জানবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা স্মার্ট হয়েছি; কিন্তু নিজেদের চেনা হয়নি। সকাল বেলায় খবরের কাগজের সম্পাদকীয় থেকে রাত্রিতে রেডিয়োর শেষ সংবাদ পরিবেশন পর্যন্ত কেবলই অপরের মতামতের বন্যায় হাবুডুবু খাই। নিজেকে নিয়ে একটু একা থাকবার সুযোগ নেই; একটা জিনিস যে মনের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া করে দেখব তেমন ফুরসৎ আর কোথায়? বই ও পত্রিকা চারদিক থেকে এসে অপরের চিন্তা ভাবনাগুলি আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়। পৃথিবীর কোন সমস্যাকে নিজের মতো করে ভেবে দেখবার অবসর পাওয়া যায় না। নিজেকে চিনবার চেষ্টা তো দূরের কথা, মনের বিশিষ্ট কাঠামোটি রক্ষা করাই মুশকিল। একই বিষয়ে কত বিভিন্ন মত এবং প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞের ছাপ মারা। এর কোনটি গ্রহণযোগ্য, কোনটি নয়? চিন্তারাজ্যের এই 'টাওয়ার অব ব্যাবেল' অরাজকতার সৃষ্টি করেছে। পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা তুলে দিয়ে খানিকটা নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা সম্ভব হলে আমাদের হয়তো মঙ্গলই হবে। শস্যের চাষ করতে আগাছা তো উপড়ে ফেলতেই হয়।

জীবনের গভীর উপলব্ধির জন্য বই অপরিহার্য নয়। এশিয়ার অনেক মহাপুরুষ ছিলেন নিরক্ষর। তাঁরা জগতকে দেখেছেন প্রত্যক্ষরূপে, বইয়ের জানালা দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেননি। উপলব্ধি যেখানে সত্য, প্রকাশ সেখানে হয় সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত। গীতা, বাইবেল, কোরানের মতো এক একটি গ্রন্থে যুগ যুগান্তের সত্যোপলব্ধি মূর্ত হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ বইয়ের পৃষ্ঠায় এক কথাকেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে সত্যানুভূতির অভাবটা ঢাকতে চেষ্টা করি এখন। সত্য যদি কোথাও থাকে তাও অনাবশ্যক বহু ভাষণের ফলে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না: এক রাজা মানুষের ইতিহাস জানতে চাওয়ায় ঋষিকল্প সভাপণ্ডিত পাঁচশ, খণ্ডের বই এনে হাজির করলেন। রাজা শাসনকার্যে ব্যস্ত,

এত বড় বই থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর জানবার সময় নেই। বললেন বই সংক্ষেপ করে আনুন। বিশ বৎসর পরে পণ্ডিত আবার এলেন পাঁচশ'র পরিবর্তে পঞ্চাশ খণ্ড বই নিয়ে। রাজা তখন বৃদ্ধ বড় বড় বই পড়বার শক্তি নেই। অনুরোধ করলে আরো সংক্ষেপ করে আনতে। আবার বিশবছর কেটে গেল; পণ্ডিত এবার মাত্র এক খণ্ড বই হাতে করে এলেন কিন্তু রাজা তখন মৃত্যু শয্যায়, এক পৃষ্ঠা পড়াও অসম্ভব। পণ্ডিত এই দেখে একটি বাক্যে মানুষের ইতিহাস রাজাকে শুনিয়ে দিলেন : He (man) was born, he suffered, and he died. বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করেছে; তাই পাঁচশ' খণ্ডের বই এক লাইনে সংক্ষেপ করতে পেরেছিলেন। আর এ-যুগে মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্য পেয়ে এক লাইনের বক্তব্য পাঁচশ' বইয়ে ফেঁপে ওঠে।

বই পড়াকে মোটামোটি দুভাগে ভাগ করা যায় প্রথমত, প্রয়োজনের পড়াটা হলো এ যুগের বৈশিষ্ট্য। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্যই বই দরকার। গুরুবাদ উঠে গেছে, সে জায়গায় এসেছে বই। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, মিস্ত্রি, কারুশিল্পী সবার কাছে আজ বইয়ের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে উঠছে। ইলেকট্রিসিটি, ট্রেন, জলের কল ইত্যাদি ছাড়া আজকাল আমাদের যেমন চলে না, বই তেমনি হয়ে উঠেছে জীবনের অত্যাবশ্যক অংগ। প্রয়োজনের তাগিদে যে কাজ করা হয়, তার জন্য তো সম্মান দেখাবার প্রশ্ন ওঠে না।

আর এক শ্রেণীর পাঠক প্রয়োজনের চাহিদা মিটাবার পরও বই পড়ে। খেয়াল খুশি মতো মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টানো কিংবা দু-একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাস পড়বার কথা বলছি না। বই না হলে যাদের চলে না, পড়াটা যাদের কাছে আনন্দের উৎস,—বলছি তাদের কথা। এ ধরণের পাঠকের সংখ্যা সব দেশেই কম। বৃটেন পাবলিক লাইব্রেরীর কল্যাণে বিনা চাঁদায় যে কেউ বই পড়তে পারে। কাছে লাইব্রেরী না থাকলে দরজার গোড়ায় মোটর ভ্যানে করে চলমান গ্রন্থাগার চলে আসে। এত সুবিধা সত্বেও জনসংখ্যার শতকরা পঁচিশ জনের বেশী নিয়মিত ভাবে লাইব্রেরীর সুযোগ গ্রহণ করে না। কয়েকমাস পূর্বে স্যাটারডে রিভিয়ু পত্রিকায় এক প্রবন্ধেও দুঃখ করে বলা হয়েছে যে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারগুলির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, কিন্তু সেই অনুপাতে বই পড়বার আগ্রহ দেখা যায় না। না যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবার পরও নিয়মিত বই পড়াকে নেশা বলা যায়। নেশা কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় এবং নেশা প্রধানত ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে বলে সকলের এক নেশা হবে, তাও বলা চলে না। তাস খেলা, সিনেমা দেখা প্রভৃতি আর পাঁচটা নেশার মত বই পড়বার আনন্দ শুধু একাংশের মন আবিষ্ট করতে পারে।

বই পড়তে ভালো লাগে, সময় পেলে বই নিয়ে বসি। বই পড়ে সংসারের কোনো উপকার করেছি এমন মিথ্যা অহংকার আমাদের নেই। নিজেরও উপকার

করি না; শধ্ আনন্দ পাই। কিন্তু এ আনন্দ নেহাৎ ব্যক্তিগত অনুভূতি। সুতরাং একমাত্র বই পড়বার জন্য কারো সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিসদৃশ ঠেকে। আমরা ডক্টরেট থিসিসের জন্য সংকীর্ণ গন্ডীর নির্দিষ্ট ধারায় অধ্যয়ন করি না। রোজই পড়ি, কিন্তু পড়ায় আছে অবাধ স্বাধীনতা। আজ যদি পড়ি মেয়েদের পোশাকের ইতিহাস, কাল পড়ব এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংএর প্রিয় কুকুর ফ্লাশের জীবনী। পরশ্ব সকালে তুলে নেব রাশিয়ান দর্শনের ইতিহাস, আর বিকেলে খ্লে বসব হাওয়াই দ্বীপের উপকথা। পড়ে হজম করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বই রাখবার আনন্দটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। একালের অগ্ন্তি হাল্কা সাহিত্য আমাদের জন্যই বুঝি সৃষ্টি হয়েছে। বইখোর আমরা কাগজ যুগের প্রোডাক্ট। বইয়ের সাহায্যে ঘরের কোণে বসে আমরা দেশ দেশান্তর ঘুরে আসি; মানুষের হৃদয় অরণ্যে প্রবেশ করি; বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও ভূত ভবিষ্যৎ নখদর্পণে প্রতিফলিত করি। এই আমাদের বিলাস, এই আমাদের আনন্দ।

অন্যান্য অনেক নেশার খোরাক যোগাবার জন্য নিয়ম-নির্দিষ্ট পথ আছে। আমাদের জন্য কিন্তু এখনো তেমন কোন ব্যবস্থা হয়নি। অন্ততঃ এদেশে নয়। হয়তো লাইব্রেরীর কথ তুলবেন। কিন্তু লাইব্রেরীর গোড়ার কথা আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, এর সৃষ্টি হয়েছে জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে; নেশা-খোরের উপকরণ যোগানো মোটেই এর উদ্দেশ্য নয়। বিলেতে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে যে, সাধারণের অর্থ দিয়ে নাটক নভেল লাইব্রেরির জন্য কেনা উচিত কি না। একদল বলেছে যে সবাই তো বই পড়ে আনন্দ পায় না; কারো ভালো লাগে খেলা, কারো বা সিনেমা। শ'র পিগমিলিয়ান বইটি কিনে কর্তৃপক্ষ যদি কয়েকজনের আনন্দবিধানের ব্যবস্থা করেন তাহলে যারা সিনেমা ভালবাসে তাদের জন্য পিগমিলিয়ান ফিল্মটি দেখানো হবে না কেন? সভ্য সমাজের রীতি বিরুদ্ধ না হলে সব আনন্দের মূল্যই তো এক। তাহলে পক্ষপাতিত্ব করা হবে কেন? যুক্তিটা উড়িয়ে দেবার নয়।

লন্ডনের বইখোরদের সুযোগ সুবিধার বহর দেখে ঈর্ষা হয়। বিনা চাঁদার লাইব্রেরী জলের মত সমস্ত দেশটা ঢেকে রেখেছে তবু যাদের পড়ার নেশা আছে তাদের পক্ষে এগুলো যথেষ্ট নয়। নেশাখোরদের উপকরণ যোগায় কমার্শিয়াল লাইব্রেরীগুলি। এরা চাঁদা নিয়ে বই দেয়, তাই ফ্রী পাবলিক লাইব্রেরী থেকে পার্থক্য বোঝবার জন্য 'কমার্শিয়াল' কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এরা পাবলিক লাইব্রেরীর চেয়ে পাঠকদের সন্তুষ্টির জন্য বেশী মনোযোগ দেয়। অথচ তুলনায় চাঁদা খুবই কম। বছরে ষোল টাকা চাঁদা দিয়ে অনধিক সাড়ে দশ শিলিং দামের যে কোনো উপন্যাস এবং একুশ শিলিং দামের অন্য যে কোনো বই একবার একখানা করে পড়বার জন্য পেতে পারেন। পড়ে শেষ করতে পারলে দৈনিক একখানা করে বই ধার করতেও বাধা নেই। নতুন বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই

এসব লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। আর একটি লোভনীয় সুযোগ পাওয়া যায় এদের "গ্যারান্টিড সার্ভিস" অর্থাৎ, বছরে পঁয়তাল্লিশ টাকার মত চাঁদা দিলে কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর যে কোনো বই সংগ্রহ করে দেবে। যদি স্টকে না থাকে, তাহলেও দু একদিনের মধ্যে যে করে হোক দাবী মিটবে আপনার। অবশ্য বইএর দাম একুশ শিলিংএর মধ্যে হওয়া চাই। এমনি আরও অনেক রকম সুবিধা চাঁদা দাতারা পেতে পারে। লণ্ডনে অসংখ্য কমার্শিয়াল লাইব্রেরী আছে। শহরের বাইরেও এদের শাখা রয়েছে। গ্রামে চাঁদার হার অপেক্ষাকৃত কম। পরস্পরের মধ্যে ব্যবসায় সুলভ প্রতিযোগিতা থাকে বলে পাঠকেরা লাভবান হয়।

কলকাতার পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলে কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর কয়েকটি শোচনীয় অনুকরণ দেখেছি। বলা বাহুল্য, নিত্য নতুন বইয়ের দাবী মেটানো এদের শক্তির বাইরে। আমাদের জন্য এত বই প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিকে সেগুলো হাতে পোঁছে দেবার মতো কোন প্রতিষ্ঠান নেই। সাধারণ পাঠকের পক্ষে পড়বার উপযুক্ত একটি বই সংগ্রহ করা যে কী কঠিন, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। খোরাক জোটে না বলে অনেককেই বই পড়া ছেড়ে দিতে হয়। স্বধর্মীদের ধর্ম ত্যাগের বেদনাদায়ক দৃশ্য অনেক দেখেছি। প্রায়ই চোখে পড়ে বই পাওয়া যায় না বলে কত উদীয়মান বইখোর শেষ পর্যন্ত তাস পাশার আড্ডায় কিংব ফুটবল ক্রিকেটের মাঠে ভিড়ে পড়ে।

বই যাঁদের কাছে নিছক আনন্দের উৎস, এই বিপদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসবের (১৯৬৩) স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত]

"বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে, অতলস্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!"

—রবীন্দ্রনাথ

সুনীলবিহারী ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থপঞ্জী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থাগারের" ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীসৌরেন গাঙ্গুলীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে, ঐ কাগজের মাধ্যমে 'বিবলিওগ্রাফি' বা 'গ্রন্থপঞ্জী' শব্দটি আমাদের খুব ঘরোয়া হয়ে গেছে। ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট পাওয়া কিছু ছাত্রছাত্রী হাতে স্লিপ অভাবে কার্ড, কলম অভাবে পেন্সিল নিয়ে গ্রন্থপঞ্জী-আহরণে মেতে উঠেছেন। খুবই আশার কথা, আনন্দের বিষয় যে ছেলেমেয়েরা এ কাজে দিনের পর দিন কুশলী হয়ে উঠছেন। নিকট ভবিষ্যতে এঁদের ভেতর থেকে ব্রজেন বাঁড়ুজ্জে, পুলিন সেন, প্রভাত মুখুজ্জে গণ্ডায় গণ্ডায় বের হবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

আসুন, আমরা আজ একটা গ্রন্থপঞ্জী (কাজের সুবিধার জন্যে লেখক গ্রন্থপঞ্জী) সংকলনে হাত দি। কার গ্রন্থপঞ্জী করা যায় যায়? রবীন্দ্রনাথ?—না, ওঁর গ্রন্থপঞ্জী অনেকে করছেন। এ বছর যাঁর শততম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে, সেই বীর সৈনিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের একটা গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করলে মন্দ হয় না। 'স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থপঞ্জী' কথাটার মানে হ'ল—(১) স্বামীজী রচিত বই, ও তথ্য অনুবাদ সংকলন ইত্যাদির তালিকা। (২) স্বামীজী সম্পর্কিত বই ইত্যাদির তালিকা। কেবল বই নয়, নানাদেশের নানাভাষার পত্র পত্রিকা ও খবরের কাগজে স্বামীজীর বাণী, স্বামীজীর চিন্তাভাবনা এবং স্বামীজীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আলোচনা ছড়িয়ে আছে। সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জীতে ঐগুলোকেও ধরতে হবে।

প্রথমে উপকরণ ঠিক করা যাক। ৫"×৩" কার্ড ক্যাটালগের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর কাজে স্লিপ বেশী সুবিধার হয়। গ্রন্থপঞ্জীর প্রকৃতিভেদে স্লিপ ছোট বড়ো হতে পারে। যদি গ্রন্থপঞ্জীটিকে সটীক ও বর্ণনামূলক করতে চান তবে আকারের স্লিপ নেওয়াই সুবিধাজনক। স্লিপ যদি রুলটানা হয় তবে তো একেবারে পোয়াবারো। কিছু স্লিপ সব সময় আপনার পকেটে, ব্যাগে, থলি বা ঝুলিতে রেখে দেবেন। যতোই কাজ এগোবে, ততোই দেখবেন কেমন একটা নেশা আপনাকে পেয়ে বসেছে। ঐ অবস্থায় 'দেশ' বা 'অমৃত' পড়তে গেলে দেখবেন চোখ আপনার কেবলই বিজ্ঞাপনের দিকে ছুটে চলেছে। যেখানেই 'বিবেকানন্দ' শব্দটি চোখে পড়ছে, সেখানেই আপনার চোখ বড়ো হয়ে উঠছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ভাবছেন এইবার একটা বই (ইংরেজীতে 'এনট্রি')

পেলাম। কোন একটা দরকারী বই পেলেই সেটাকে স্লিপে লিখে ফেলবেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। যেখান থেকে আপনার কাজে লাগা বইটার খোঁজ পেলেন, সেটা স্লিপের কোন একটা কোণে (বাঁদিকের নিচের কোণ হলেই ভালো) লিখে রাখবেন। নিজের স্মৃতিশক্তিকে বেশী বিশ্বাস করবেন না—ওটি কম বিশ্বাসঘাতক নয়। যখন কাজ আকারে বড়ো হয়ে উঠবে, তখন দেখবেন অনেক কিছুই মনে করতে পারছেন না। তাই এই সাবধানতার কথা বললাম।

স্বামীজীর গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজে নেমেছেন তো! একটু নেপথ্যে আলোচনা করে নি। স্বামীজীর জীবনী পড়া আছে? তাঁর জীবনের কিছু কিছু প্রধান ঘটনা জানা থাকা অত্যন্ত দরকার। যেমন ধরুন, আমেরিকায় স্বামীজী প্রথমবার কোন সালে গেলেন, বিশ্বধর্মমহাসভা (পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ন্স) কবে বসেছিল, স্বামীজী ভারতবর্ষে কবে ফিরলেন, কলকাতায় কখন এসে পৌঁছলেন ইত্যাদি। এসব দিন আপনার জানা না থাকলে আপনি কোন্ তারিখের পত্র পত্রিকা বা খবরের কাগজ দেখবেন? স্বামীজীর অন্তত একটা জীবনী পড়া না থাকলে কাজ করতে অসুবিধা হবে। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের "বিবেকানন্দ চরিত" বইখানি সবচেয়ে আগে পড়া দরকার। এরপর বিস্তৃততর জীবনী যেমন প্রথমনাথ বসুর 'স্বামী বিবেকানন্দ' (দুভাগে) বা অদ্বৈত আশ্রমের "লাইফ" (বর্তমানে একখণ্ডে প্রকাশিত) পড়া যেতে পারে। বহু নতুন তথ্য পাওয়া যাবে মহেন্দ্র দত্তের "স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী" (তিনভাগে) বইটির মধ্যে। জীবনীর পর পড়া দরকার স্বামীজীর 'পত্রাবলী' জন্মশতবর্ষ স্মরণে উদ্বোধন থেকে যে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম খণ্ডে সবশুদ্ধ ৫৫২টি চিঠি ছাপা হয়েছে। নানাদিক থেকে এই চিঠিগুলি মূল্যবান। মোদ্দা কথা, যে ক'মাস স্বামীজীর গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে আপনি ব্যস্ত থাকবেন, সে ক'মাস স্বামীজীর জীবনী, পত্রাবলী ও গ্রন্থাবলী (কমপ্লিট ওয়ার্কস) আপনার নিত্যসঙ্গী হোক।

এবারে চাই কিছু রেফারেন্স বই। তাই না? উদ্বোধন কার্যালয় (স্বামীজীর বাংলা বই যেখান থেকে প্রকাশিত হয়), অদ্বৈত আশ্রম (স্বামীজীর ইংরেজী বইয়ের প্রকাশক) -এর ক্যাটালগ নিশ্চয়ই জোগাড় করবেন। কয়েকটা গ্রন্থপঞ্জী, যেমন, 'দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি'র সংখ্যাগুলি (চারটে বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৫৮—১৯৬১ আর ১৯৬২ সালের তিনটে ত্রৈমাসিক সংখ্যা) বিশেষতঃ "জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, বাঙলা"র সংখ্যা দুটি এবং সাহিত্য আকাদেমী প্রকাশিত 'দি ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি অব্ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার ১৯০১—১৯৫৩' দেখতেই হবে। সাহিত্য আকাদেমির বইটি গ্রন্থপঞ্জী জগতে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এটির প্রথম ভাগ ১৯০১ থেকে ১৯৫৩এর মধ্যে মূলত ভারতে প্রকাশিত অসমীয়া, বাঙালা, ইংরেজী এবং গুজরাতি বইএর পরম নির্ভরযোগ্য তালিকা। এছাড়া কয়েকটি বড়ো বড়ো

লাইব্রেরীতে আপনাকে যেতে হবে। যেমন, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি। পত্র পত্রিকার মধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাগজ 'উদ্বোধন', 'প্রবুদ্ধ ভারত' 'বেদান্তকেশরী' ইত্যাদির পাতা ওলটাতে হবে। মাদ্রাজ থেকে 'ব্রহ্মবাদিন' নামে যে পত্রিকা বের হতো, তার পাতায় পাতায় কতো না খবর আমাদের অগোচরে থেকে গেছে। পত্রিকাটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। বেলুড়মঠের গ্রন্থাগারে, খুব সম্ভব, সম্পূর্ণ ফাইল আছে। ঐ সব কাগজে স্বামীজীর গ্রন্থ ও স্বামীজী সম্পর্কিত বহু গ্রন্থের বিজ্ঞাপন থাকতো। বিজ্ঞাপন তালিকায় এমন অনেক বইয়ের খবর আছে, যা কোনো গ্রন্থপঞ্জী বা গ্রন্থাগারে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

হায়, এতেই যদি আপনার সব ঝামেলা চুকতো! আপনার গ্রন্থপঞ্জীকে যদি সত্যিকার মর্যাদা দিতে চান, তাহ'লে সময় করে চলে যান আলিপুরের বেলভেডিয়ারে, জাতীয় গ্রন্থাগারে। 'বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটলগ' দেখতে চান—কোন সাল থেকে শুরু করবেন? স্বামীজীর বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতা ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। স্বামীজীর সাফল্যের খবর এদেশে এসে পৌঁছেছিল নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতা এদেশে ছাপা হয়েছে। ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী আমেরিকা থেকে লেখা এক চিঠিতে লিখছেন, "—আমি আমাদের ধর্মের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে একটি সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া পাঠাইয়া দিলাম—এই ক্ষুদ্র বক্তৃতাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর এবং বিভিন্ন দেশীয়-ভাষায় অনুবাদ কর।" (পত্রসংখ্যা ৭৭)। সুতরাং ১৮৯৪ থেকে 'বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ও বিভিন্ন রাজ্যের কোয়ার্টার্লি লিষ্ট' ধারাবাহিক ভাবে দেখে যেতে হয়। এইসব ক্যাটালগ অমূল্য 'রত্নখনি পূর্ণ মণিজালে'।

স্বামীজীর রচনা দুটি ভাষায়। মুখ্যত ইংরেজীতে, তার বেশীর ভাগই বক্তৃতা। কিছু চিঠিপত্র আর কবিতাও আছে। বাংলায় স্বামীজীর মৌলিক রচনা সর্বসাকুল্যে চারটি বই—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, ভাববার কথা ও পরিব্রাজক। এর ওপর চিঠিপত্র এবং কবিতা। ফরাসী ভাষায় লেখা স্বামীজীর দুটো চিঠি পাওয়া গেছে। কয়েকটি চিঠি সংস্কৃতে লিখেছিলেন। সংস্কৃতে কয়েকটি স্তোত্রও রচনা করেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করতে গিয়ে দেখবেন স্বামীজী একটি গানের বই সংকলন করেছিলেন। অবশ্য ঠিকভাবে বলতে গেলে স্বামীজী তখনও সন্ন্যাস নেন নি। অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বৈষ্ণবচরণ বসাকের সংকলন ও সম্পাদনায় ঐ বইটি 'সঙ্গীতকল্পতরু' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির প্রকাশকাল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। বৈষ্ণবচরণ বসাক বইটির ভূমিকা 'বিশেষ কথায়' লিখেছেন, "প্রায় একবৎসর অতীত হইল, ইহার সংকলনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ,

মহাশয়ই প্রথমতঃ ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই।" ন্যাশনাল লাইব্রেরীর বাংলা ক্যাটালগে বইটি নরেন্দ্রনাথ দত্তের নামে রাখা হলেও ঐ নরেন্দ্রনাথ দত্তই যে পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন এটা ক্যাটালগারের জানা ছিল না। অবশ্য বেলুড় মঠ গ্রন্থাগারে ঐ বইয়ের দুটো কপি বিবেকানন্দের বই হিসাবে রাখা আছে। তা ছাড়া মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী' বইটিতে লিখেছেন যে, স্বামীজী তবলা শেখানোর উপর একটা বই লিখেছিলেন এবং তা বেলুড়মঠ গ্রন্থাগারে আছে। এ কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মহেন্দ্রনাথের সব কিছু বলা তাঁর স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে। দু' একটি বিচ্যুতি হয়তো আছে। তাই ধরা যেতে পারে যে, ঐ বইটি স্বামীজীর লেখা।

এদের প্রকাশিত বইয়ের খবর মোটামুটি কোথায় পাওয়া যাবে তা আমরা দেখলাম। কিন্তু পাশ্চাত্যে প্রকাশিত বইয়ের হদিস কোথায় পাব? দুটি লাইব্রেরীর ক্যাটালগ আমাদের খুবই সাহায্য করতে পারে—(১) লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেস এবং (২) ব্রিটিশ মিউজিয়াম ক্যাটালগ। বিবেকানন্দ-গ্রন্থপঞ্জী সম্মেলনে অবশ্য দ্বিতীয়টির সাহায্য বিশেষ পাওয়া যাবে না। কেননা ইংরেজী 'ভি' (Vivekananda) অক্ষর পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়াম ক্যাটালগ এখনও বের হয়নি। লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেস ক্যাটালগে (লেখক ও বিষয় সূচী) কেবল ইংরেজীই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের খোঁজ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, আমেরিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর বইয়ের খবব 'কিউমিউলেটিভ বুক ইনডেক্স' (সংক্ষেপে সি, বি, আই) এবং ইংলণ্ডে প্রকাশিত বইরের খবর 'দি ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি' (সংক্ষেপে বি, এন, বি,)-তে পাওয়া যেতে পারে। স্বামীজী সম্পর্কিত বইও দুটো গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আপনি কিন্তু সব বই দেখছেন আর স্লিপ লিখে ঝুলিতে ফেলছেন। একই বই হয়তো 'এল সি' (লাইব্রেরী অব কংগ্রেস) ক্যাটালগ আর'সি, বি, আই'তে পেলেন। কুঁড়েমি করে 'এ বইটা বোধ হয় আগে পেয়েছি' বলে কোন বই ছেড়ে দেবেন না। যা পান দুহাতে কুড়িয়ে ঝুলিতে ভরবেন. পরে হয়তো দেখা যাবে, একই বইয়ের দশ-বারোটা স্লিপ লেখা হয়েছে—তা হোক। তবু খাটুনির ইকনমি করে একটা বই হারানোর চেয়ে, একটু খেটে দশ-বারোটা স্লিপ একই বইয়ের জন্যে লেখা শ্রেয়। তাছাড়া, আগেই বলেছি নিজের স্মৃতিশক্তিকে বেশি বিশ্বাস করবেন না।

স্বামীজীর বই পাশ্চাত্যের বহু দেশে অনূদিত হয়েছে। ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি, লাতিন আমেরিকা, নেদারল্যাণ্ডস্ সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, ইত্যাদি দেশে থেকে স্বামীজীর বই বের হয়েছে। 'এল সি' তো আছেই, তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী দেখা দরকার। স্বামীজীর বই বা স্বামীজী সম্পর্কিত বইয়ের অনুবাদ খোঁজার ঝামেলা অনেক অনেক সহজ। ১৯৩২ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত 'ইন্টার-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন' অনুবাদের একটা আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী বের করেছিলেন। ঐ গ্রন্থপঞ্জী নব পর্যায়ে ইউনেসকো দ্বারা 'ইনডেক্স ট্রানশ্লেসানাম' নামে ১৯৪৯ থেকে প্রতি বছর প্রকাশিত হচ্ছে। ১৩টি খণ্ড ইতিমধ্যে বের হয়ে গেছে। এক বছরে একটা দেশে যে যে বই অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত খবর পাবেন এ বইয়ের মধ্যে। খুই আনন্দের কথা যে, ঐ বইয়ের ভারতীয় সংস্করণ 'ইনডেক্স ট্রানশ্লেসানাম ইন্ডিকেরাম নামে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শ্রীবিজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য ভাষায় এবং জাতীয় ভাষার মধ্যে প্রধানত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের খোঁজ আমরা করলাম। ভারতীয় ভাষাসমূহে, বিশেষভাবে হিন্দী, মারাঠী ও দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাসমূহে স্বামীজীর বই বহু সংখ্যায় অনূদিত হয়েছে। সে সবও গ্রন্থপঞ্জীতে ঢোকাতে হবে বই কি।

এইভাবে বহু জায়গায় তল্লাশ করে, বহু আয়াস করে, 'বহু ব্যয় করে, বহু দেশ ঘুরে' স্বামীজীর বই সংগ্রহ করুন। তারপর আপনার তালিকাকে ঘসেমেজে, সাজিয়ে, পালিশ করে বাজারে ছাড়তে হবে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

[ষোড়শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে শ্রী ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দর গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রন্থপঞ্জীর মালমসলা সংগ্রহের পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুরূপ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ছাত্রদের পুনর্মিলনোৎসব (১৯৬৩) উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

বনবিহারী মোদক

গ্রন্থাগারের উপার্জন-সহায়ক ভূমিকা

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে জ্ঞানচর্চার আবেদন জানানোটা বিরাট একটা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সুকান্ত ঠিকই বলেছেন :

> ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
> পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি…

গ্রন্থপাঠের দূরপ্রসারী সুফল আর জ্ঞানচর্চার আত্মিক উপকারিতা সম্বন্ধে যত বক্তিমেই আমরা ঝাড়ি না কেন, নিরন্ন মানুষের কানে সে সব বক্তিমে নিশ্চয়ই মধু বর্ষণ করবে না। গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ কর্মসূচীর ব্যর্থতার এটাও একটা বিশেষ উল্লেখ্য কারণ।

গ্রন্থাগার ক্ষুধার্তকে অন্নদান করতে অক্ষম—অত্যুৎসাহী গ্রন্থাগারসেবীরাও একথা স্বীকার করবেন। কিন্তু নিজের হাতে অন্নদান করতে না পারুক, অন্ন জোটাবার পথগুলোও কি গ্রন্থাগার বাৎলে দিতে পারে না? গ্রন্থাগারের পক্ষে এটা যে শুধু সম্ভব তাই-ই নয়, অন্নাভাবগ্রস্ত এই বুভুক্ষু দেশে এইটেই গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিত। আর্থিক সমস্যাই মানব সমাজের সবচেয়ে মৌল সমস্যা, মার্কসবাদও এই কথাই বলে। কিন্তু এ-পোড়াদেশের শিক্ষানিয়ামকেরা গ্রন্থাগারের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি সম্বন্ধে আজও অনবহিত।

জনগণের জীবনসংগ্রাম এবং রুজি-রোজগারের ব্যাপারে গ্রন্থাগার যদি সক্রিয় সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করতে পারে, দেশ ও জাতির পক্ষে সেটা হবে অশেষ কল্যাণকর। বই পড়াকে নিষ্প্রয়োজনীয় বিলাস মনে করে আজ যাঁরা গ্রন্থাগারের ছায়াও মাড়ান না, সাহায্য গ্রহণের জন্যে তাঁরাই কাল সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন। দেশের ধনবিনিয়োগের সংগে শিক্ষিত ও কুশলী কর্মীর শ্রমের সমন্বয় সাধিত হওয়ায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রগতিও ত্বরান্বিত হবে। বহুসংখ্যক উদ্যমশীল পাঠক ও জিজ্ঞাসুর সেবা করার সুযোগ পেয়ে গ্রন্থাগারও তার আদর্শকে সফল করতে পারবে।

কিন্তু এখানে সাফল্যের পথে বাধাও বিস্তর। বেকার সমস্যার ভয়াবহতা এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাপত্তাবোধের অভাব এখন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এর সমাধান প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু অন্যরা এবিষয়ে কিছু করুন বা না করুন, আমরা গ্রন্থাগারকর্মীরা আমাদের দায়িত্বটুকু সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্যে অবশ্যই চেষ্টা করব। এজন্যে সুপরিকল্পিত একটি কর্মপন্থা নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কর্মপন্থাটি হবে ত্রিমুখী :—

(১) পুরো বেকারদের কর্মপ্রাপ্তিতে সাহায্য

(২) আধা-বেকারদের আর্থিক উন্নতির সহায়তা এবং

(৩) কর্মরতদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য

এইবার উপায় তিনটিকে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলেই গ্রন্থাগার তার ইতিকর্তব্যের দিগদর্শন লাভ করবে—

১। পুরো বেকারদের কর্মপ্রাপ্তিতে সাহায্য :

(ক) • পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আজকাল যেমন এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো স্থাপিত হচ্ছে, অনুরূপ কাজ গ্রন্থাগারেও সাফল্যের সংগেই

সম্পাদিত হতে পারে। কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসস্থলগুলোর যা কিছু খোঁজ-খবর, কর্মপ্রার্থীরা এখান থেকেই তা পেতে পারেন। নিয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করলে, কর্মপ্রার্থীদের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিবরণী এবং আবেদনের ফরম প্রভৃতিও সংগ্রহ করে রাখা যাবে।

(খ) কোন বিশেষ একটি পদ পেতে হলে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষণ দরকার, তার কোনটি কার পক্ষে সুবিধেজনক, গ্রন্থাগার তারও পথনির্দেশ দিতে পারে। এগুলো ঠিকমত জানে না বলেই, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াতে বাধ্য হয় এবং নিজেদের ব্যর্থতাবোধের গ্লানি ও অবসাদ সমাজমনেও সঞ্চারিত করে দেয়।

(গ) চাকরীতে বা শিক্ষণের পাঠক্রমে ঢুকতে অ্যাডমিশন টেস্ট-জাতীয় যেসব পরীক্ষার বাধা আজকাল ডিঙোতে হয়, সেগুলোর প্রস্তুতির জন্যেও গ্রন্থাগার যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং ইস্কুল-গুলোই আজকাল এ-ব্যাপারের একমাত্র কান্ডারী সেজে বসেছে এবং বেপরোয়া শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তরিকতার সংগে সচেষ্ট হলে গ্রন্থাগার কিন্তু এদের চেয়েও যোগ্যতর সহায়ক হিসাবে সাফল্যলাভ করতে পারে; কেননা গ্রন্থাগার তার সংগ্রহে, প্রয়োজনীয় সমস্ত রেফারেন্স বই-ই রাখতে পারে, কোচিং কেন্দ্রগুলোর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাছাড়া, গ্রন্থাগার তো এদের মতো শুধু পকেট ভারি করার মতলব নিয়েই একাজে নামবে না, সে পরিচালিত হবে জনসেবার ব্রত নিয়ে।

ইন্টারভিউ প্রভৃতিতে উৎরে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্যদানের ক্ষমতাও গ্রন্থাগারের যথেষ্ট আছে। হিন্দুস্থান ইয়রবুক, কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স, বর্ষপঞ্জী প্রভৃতি সাধারণ কোষগ্রন্থও এ বিষয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারে। আমার লেখা 'সাধারণ গ্রন্থাগারে অনুলয় সেবা, প্রবন্ধেও* এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(ঘ) অতিসাধারণ এবং ছোটখাট অনেক ব্যাপারেও কর্মপ্রার্থীদের অনেক অসুবিধে পোয়াতে হয়। এ বিষয়ে মফঃস্বল এবং পাড়া-গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের দুর্ভোগ আরও বেশী। কোনো গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে সার্টিফিকেটের নকল-গুলো যথা সময়ে প্রত্যয়িত (attested) করার ব্যবস্থা করতে পারেনি বলে, অত্যন্ত মেধাবী একটি ছেলে ভালো একটি সুযোগ হারিয়েছে—এরকমও দেখেছি। অনুরূপ ঘটনা আরও যে কত ঘটেছে, তার সঠিক খবর কে রাখে? গ্রন্থাগার একটু সচেষ্ট হলে, বেকার এবং কর্মপ্রার্থীদের এইসব ভোগান্তি কি একটুও লাঘব করতে পারে না?

(ঙ) জীবন সংগ্রামে বাঙালীর পশ্চাদপসরণের কারণগুলো বারংবার যাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, প্রাতঃস্মরণীয় সেই সব মহাপুরুষদের রচনাকে বাংলার যুব সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারলে, সেটা প্রকৃতই একটি মহৎ কাজ হবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের রচনা পাঠ করলে, হতাশা ও অবসাদে

* 'গ্রন্থাগার'—১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭) পৃঃ ৩০০

মুষড়ে-পড়া দিগ্‌ভ্রান্ত বেকার ছেলেদের দু-চারজনও কি নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হবে না? ভূদেব মুখুজ্জের লেখা কি বেকার যুবমানসে নতুন আশাবাদ সঞ্চারিত করবে না? সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত গ্রন্থাদির মধ্যে দেবজ্যোতি বর্মণের 'বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী' প্রভৃতি রচনাও জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে বাংলার যুবশক্তিকে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে।

২। আধা-বেকারদের আর্থিক উন্নতির সহায়তা ঃ

আংশিক সময়ের কাজে নিযুক্ত বা অল্প কিছুদিনের জন্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আমরা আধা-বেকার নামে অভিহিত করতে পারি। এঁদের এবং পরবর্তী আলোচ্য ৩ নম্বরের বিষয়টি ('কর্মরতদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য') সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করলেই চলবে। কারণ, পুরো বেকারদের মতো এঁদের দু'-শ্রেণীর অবস্থা অতটা শোচনীয় নয়। যে কোনো একটা স্থায়ী আয়ের পথ দেখিয়ে বা ধরিয়ে দিতে পারলেই এঁদের সমস্যা অনেকটা মিটে যায়। হস্তশিল্প বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পই এঁদের পক্ষে সর্বোত্তম। তাছাড়া, সম্পূর্ণ বেকারদের সম্পর্কে আগে যে সব ইতিকর্তব্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার অনেকগুলো এই দুই শ্রেণীর বেলাতেও অনেকাংশেই প্রযোজ্য।

কলেজ-পাঠ্য কেতাবে এদেশের চাষীদের জন্যে অনেক হা-হুতাশ দেখি। বছরে মাত্র কয়েকটা মাস তাদের কাজ। তারপরই তাদের আলসেমির পালা। এদের 'Empty mind' যে সহজেই 'devil's workshop' হবে, তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে? যাহোক একটা হাতের কাজ এদের ধরিয়ে দিতে পারলে, নিয়মিত আয়ের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে। এর আরেকটি সুফলও ভেবে দেখবার মতো। সৃজনাত্মক শিল্পকর্মে দক্ষতা অর্জনের মনস্তাত্ত্বিক সুফল হিসেবে সমাজ মনের সাংস্কৃতিক বিকাশও এতে ত্বরান্বিত হবে।

৩। কর্মরতদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য ঃ

বাংলাদেশের কলকারখানাতেও বাঙালী শ্রমিকরা আজ অবাঞ্ছিত। অফিসের কাজকর্মেও দক্ষিণ ভারতীয়দেরই বেশী সমাদর। এর মূলে সত্যিই কি কোনো কারণ নেই? বাঙালীর ছেলেরা সত্যিই কি মনপ্রাণ ঢেলে খাটে? মনে মনে এসব কথা আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু প্রতিকারের ব্যাপারে নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ এবং সমস্যার বিপুলতার দোহাই দিয়ে আমরা চুপ করেই থাকি। শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের কাজে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীরও কিছু অবদান ছিল, আমাদের গ্রন্থাগারকর্মীরা কি সেটুকুও করতে পারেন না?

কর্মী পিছু উৎপাদন সারা দুনিয়ার মধ্যে এদেশেই সবচেয়ে কম। শুধু মুখের কথায় তো চিঁড়ে ভেজে না, কাজও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করা দরকার এবং তা হওয়া চাই সঠিক পদ্ধতিমাফিক; তবেই তো দক্ষতা বাড়বে। বৃত্তিশিক্ষার Hand book প্রভৃতি এ বিষয়ে খুবই সাহায্য করতে সক্ষম। গ্রন্থাগারই এসবের ভান্ডারী, কাজেই

শ্রমবিমুখ কর্মীদের শিখিয়ে পড়িয়ে উদ্যমশীল ও দক্ষ করে তোলার কর্তব্য এবং দায়িত্ব তো তারই।

শুধু গতর খাটাতে উৎসাহিত করলেই যে কর্মীদের দক্ষতা হু-হু করে বেড়ে যাবে—এটা আশা করা ভুল। জাতিরা সামগ্রিক ভাবপরিমণ্ডল ফাঁকি ও চালাকিকেই আজকাল উপাস্য করে নিয়েছে। এটা দূর করা একদিনের কাজ নয়। সুস্থ আদর্শবাদ জাতির মনে পরিব্যাপ্ত করে দিতে হলে, জাতির মানস চেতনায় ধৈর্যসহকারে রসদ যুগিয়ে যেতে হবে। প্রেরণা সঞ্চারী সদ্ গ্রন্থই সেই একান্ত প্রয়োজনীয় রসদ। সে রসদ যোগাবার ভার গ্রন্থাগার সেবীরা ছাড়া আর কে নেবেন?

উপযুক্ত তিন শ্রেণীর লোকের উপকারের জন্য, গ্রন্থাগারে এঁদের প্রয়োজনমাফিক বই সংগ্রহ করতে হবে। এইসব বই পৃথকভাবে রক্ষিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্রীয় Directorate of Resettlement and Training কর্তৃক প্রকাশিত বৃত্তি-পুস্তিকা-সমূহ, অ্যাড্‌মিশন টেস্টের বই, ক্ষুদ্রায়তন কুটিরশিল্প ও হাতের কাজের নির্দেশিকা এই সংগ্রহে স্থান পেতে পারে। সমস্ত বই একই জায়গায় রক্ষিত হওয়ার ফলে এগুলোর ব্যবহারেরও খুব সুবিধে হবে, কর্ম প্রার্থীদের মনোবলও তাতে বৃদ্ধি পাবে।

বহিঃশত্রুর আকস্মিক আক্রমণের মোকাবিলার জন্যে সরকার এখন সামরিক প্রস্তুতির দিকে মন দিয়েছেন। সামরিক বিভাগের ছোট বড় নানা রকম পদেই আজকাল লোক নেওয়া হচ্ছে। পাড়া-গাঁ এবং মফঃস্বলের তরুণেরা সব সময় এগুলোর খোঁজ-খবরও পায় না। আর কিছু না হোক, সংবাদ পত্রাদিতে মুদ্রিত নিয়োগ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির কাটিং উপযুক্তভাবে ডিসপ্লে করতে পারলে' তাতেও তো কিছু লোক উপস্থিত হতে পারে। আমাদের গ্রন্থাগারসেবীরা কি এটুকুও করতে পারেন না? এ কাজে সাহায্য করতে পারলে শুধু যে কর্মপ্রার্থীদেরই উপকার হবে, তাই-ই নয়। বহুসংখ্যক উদ্যমশীল যুবকের সেবা পেয়ে সামরিক বাহিনীও অজেয় হয়ে উঠবে, দেশেরও শক্তিবৃদ্ধি হবে।

জনপ্রিয় একটি দৈনিকপত্র হালে 'কোন্ জীবিকা?' শিরোনামায় একটা ফীচার বের করেছে। চাকরীপ্রার্থীদের জ্ঞাতব্য অনেক খবরই তাতে থাকে। জীবিকার এক একটা লাইনের, অনুরূপ খবরাখবর একত্রিত করে সংগ্রহের মধ্যে রাখতে পারলে, সেটাও অনেক লোকের কাজে আসবে।

নানা ধরণের technicalities উদ্ভাবিত ও চালু হওয়ার ফলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান আজকাল ক্রমেই খুঁটিনাটি সর্বস্ব ও যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যসাথী হতে হলে, ঐ প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখে গ্রন্থাগারকে তার মানবিক দিকটাকেও বাড়িয়ে তুলতে হবে। ক্ষুধিত মানুষের অন্নসংস্থানে সাহায্য করতে পারলে, সেটা হবে এদিকে একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ। কৃতজ্ঞ পাঠকের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ও সেবাগ্রহণকেই আমরা সেদিন আমাদের চিরবাঞ্ছিত হিসেবে মাথা পেতে নেব।

বিদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (৫) আইসল্যাণ্ড

আইসল্যাণ্ড আকারে আয়ারল্যাণ্ড থেকে কিছু বড় এবং ইংলণ্ড থেকে কিছু ছোট। লোক সংখ্যা হ'ল ১৮৫ হাজার। এই লোক সংখ্যার ৭৫ হাজার হ'ল রাজধানী Reykjvik এর অধিবাসী। আইসল্যাণ্ডে প্রায় ২০টি শহর আছে। এক একটি শহরে অধিবাসীর সংখ্যা ৭০০ থেকে ৯০০০।

জাতীয় গ্রন্থাগার ঃ

আইসল্যাণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাচীনতম গ্রন্থাগার হ'ল জাতীয় গ্রন্থাগার (Landsbokasafin Islands)। ১৮১১ সালে এটি স্থাপিত হয়। আইনানুগ ব্যবস্থা অনুযায়ী এই গ্রন্থাগারে নতুন প্রকাশিত পুস্তকের ১২ কপি এবং সমস্ত পত্রপত্রিকার ৮ কপি জমা দিতে হয়। ২ কপি করে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা এই গ্রন্থাগারে রেখে বাকীগুলি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিতরণ করা হয়। গ্রন্থাগারে বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ২৩০ হাজার। প্রতি বৎসর পুস্তক ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৫ শত পাউণ্ড। বর্তমান গ্রন্থাগার গৃহটি স্থানাভাবের ফলে নতুন একটি গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটিও হয়ত এই নতুন গৃহে স্থানান্তরিত হবে।

আইসল্যাণ্ডের সুপ্রাচীন মূল্যবান পুঁথি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে আইসল্যাণ্ড সুইডেনের অধীনে ছিল। আইসল্যাণ্ডে জমিজমা ও সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্য নিরূপণের জন্য কোপেনহেগেন থেকে Arni Magnüssen (১৬৬৩—১৭৩০) নামক এক ব্যক্তি প্রেরিত হয়েছিলেন। আইসল্যাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ কালে তিনি এই সমস্ত অপূর্ব পুঁথিগুলি সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সময়ে এই পুঁথি কোন কোন স্থানে ছিন্ন বস্ত্রে তালি মারবার কাজে ব্যবহৃত হত। সংগৃহীত পুঁথিগুলি Magnüssen কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়ে দেন। এই পুঁথি প্রত্যর্পণের জন্য বর্তমানে সুইডেন সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলেছে। তিন বৎসরের মধ্যে এই পুঁথিগুলি প্রত্যর্পিত হবে এই আশায় জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূগর্ভস্থ গৃহে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে প্রায় ১২ হাজার পুঁথি আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (Háskólabókasafn)

জাতীয় গ্রন্থাগারের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আকারে ক্ষুদ্র। ১৯৪০ সালে এটি স্থাপিত হয়। কিন্তু গ্রন্থাগারের জন্য কোন অর্থের বরাদ্দ ছিলনা।

প্রাক্তন ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের দানে এখন পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। আইসল্যাণ্ডের জনসংখ্যার স্বল্পতা হেতু জনসাধারণের আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ নগণ্য—সরকারী সাহায্যও অনুরূপ।

গ্রন্থাগারিকই হলেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একমাত্র কর্মী। ছাত্রদের সাহায্যে তিনি গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন। গত তিন বছর যাবৎ তিনি গ্রন্থাগারিকতা সম্বন্ধে সেমিনার পরিচালনা করেছেন। গ্রন্থাগারিকের মতে সেমিনারে যোগদানকারী ছাত্রবৃন্দ গ্রন্থাগারিকতায় কিছু পরিমাণ যোগ্যতা লাভ করেছেন। এই শিক্ষা তাদের ডিগ্রী পাবার সহায়ক। যদি তাঁরা পূর্বেই ডিগ্রীর অধিকারী হয়ে থাকেন তবে এই অতিরিক্ত যোগ্যতার দ্বারা শিক্ষকতা এবং যাদুঘর সংরক্ষকের চাকুরী পেতে পারেন।

আইসল্যাণ্ডে গ্রন্থাগারিকতা বিজ্ঞান শিক্ষার এই একমাত্র উপায়। অবশ্য অতি অল্প সংখ্যক ছাত্র এই উদ্দেশ্যে অসলো অথবা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

সাধারণ গ্রন্থাগার ঃ

আইসল্যাণ্ডের রাজধানী Reyejavik শহরে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে (Baejarbokasafn Reykjavikur)। এর পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৭৭ হাজার। এই গ্রন্থ ভাণ্ডার থেকে তিনটি শাখা গ্রন্থাগার ও কয়েকটি বিদ্যালয়ে পুস্তক সরবরাহ করা হয়। ৪০ খানি পুস্তক সমন্বিত পেটিকা নাবিকদের জন্য বিভিন্ন জাহাজে প্রেরিত হয়। গ্রন্থাগারে একটি পাঠ কক্ষ। লেনদেন বিভাগ এবং ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্মচঞ্চল একটি শিশু বিভাগও আছে। এ ব্যতীত পৃথক পুস্তক ভাণ্ডার আছে। গ্রন্থাগারে বৎসরে প্রায় ২২০ হাজার পুস্তকের লেনদেন হয়। এর মধ্যে প্রায় ১৬৫ হাজারই হল আইসল্যাণ্ডের গল্পগ্রন্থ এবং সাড়ে ন হাজার বিদেশী ভাষার পুস্তক। বিদেশী ভাষার মধ্যে অধিকাংশই হ'ল স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। শিশু বিভাগেই লেনদেনের সংখ্যা মোট লেনদেন সংখ্যার প্রায় শতকরা ৩৭·৫ ভাগ।

একদিনে ১৩ শত গ্রন্থের লেনদেন গ্রন্থাগারের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবিবার ব্যতীত সারা বৎসর গ্রন্থাগার খোলা থাকে। শীতকালে রবিবার বৈকালে ২ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকে।

গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যা চার। পাঠকক্ষ ব্যবহারকারীদের একটি খাতায় সই করতে হয়। ১৯৬১ সালে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল ৭,৮৪৪। পাঠকক্ষে পুস্তকের সংখ্যা ১২, ৮৭৪।

গ্রন্থাগারে পরিবর্তিত আকারে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ভ্রমণ কাহিনীর জন্য ৪০০ এবং ভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের জন্য ৮০০ ব্যবহৃত হয়। উপন্যাস এবং বৈদেশিক সাহিত্য ভাষা হিসাবে বিন্যস্ত হয়।

এই গ্রন্থাগারে অভিধানিক গ্রন্থসূচীতে বিদেশী লেখকের ক্ষেত্রে আদ্যনাম, প্রথমে এবং আইসল্যাণ্ডের লেখকদের ক্ষেত্রে অন্তঃ নাম প্রথমে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারে অপরিবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ এবং সূচীতে কেবলমাত্র অন্তঃ নাম প্রথমে ব্যবহৃত হয়।

Hafnarfjordur শহরের সাধারণ গ্রন্থাগারটি প্রকৃত পক্ষে আধুনিক উন্নত মানের গ্রন্থাগার। ১৯৫৮ সালে এই শহরের পঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গ্রন্থাগারের একটি দ্বিতল ভবন স্থাপিত হয়েছিল।

এই গ্রন্থাগারেও একটি শিশু বিভাগ আছে। এখানে কর্মী সংখ্যা দুই। সহকারী গ্রন্থাগারিক হলেন আইসল্যাণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ কবি।

গ্রন্থাগারের সভ্যদের টিকিটের জন্য ১০ ক্রোণার দিতে হয়। পুস্তক সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। দৈনিক লেনদেনের সংখ্যা ১৫০ থেকে ২৫০। হাসপাতাল এবং জাহাজে এই গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক সরবরাহ করা হয়।

আইসল্যাণ্ডের শিক্ষিতের হার খুব উচ্চ। লোক সংখ্যার অনুপাতে পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের তুলনায় অধিক। আইসল্যাণ্ডে প্রতি একলক্ষ অধিবাসীর জন্য ৩১২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। নরওয়ে, সুইডেন এবং আমেরিকায় এই সংখ্যা যথাক্রমে ৬৭, ৫০ এবং ৮'৩।

রাজধানী শহরে পুস্তক বিপনির সংখ্যা ৪১, মুদ্রক ২০ জন এবং দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ৫।

আইসল্যাণ্ড গ্রন্থাগার পরিষদ মাত্র এক বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে প্রথম গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনের ফলে ৩২টি গ্রন্থাগার "জেলার" সৃষ্টি হয়েছে এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ধাঁচে প্রত্যেকটি 'জেলা'র একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আছে। গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহ করবার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জনপ্রতি বৎসরে ১৫ ক্রোণার বরাদ্দ করতে হয়। সরকারী তহবিল থেকে ৪.৫০ ক্রোণার দেওয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী একজন গ্রন্থাগার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন এই আইনের বিধান অনুযায়ী বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং কারাগারেও গ্রন্থাগার স্থাপিত হ'তে পারে।

আইসল্যাণ্ডে কয়েকটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেরও অস্তিত্ব আছে।

[Evelyn S Whately লিখিত *Library World* পত্রিকার April (1963) সংখ্যায় প্রকাশিত Iceland's libraries প্রবন্ধ অবলম্বনে অশোকা দাশগুপ্ত কর্তৃক লিখিত।]

চব্বিশ পরগণা

বেলগড়িয়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত ২৭শে বৈশাখ বেলগড়িয়া হরিচরণ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও সুধাস্মৃতি পাঠাগার সম্মিলিত ভাবে বিদ্যালয় হলে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন উপলক্ষে যে বৈচিত্রপূর্ণ কার্যসূচীকে রূপদান করেন তাহা বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত সুধীজনের মনে গভীরভাবে রেখাপাতে সমর্থ হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীরামপদ ব্যানার্জি, প্রধান অতিথি শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্তী ও উপস্থিত সুধীজনকে ধন্যবাদ জানাইয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনিল দাসগুপ্ত উক্ত বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দান প্রসঙ্গে বিশ্বকবির জন্মদিবস পালনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ব্যক্ত করেন; অতঃপর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীবৃন্দের পাঠোন্নতির জন্য বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' ও 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার উপর আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পার্শ্ববর্তী কাঁটিয়া, পোলতা, ফতল্লপুর ও থোড়গাছি হইতে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় বালকদের মধ্যে যথাক্রমে 'ক' ও 'খ' বিভাগে শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য ও শ্রীঅরুণ লাহিড়ী এবং বালিকাদের মধ্যে যথাক্রমে 'ক' ও 'খ' বিভাগে কুমারী বন্দনা লাহিড়ী ও কুমারী অনুশ্রী ঘোষ পুরস্কার লাভ করেন।

কবির সর্বোতমুখী প্রতিভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী অরবিন্দ বসু, প্রবোধানন্দ দাস, ফণী চক্রবর্তী, সন্তোষ ঘোষ, অজিত লাহিড়ী প্রভৃতি সুধীজন।

সাধুজন পাঠাগারে রবীন্দ্র জয়ন্তী

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ 'সাধু পাঠ মন্দিরে' রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণী সাধুর পরিচালনায় 'শিশুদের কবি' ২০ জন শিশু নাচ, গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা, লেখা, পাঠে অংশ গ্রহণ করে। শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র সাধুজনপত্র রবীন্দ্র সংখ্যার উদ্বোধন করেন।

অপরাহ্নে সভায় সভাপতিত্ব করেন সুখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় ১০৩টি প্রদীপ জ্বালিয়ে রবীন্দ্র আরতি করেন কুমারী মণীষা সাধু।

দ্বিতীয় দিবস প্রাতে চতুর্থ বার্ষিক মহকুমা কবি সম্মেলন উদযাপিত হয়। ২৫ জন স্থানীয় কবি স্বরচিত লেখা পাঠ করেন। কবি কংকন শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং কবি শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য প্রধান অতিথির ভাষণ দেন।

বর্ধমান

জাড়াগ্রাম পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিবার্ষিকী

জাড়াগ্রাম, ১১ই মে—গত বুধবার জামালপুর থানার পল্লী পাঠাগার জাড়াগ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, আদর্শ চরিত্র দেশসেবক স্বর্গত মাখনলাল দে'র স্মৃতিবার্ষিকী উৎসব শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সন ১৩২৮ সালে এই পল্লী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্বর্গত মাখনবাবুর স্মৃতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাঁহার আংশিক অর্থসাহায্যে তদীয় গুণমুগ্ধ গ্রামবাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় এই পাঠাগারটি সরকার অনুমোদিত রুর‍্যাল লাইব্রেরীরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে ইহার সভ্য সংখ্যা ২১ জন, পুস্তক সংখ্যা ৫৭৪৭ খানি। বর্তমান বৎসরে সরকারী সাহায্য ২১০৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড বার্ষিক সাহায্য করেন।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্র পাঠাগার ও রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি সিউড়ী

গত ২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে, বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার এবং রবীন্দ্র পাঠাগার ও রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন পশ্চিম বঙ্গের সমাজ শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন রায়। কবিগুরুর মহান অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ডাঃ নীলরতন সেন, শ্রীননীগোপাল চৌধুরী (সাব জজ) মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়। ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাওড়া

হাওড়া ভারত পাঠাগার

গত ৪ঠা মে '৬৩ সন্ধ্যায় পাঠাগার প্রাঙ্গনে বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীশংকরী প্রসাদ বসু এবং সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্তকুমার সেনগুপ্ত। অধ্যাপক বসু স্বামীজীর জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। শ্রী সেনগুপ্ত এক সুদীর্ঘ ভাষণে স্বামীজীর বিপুল সৃষ্টি যুগ পরম্পরায় রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানান। সভায় মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তীর পরিচালনায় স্বদেশী সংগীত পরিবেশিত হয়।

৫ই মে '৬৩ সন্ধ্যায় কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয়ের প্রধান আতিথ্যে পাঠাগারের ষোড়শ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভে সম্পাদক শ্রীউদয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় জাতির জীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পাঠাগারের বিশিষ্ট ভূমিকার উল্লেখ করে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রী বসু গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানান। সভায় নন্দা খাঁ, রুণু ও ইরাণী মণ্ডল এবং কৃষ্ণা পালের সংগীত, রুবী ধরের নৃত্য এবং অবিনাশ চন্দ্র দের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' নাটকটি উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দের প্রশংসা লাভ করে। পাঠাগার সভাপতি শ্রীকৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত জনসাধারণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।"

সুলভ পাঠ্য পুস্তক প্রকাশে সরকারী সাহায্য

সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় লেখক কর্তৃক রচিত সুউচ্চ মানের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় সাহায্য করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কর্মসূচী রচনা করেছেন। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল, ছাত্রদের স্বল্প মূল্যে ভাল পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা ও ভারতীয় লেখকদের (যাঁদের পুস্তক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমাদৃত হয়) উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় এই কর্মসূচীর জন্য চার লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কোন বিশেষ নির্বাচিত পুস্তকের জন্য কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হবে। ঐ চার লক্ষ্য টাকার অর্ধেক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক পুস্তক ও অর্ধেক টাকায় সাহিত্যাদি বিষয়ক পুস্তক প্রকাশনায় সাহায্য করা হবে।

বর্তমানে অবশ্য শুধু ইংরাজীতে লিখিত বা অনুদিত পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারেই সাহায্য সীমাবদ্ধ থাকবে। লেখকগণ মন্ত্রণালয়ের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। পুস্তকটি যে বিষয়ে হবে সেই বিষয়ের কয়েকজন

বিশেষজ্ঞ তা সাহায্যলাভের যোগ্য কিনা বিবেচনা করবেন। তাঁদের মতামত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিনিধিদের এক কমিটীতে পেশ করা হবে।

কোন পুস্তক সাহায্য লাভের জন্য নির্বাচিত হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশের কপি রাইট সংস্করণ প্রভৃতি বিষয়ের মীমাংসা করবেন।

এ ছাড়াও মন্ত্রণালয় বিদেশী পাঠ্যপুস্তকের ভারতে সুলভ সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। যুক্তরাজ্য সরকারের সহিত ব্যবস্থাক্রমে ৪১টি বৃটিশ পাঠ্য পুস্তক ইতোমধ্যে ভারতে প্রকাশিত হয়েছে এই ব্যাপারে পি, এল—৪৮০ অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারও রুশ পাঠ্য পুস্তকের ভারতে সুলভ ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশে সম্মত হয়েছেন।

গ্রন্থাগারিকতার সার্টিফিকেট কোর্সের স্বীকৃতি

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন স্নাতক এবং গ্রন্থাগারিকতায় ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ২৫০—১৫—৪০০ বেতনের হার নির্ধারণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি সুপারিশ করেন তবে বর্তমানে কর্মরত কর্মীদের এই বেতনের হার দেওয়া হবে।

পাঠ রুচি সমীক্ষা

গ্রেট বৃটেনের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রায়ই বই পড়েন। কিন্তু এক চতুর্থাংশের বেশী ক্বচিৎ কদাচিৎ বই পড়ে থাকেন। এই তথ্য লণ্ডনের *Daily Express* পত্রিকা পরিচালিত বই পড়া সম্বন্ধে একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়। এই সমীক্ষার চারটি প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ

১ প্রঃ আপনি কি বই পড়েন?

উঃ		
প্রায়	শতকরা	৩৫
মাঝে মাঝে	,,	৩৬
কদাচিৎ	,,	২৭½
কখনও নয়	,,	১½

২ প্রঃ কি ধরণের বই আপনি পছন্দ করেন?

উঃ		
গল্প, উপন্যাস	শতকরা	৪১½
অন্যান্য	,,	৩২½
যে কোন ধরণের	,,	২৬

৩ প্রঃ কি ধরণের গল্পের বই পছন্দ করেন।

গোয়েন্দা ও রহস্য কাহিনী	শতকরা	২৯
রোমান্স	,,	২৬
এ্যাডভেঞ্চার	,,	১৫½
যুদ্ধ	,,	১৪
ওয়েস্টার্ণস	,,	৮
বিজ্ঞানের গল্প	,,	৭
অন্যান্য	,,	½

৪ প্রঃ আপনি আপনার স্থানীয় গ্রন্থাগার কি রকম ব্যবহার করেন?

উঃ		
প্রায়ই	শতকরা	২৫
মাঝে মাঝে	,,	২১½
কদাচিৎ	,,	৩৮
কখনও নয়	,,	৫½

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখ যোগ্য পুস্তক

বর্তমান যুগে বই, পত্র পত্রিকার সংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সংগে এর তুলনা করা চলে। পত্র পত্রিকার সংখ্যা প্রতি ২০ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র রসায়ন বিদ্যার ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির পরিমাণ *Chemical abstracts* দেখিলেই বোঝা যাবে। সম্প্রতি প্রকাশিত *Chemical abstracts* এর দশ বছরের সূচীটি ১৯ খণ্ডে সম্পূর্ণ। এর পূর্ববর্তী দশ বছরের সূচীর সংখ্যা হ'ল মাত্র ৬। বিভিন্ন দ্রব্যের ভৌতিক এবং রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কিত তথ্য সমন্বিত রেফারেন্স বই *International Critical Tables (1926-33)* ৭ খণ্ড সম্পূর্ণ। এখন এর একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করলে নাকি এর আয়তন প্রায় একশ গুণ বেড়ে যাবে।

কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে নিজ গবেষণা বা অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কোন তথ্য এই বিশাল সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠছে। নিজ নিজ বিষয়ের ক্ষেত্রে কি অগ্রগতি হচ্ছে বিজ্ঞানীরা যদি সে সম্বন্ধে অবহিত না হতে পারেন তবে গবেষণার সময় এবং অর্থের অপচয় ঘটতে পারে। আমেরিকা প্রতিরক্ষা দপ্তর সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার সমূহে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় প্রকাশ যে তাদের গবেষণাগারে পরিচালিত শতকরা ৩০ থেকে ৮৫টি গবেষণা পূর্বে অন্যত্র করা হয়েছে। এই তথ্য বিজ্ঞানী ও কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত থাকার ফলে নতুন করে অনুসন্ধান পরিচালনা করে সেই পুরণো সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হয়েছেন।

বই পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য সংগ্রহ করা যেমন সমস্যা তার ভিতর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যটি খুঁজে বার করবার সমস্যাও ততোধিক।

বিশেষজ্ঞদের মতে গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত বর্গীকরণ ও সূচীকরণ পদ্ধতি দ্বারা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে তাই সংবাদ সংগ্রহ ও সঞ্চয় (collection and storage) এবং এর ভিতর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যের পুনরুদ্ধারের (retrieval) কাজে যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে আমেরিকায় অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হ'য়েছে। সম্বন্ধেই বিভিন্ন সভায় এত আলোচনা এবং বিভিন্ন পত্রিকায় এত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার হদিশ করাই এখন সমস্যা। *Journal of documentation, American documentation* পত্রিকায় এই বিষয়ের প্রবন্ধের সারাংশ প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তকের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ

Kent, (Allen). *Textbook on mechanized information retrieval.* N.Y., Interscience, 1962. 268 p. $ 9·50.

যন্ত্রের সহায়তায় তথ্যানুসন্ধানের মূলনীতিগুলি এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়। তথ্যানুসন্ধানের কাজে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলিকে কয়েকটি একক প্রক্রিয়া (Unit operation) হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে। গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিটি একক প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ নিরূপিত হয়েছে এবং এই একক প্রক্রিয়া কি উদ্দেশ্য সাধন করবে তা আলোচনা করা হয়েছে। বই খানিতে যান্ত্রিক কলা কৌশল সম্বন্ধে আরও তথ্য জানবার জন্য একটি পাঠ্যতালিকাও সংযোজিত হয়েছে।

সম্প্রতি (১৯৬৩) বিলাতের Pergamon Press এই সম্বন্ধে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছেন। পত্রিকাটির নাম হল *Information storage and retrieval including machine translation*। বৎসরে ৪টি খণ্ড প্রকাশিত হবে। মুখ্য সম্পাদক হলেন লণ্ডনের খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিক ও তথ্য বিজ্ঞানী J. Farradane। আঞ্চলিক সম্পাদক হিসাবে ফ্রান্স (E. de Grolier) আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানী এবং জাপানের পাঁচজন খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানী এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছেন। গ্রন্থাগারের জন্য বাৎসরিক চাঁদা হল £ 10।

আরেকখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হল ঃ

Scheele (M). Punched card methods in research and documentation; with special reference to biology. N.Y., Interscience, 1962. 282 p. $ 9·50.

বিজ্ঞপ্তি

সুভাষ চক্রবর্ত্তী বিরচিত

হাঁটি হাঁটি পা পা

উদীয়মান কথা সাহিত্যিক সুভাষ চক্রবর্ত্তী অকালে দেহত্যাগ করেছেন। ৺সুভাষ চক্রবর্ত্তীর জননী পুত্রের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত 'হাঁটি হাঁটি পা পা' বইখানির অনেকগুলো কপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিতরণ ক'রবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে দান ক'রেছেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, সভ্য তালিকাভুক্ত গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে বইগুলোকে বিতরণ ক'রবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সভ্যতালিকাভুক্ত কোন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক বা সম্পাদকের পরিচয় পত্র সহ কোন প্রতিনিধিকে বিকেল ৪টে থেকে রাত ৯টার মধ্যে পরিষদের সাধারণ কার্য্যালয় ৩৩, হুজুরীমল লেন থেকে বইখানি সংগ্রহ করতে পারেন। রেজেষ্ট্রী ডাকে বই নিতে হলে খরচ দিতে হবে। যিনি আগে আসবেন তাঁর দাবীই আগে বিবেচনা করা হবে।

সম্পাদকীয়

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে (৪)

(খ) গ্রন্থাগার গৃহ : আসবাব পত্র

গ্রন্থাগার গৃহ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আসবাব পত্রের কথাও বিবেচনা করতে হবে। আসবাব পত্রের সম্বন্ধে যে সমস্ত মান প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে কিছু তথ্য এখানে উদ্ধৃত হ'ল :

(১) ভারতীয় মানক সংস্থার আসবাব পত্র সম্বন্ধে I S 1829 (Pt I) : 1961 মানের কথা গ্রন্থাগার গৃহ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। এই মানটি কেবলমাত্র কাষ্ঠ নির্মিত আসবাব পত্রে সীমাবদ্ধ। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপযোগী পৃথক কোন আসবাব পত্রের কথা এখানে উল্লেখিত হয়নি। এই মান অনুযায়ী টেবিল এবং চেয়ারের উচ্চতা হল যথাক্রমে ৭৫ সেঃমিঃ এবং ৪৫ সেঃমিঃ।

(২) আমেরিকার প্রচলিত মান হল :

	টেবিল	চেয়ার
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪"—২৬" (৬১সেঃমিঃ—৬৬সেঃমিঃ)	১৪", ১৬" (৩৫·৬সেঃমিঃ, ৪০সেঃমিঃ)
উচ্চ বিদ্যালয় (ছোটদের)	২৭" (৬৮·৬সেঃমিঃ)	১৭" (৪৩·২সেঃমিঃ)
উচ্চ বিদ্যালয় (বড়দের)	২৯", ৩০" (৭৩·৭সেঃমি,৭৭·২সেঃমি)	ঐ

[*U S. National Bureau of standards. School Tables. 1943*]

(৩) *Unesco bulletin for libraries* (November—December 1962) পত্রিকায় Jean Bleton লিখিত Furnishing small libraries প্রবন্ধে নিম্নলিখিত মান সুপারিশ করা হয়েছে :

	টেবিল	চেয়ার
শিশু	৫৫ সেঃ মিঃ	৪০ সেঃ মিঃ
বালক	৬২ সেঃ মিঃ	৩৬ সেঃ মিঃ
বয়ঃপ্রাপ্ত বালক	৬৯ সেঃ মিঃ	৩১ সেঃ মিঃ

(৪) গ্রেট বৃটেনের মান নিম্নরূপ ঃ

	টেবিল	চেয়ার
বালক	*২৬" (৬৬ সেঃ মিঃ)	১৪", ১৬" (৩৫·৬, ৪০সেঃমিঃ)
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র	৩০" (৭৬·২ সেঃ মিঃ)	১৮" (৪৫·৭ সেঃ মিঃ)

*বালকদের জন্য ২৪ এবং ২৮ ইঞ্চি উচ্চতাযুক্ত কয়েকটি টেবিল রাখাও উচিত।
(Stott, C.A. School libraries London School Library Association, 1955. P.21)

পাঠক প্রতি টেবিলে কত স্থানের প্রয়োজন ?

(১) ভারতীয় মানক সংস্থা ঃ ২ মিঃ × ·৭০ টেবিলে ৩ জন পাঠক

(২) আমেরিকা ঃ ৩ ফুঃ × ৫ ফুঃ (·৯১৫ মিঃ × ১·৫২৫ মিঃ) ৪ থেকে ৬ জন পাঠক

(৩) John Bleton ঃ পাঠক প্রতি ·৬৫ মিঃ × ·৪০ মিঃ
বালকদের জন্য ·৫৫ মিঃ × ·৪০ মিঃ

(৪) গ্রেট বৃটেন ঃ ৫ ফুঃ × ৩½ ফুঃ
অর্থাৎ (১·৫২৫ মিঃ × ১·০৬৭ মিঃ) আকারের টেবিলে ৬ জন পাঠক।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আসবাব পত্র আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন। আসবাব পত্রের মধ্য দিয়ে যেন "ক্লাশ রুমের" আবহাওয়া পরিস্ফুট না হয়ে উঠে।

শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম উপ-গ্রন্থাগারিক পদে উন্নীত হবার সংবাদে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ আনন্দিত হবেন। শ্রীসেনগুপ্ত অন্যতম সহঃ সভাপতি হিসাবে পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ এবং পরিষদের দৈনন্দিন কার্যসূচীর তিনি একজন সক্রিয় সহায়ক।

সূচীকরণ সম্বন্ধে শ্রীসেনগুপ্ত একজন বিশেষজ্ঞ। ভারতীয় নামের সূচীকরণ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর মতামত আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। সূচীকরণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের কৃতী ছাত্র শ্রীসেনগুপ্তের অন্য একটি পরিচয় অনেকের অজ্ঞাত। ইংরাজী ভাষা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগের কথা তিনি সযত্নে গোপন করে রাখেন। এ সম্বন্ধে তাঁর দুখানি বই সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।*

বিনয় নম্র শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্তকে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

---

* (১) Lectures on Philology 4th ed. Calcutta Modern Book Agency, 1963 (২) Catechism on the history of English literature, 4th ed. Calcutta, Modern Book Agency, 1963.

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

এ ই সং খ্যা য়

ত্রয়োদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা আষাঢ় ১৩৭০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ত্রয়োদশ বর্ষ] আষাঢ় ঃ ১৩৭০ [তৃতীয় সংখ্যা

এ. আর. হিউইট

ভারতের 'পাবলিক লাইব্রেরী' আইন ঃ বিধি, খসড়া ও সুপারিশগুলির তুলনামূলক বিচার

বর্তমান ভারতের অনেক গ্রন্থাগারকেই 'পাবলিক লাইব্রেরী' বলা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অধিকাংশই সে নামের যোগ্য নহে। বিভাগীয় গ্রন্থাগার, শিক্ষাসংক্রান্ত ও বিশেষ গ্রন্থাগার ছাড়াও এমন অনেক গ্রন্থাগার আছে যেগুলি সরকার এবং কোন কোন পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত। অনুরূপভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সমিতি কর্তৃক স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির বেশীর ভাগই Subscription Library, অর্থাৎ যাঁহারা চাঁদা দিয়া থাকেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই বাড়ীতে বই লইবার সুযোগ পান। ইহাদের মধ্যে অনেক গ্রন্থাগার সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে অসতর্কভাবে 'পাবলিক লাইব্রেরী' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু 'পাবলিক লাইব্রেরী' বলিতে সাধারণতঃ যা বোঝায় তা এই যে এগুলি সর্বসাধারণের জন্য নিঃশুল্ক হইবে এবং ইহাদের ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণতঃ পার্লামেন্টের আইন অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে।

ইংলণ্ডে পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৫০ সাল হইতেই ছিল—ঐ বৎসরের একটি আইন স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের অধিকার দিয়াছে। ইহার পর আরও আইন হইয়াছে; যদিও ক্ষমতা তখন বাধ্যতামূলক ছিল না, অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল এবং এখনও তাহাই রহিয়াছে তবু সমগ্র দেশ জুড়িয়া চমৎকার পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনে অনেকেই ইচ্ছুক। বস্তুতঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানকে যদি সফল করিতে হয় তাহা হইলে প্রকৃত পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা বিধান এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ সেই অভিযানে নিশ্চয়ই প্রধান বিষয় রূপে উপস্থাপিত হইবে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক ভারতে পাবলিক লাইব্রেরী আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁহার মত ইতিপূর্বেই প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখানে সেগুলি পুনরাবৃত্তির অভিপ্রায় নাই।[১]

(১) রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার বুলেটিন; নভেম্বর, ১৯৬২

পাবলিক লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ডঃ রঙ্গনাথন বলিয়াছেন, 'সাক্ষরতার সার্বজনীন অনুশীলনেই নিঃশুল্ক পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। সার্বজনীন পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা ছাড়া সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা ঠিক মাটির দেওয়াল দিয়া ছাদহীন বাড়ী বানানোর মত' (লাইব্রেরী পারসোনালিটি এণ্ড লাইব্রেরী বিল ১৯৫৮)। সিন্‌হা রিপোর্টে বলা হইয়াছে, 'যদি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা গণতন্ত্রের পূর্বসর্ত হয় তবে নিঃশুল্ক পাবলিক লাইব্রেরীর গৌরবজনক ভূমিকা অস্বীকার করার কোন যুক্তি নাই।'

একমাত্র বিধিবদ্ধ শাসন দ্বারা অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় আইন প্রণয়ন করিয়াই উপযুক্ত পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে। "গ্রন্থাগার উন্নয়ন সমিতির রিপোর্ট", (বোম্বাই, ১৯৩৯ ৪০) এবং সিন্‌হা রিপোর্ট (১৯৫৯) এই উভয় রিপোর্টেই ভারতের পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলিতে এবং বর্তমান প্রদেশগুলিতে লাইব্রেরী ব্যবস্থা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যাহা কিছু করা হইয়াছে সে সব লইয়া সুরু করিয়া এই রিপোর্ট প্রকাশকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ করা হইয়াছে।" ঐরূপ আর একটি রিপোর্ট দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

সিন্‌হা রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত হঠাৎ সরকারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাম্য গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন খুব প্রবল হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইলে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দিকে পুনরায় মন দিবার সময় ও সুযোগ হয় এবং যে ফসলাভ হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল। ১৯৪৬ সালে ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের জন্য একটি খসড়া রচনা করেন। বিধি পুস্তকে প্রথম যে আইন স্থান পাইল তাহা অবশ্য ডঃ রঙ্গনাথনের অপর একটি খসড়াকে অবলম্বন করিয়া মাদ্রাজ রাজ্যের জন্য রচিত হয় এবং মাদ্রাজ পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাক্ট, ১৯৪৮ নামে পরিচিত হয়। (No. XXIV of 1948)। ইহার পরে হায়দ্রাবাদ পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাক্ট, ১৯৫৫ (No. III of 1955) রচিত হয়। পুরাতন হায়দ্রাবাদ রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশের সঙ্গে এক হইয়া যাওয়ায় এখন ইহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর ডঃ রঙ্গনাথন পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার বিল, ১৯৫৮এর খসড়া প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করেন।[১]

১৯৫৭ সালে শ্রীকে. পি. সিন্‌হার সভাপতিত্বে শিক্ষামন্ত্রী একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটি ১৯৫৯ সালে ইহার রিপোর্ট পেশ করেন।[২] এই দলিলটি

---

(১) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত।

(২) ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নয়াদিল্লী, ১৯৫৯; পরিমার্জিত সং ১৯৬০; পরে ইহাকে সিন্‌হা রিপোর্ট বা শুধু সিন্‌হা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভারতে পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহাতে গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "এই আইন বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে বর্তমানে প্রচলিত পৌর আইনগুলির প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া সংশোধিতরূপে অথবা বিস্তৃত রাজ্য গ্রন্থাগার আইনের রূপ লইতে পারে। আমরা পরবর্তী বিকল্পটিকেই সুপারিশ করি।"

এই সুপারিশের ফলে ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি আদর্শ রাজ্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ণ করিবার জন্য ডঃ ডি. এম. সেনের সভাপতিত্বে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ১৯৬২ সালের প্রথম ভাগে ব্যাখ্যা সম্বলিত আইনাবলীর একটি নমুনা প্রকাশ করেন।[৩] গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় তৃতীয় আইন অন্ধ্র প্রদেশ আইন, ১৯৬০ পাশ হইয়াছে এবং ইহার পর বৎসর ইহা গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী—সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। নতুন প্রদেশের যে যে অংশে মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ আইন চালু ছিল এই আইনে তাহা বাতিল হয়। ১৯৬০ সালে একটি খসড়া আইন ডঃ রঙ্গনাথন কর্তৃক প্রণীত হয় কেরালা প্রদেশের জন্য।[৪] অন্যান্য যে সকল আইন সম্বন্ধে কেবলমাত্র উল্লেখ করিলেই চলে, তাহা হইল, প্রেস এবং পুস্তক ও পত্র পত্রিকাসমূহের রেজিষ্ট্রেশন আইন, ১৮৬৭, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এ্যাক্ট, ১৯০২ এবং ১৯৪৮ সালের, পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রদান আইন (পাবলিক লাইব্রেরীগুলির) ১৯৫৪, এই সবগুলিই এই আলোচনার বহির্ভূত। শ্রী কে, বি, সত্যনারায়ণ কর্তৃক ভারতের পাবলিক পাইব্রেরী আইন, ১৯৬২'—এই নামে একটি কার্যোপযোগী সংকলনের উল্লেখ করিতে হয়।[৫] ইহাতে মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ এবং অন্ধ্র প্রদেশের আইনসমূহ এবং নিয়মাবলী এবং অন্যান্য যে সকল আইনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি এবং বর্তমান লেখকের 'সামারি অব পাবলিক লাইব্রেরী ল' (Summary of Public Library Law) হইতে উদ্ধৃত অংশ আছে।

যে সকল আইন পাশ হইয়াছে সেগুলি, কতকগুলি খসড়া ও আদর্শ বিল এবং সিন্‌হার সুপারিশ পর্যালোচনা করিলে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের অভিমত ও মতপার্থক্য প্রকাশ পায়।

এই সমস্যার সহিত জড়িত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি যথা—রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, রাজ্য গ্রন্থাগার, বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় লাইব্রেরী কমিটি এবং রাজস্ব সম্বন্ধে উপরোক্ত মতামতগুলির তুলনামূলক বিচার কাজে লাগিতে পারে।

---

(৩) পরে ইহাকে দিল্লী খসড়া বলা হইয়াছে।

(৪) গভর্ণমেন্ট প্রেস ত্রিবিন্দ্রাম ১৯৬০।

(৫) ল' অব পাব্লিক লাইব্রেরীজ ইন ইন্ডিয়া। দি ল' বুক কোম্পানী, এলাহাবাদ।

রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ

মাদ্রাজ আইন কিংবা অন্ধ্রপ্রদেশ আইনএর কোনটিতেই প্রদেশ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নাই কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিতেই স্টেট লাইব্রেরী কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমটিতে ১৭জন ও শেষোক্তটিতে ২৭ জন সদস্য এবং এই দুইটি আইনেই শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রীকে কমিটিতে লওয়া হইয়াছে। এই আইন সমূহ হইতে উদ্ভূত বিষয়গুলি এবং অন্যান্য যে সকল বিষয় এই কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠানো হইবে সে সম্বন্ধে নিজ নিজ সরকারকে পরামর্শ দেওয়া তাহাদের কর্তব্য হইবে।

মাদ্রাজের জন্য নিয়মাবলীতে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। অপর পক্ষে হায়দ্রাবাদ আইনে শিক্ষামন্ত্রীকে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বলিয়া বিশেষভাবে অভিহিত করা হইয়াছে। সরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য শিক্ষা-মন্ত্রীকে সভাপতি, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রীকে সম্পাদক, শিক্ষাদপ্তরের সেক্রেটারী, শিক্ষা অধিকর্তা, রাজ্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, অপর ১২ জন এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃত্বগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদ গঠিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ খসড়া আইনেও সুপারিশ করা হইয়াছে যে, শিক্ষামন্ত্রী প্রদেশ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ হইবেন এবং শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী অথবা তাঁহার সহকারী, অপর ৭ ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি প্রদেশ গ্রন্থাগার কমিটি তাহাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য থাকিবে।

সিন্‌হা রিপোর্টে সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদের সুপারিশ করা হইয়াছে—ইহার সভাপতি হইবেন শিক্ষামন্ত্রী এবং ইহা রাজ্যের পাবলিক লাইব্রেরী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিবে ও পরামর্শ দিবে। পরবর্তী রিপোর্টে এই সুপারিশের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে এইভাবে, "রাজ্য গ্রন্থাগারের একটি সংসদ থাকিবে"। যেন এই সংসদ কেবলমাত্র রাজ্য গ্রন্থাগারের উপরই কর্তৃত্ব করিবে। কিন্তু মনে হয় এই সংসদ রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগারের উপর কর্তৃত্ব করিবে ইহাই অভিপ্রেত ছিল। রিপোর্টে ইহাও সুপারিশ করা হইয়াছে যে, রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ভার অনধিক ৭ জনের দ্বারা গঠিত রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদের কার্যকরী সমিতির উপর থাকিবে।

কেরালা খসড়ায় একটি রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং তাহা হইল শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁহার পরামর্শদাতা একটি রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি। এই কমিটিতে উক্ত মন্ত্রী (সভাপতি), স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রী, রাজ্য গ্রন্থাগারিক, শিক্ষা অধিকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য ব্যক্তি থাকিবেন।

পরিশেষে দিল্লী খসড়া সুপারিশ করিয়াছে যে, রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ দুইটি সংস্থা লইয়া গঠিত হইবে—রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদ ও রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার। প্রথম

সংস্থাটি শিক্ষামন্ত্রী (সভাপতি), রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধিকর্তা, শিক্ষা বিভাগের সচিব, শিক্ষা অধিকর্তা (বিভিন্ন রাজ্যে তাঁহার যে নামই থাকুক না কেন), রাজ্য গ্রন্থাগারিক, অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কতিপয় মনোনীত সদস্যের দ্বারা গঠিত হইবে। কিন্তু ইহাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহের কোন প্রতিনিধিত্ব থাকিবে না। ইহা ছাড়া সংসদের ৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি স্থায়ী পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করিতে হইবে। রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের দ্বিতীয় অংশ রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার রাজ্য শিক্ষা বিভাগের আওতার মধ্যে গঠিত হইবে। রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধিকর্তা পদাধিকার বলে রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদের ও স্থায়ী পরামর্শ দাতা কমিটির সম্পাদক থাকিবেন এবং রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্মকর্তা হইবেন। স্পষ্টতই, এই অধিকারকে একটি শাসন কর্তৃত্ব সম্পন্ন সংস্থা এবং সরকারের শাসনযন্ত্রের অংশরূপে দেখা হইয়াছে। একটি পরামর্শ দাতা কমিটি এবং অপরটি শাসন কর্তৃত্ব সম্পন্ন সংস্থা—এই দুইটি সংস্থা লইয়া গঠিত রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃত্ব কি করিয়া সুচারুভাবে কাজ সুসম্পন্ন করিবে ইহা প্রত্যক্ষ করা কঠিন। একেবারে প্রায় সম্পর্কবিহীন কার্যাবলীকে ভালরূপে মেলানো যায় না এবং দেখা গিয়াছে যে, লক্ষ্য ও উপায়ের স্বচ্ছতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। পরামর্শ দাতা ও তদারকি ক্ষমতাকে সরকারী ও শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা হইতে পৃথক করিলেই ভাল হয়।

রাজ্য গ্রন্থাগার

মাদ্রাজ আইনে বিশেষ করিয়া এই নামে কোন গ্রন্থাগার নাই কিন্তু ইহাতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে পাবলিক লাইব্রেরীগুলির অধিকর্তার উপর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনার দায়িত্ব থাকিবে। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সরকার গঠন করিবেন অথবা উপস্থিত কোন সরকারী গ্রন্থাগারকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রূপে স্বীকার করিয়া লইবেন। রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গঠন সম্বন্ধে পরামর্শ দিবে এবং ইহার পরিচালনার জন্য একটি নীতি নির্ধারণ করিবে। অন্ধ্র প্রদেশ গ্রন্থাগারের নিয়মাবলীতে হায়দ্রাবাদের আসাফিয়া গ্রন্থাগারকে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পাবলিক লাইব্রেরী সমূহের অধিকর্তা ইহার তত্ত্বাবধান করিবেন। কোন আইনেই রাজ্য গ্রন্থাগারের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ অথবা অর্থ, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। কোন অধিকার বলে এইসব গ্রন্থাগার তাহাদের ক্ষমতা লাভ করিবে? পুরাতন হায়দ্রাবাদ আইনও এই ব্যাপারে কিছু অস্পষ্টতা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ খসড়া বিধিবন্ধ করিয়াছে যে, রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রাজধানী অথবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার

দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং রাজ্য গ্রন্থাগারিক রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনা করিবেন। কিন্তু এই খসড়ায় আবার ইহার বেশি ব্যবস্থা রাখা হয় নাই— যেমন ইহার অর্থ, জমি ও ভবন সংগ্রহের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

সিন্‌হা রিপোর্ট সুপারিশ করিয়াছে যে প্রত্যেক রাজ্যে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার থাকিবে। এই রিপোর্টে রাজ্য গ্রন্থাগারের দুইটি শাখা একটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও একটি রাজ্য লেনদেনকারী গ্রন্থাগার কার্যাবলীও নির্ধারণ করা হইয়াছে।

কেরালা খসড়ায় রাজ্য গ্রন্থাগারের বিষয় একটু বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। ইহা ত্রিবন্দ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীকে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আখ্যা দিয়াছে এবং ইহাতে কপি রাইট, আন্তঃ গ্রন্থাগার লেনদেন, গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং বৃত্তি-কুশলত্ব সংক্রান্ত কাজ, অর্থ এবং অন্যান্য কার্যাবলী ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের স্থান রহিয়াছে।

দিল্লী খসড়ায় একটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা আছে এবং সম্পূর্ণ একটি ধারা ইহার জন্য রাখা হইয়াছে।

যে বিধিবন্ধ দলিলের বলে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কার্য পরিচালনা করিবে সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের শেষে আরও আলোচনা বিষয়।

বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ

মাদ্রাজ আইনে কোন পাবলিক লাইব্রেরী বিভাগ বা অধিকারের উল্লেখ নাই। ইহাতে অবশ্য বিধিবন্ধ আছে যে পাবলিক লাইব্রেরী সমূহের একজন অধিকর্তা নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার কাজও একটু বিস্তারিতভাবে ইহাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ডঃ রঙ্গনাথনকৃত প্রথম আদর্শ আইনে লাইব্রেরী সমূহের অধিকারসহ একটি লাইব্রেরী সংক্রান্ত বিভাগ স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু রঙ্গনাথনের ভাষায় বলিতে গেলে, সরকারকে 'লাইব্রেরীসমূহের বিভাগ' শব্দকে 'জনশিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র অংশ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে বলা হইয়াছিল এবং জনশিক্ষা বিভাগের অধিকর্তাকে পদাধিকার বলে লাইব্রেরীসমূহের অধিকর্তা করা হইয়াছে।" এই নীতি সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনা তাঁহার 'Library personality and Library Bill : West Bengal, 1958 গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে (পৃঃ ২০-২১)।

হায়দ্রাবাদ আইনের আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি পৃথক পাবলিক লাইব্রেরী সমূহের বিভাগ গঠন এবং একজন অধিকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ঐ ধারায় অবশ্য ইহাও রহিয়াছে যে, সরকার হয় ঐ বিভাগের জন্য পৃথক একজন অধিকর্তা অথবা জনশিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগ করিবেন।

অন্ধ্র প্রদেশ আইনে বলা হইয়াছে যে সরকার পাবলিক লাইব্রেরীসমূহের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন করিবেন, কিন্তু হায়দ্রাবাদ আইনের মত ইহাতে

ঐ বিভাগের জন্য একজন স্বতন্ত্র অধিকর্তা অথবা পাবলিক লাইব্রেরী সমূহের অধিকর্তারূপে একজন জনশিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

জনশিক্ষা হইতে গ্রন্থাগার বিষয়কে পৃথকীকরণ সম্পর্কে মাদ্রাজ আইনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সমালোচনা করিলেও ডঃ রঙ্গনাথন তাঁহার পশ্চিম বঙ্গ খসড়ায় পাবলিক লাইব্রেরী সমূহের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ রাখার ব্যবস্থা করেন নাই, সম্ভবতঃ কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি ইহাতে সুপারিশ করিয়াছেন যে, পুরা সময়ের জন্য একজন উপযুক্ত রাজ্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিতে হইবে এবং তাঁহার দপ্তরের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় মঞ্জুর করিতে হইবে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনা করা ছাড়া উক্ত আইনানুযায়ী স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃত্বগুলির ক্ষমতা ব্যবহার এবং কর্তব্য পালন সম্পর্কে তত্ত্বাবধান করা, নির্দেশ দেওয়া এবং তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখাও তাহার কাজ হইবে। স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃত্বগুলির দ্বারা তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালিত হইতেছে কিনা ইহা দেখিবার যে দায়িত্ব তাহার আছে তাহা পালনের জন্য স্বভাবতঃই তাহার একটি দপ্তরের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইহা উপলব্ধি করা গিয়াছে যে লাইব্রেরীসমূহের জন্য একটি বিভাগ এবং তাহার প্রধান হিসাবে একজন অধিকর্তা এমন কি তিনি যদি রাজ্য গ্রন্থাগারিকও হন, তাহা হইলেও থাকা প্রয়োজন।

সিন্‌হা রিপোর্টে দেখানো হইয়াছে যে লাইব্রেরীসমূহের জন্য বিভাগ শিক্ষা-বিভাগের অন্তর্গত করা যে অনভিপ্রেত তাহা অত্যন্ত পরিষ্কার। তথাপি এই রিপোর্টে প্রত্যেক প্রদেশে একটি স্বাধীন সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার অধিকার গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগই বা কেন হইবে না। সমাজ শিক্ষার অতিরিক্ত কোন সুযোগ ইহা হইতে আশা করা যাইতে পারে না।

রিপোর্টে চতুর্থ অধ্যায়ের পরে বলা হইয়াছে প্রত্যেক রাজ্যে একটি স্বাধীন সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সমূহের অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। যেখানে স্থানীয় কোন বিশেষ অবস্থার জন্য ইহা সম্ভব হইবে না, সেখানে অন্ততঃ শিক্ষা বিভাগের সহঃ-অধিকর্তার সমতুল্য পদ মর্যাদা সম্পন্ন, সর্ব সময়ের জন্য একজন অধিকতর অভিজ্ঞ, প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী থাকা প্রয়োজন। অন্যত্র ইহাতে লাইব্রেরীসমূহের অধিকর্তা এই ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে এবং তাঁহার কর্তব্যও নির্দেশ করা হইয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ক্ষেত্রে তাঁহার ক্ষমতা জনশিক্ষা অধিকর্তার তত্ত্বাবধানের বিষয় হইবে। ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, শিক্ষাবিভাগের (অথবা জনশিক্ষা) অধীনে অধিকর্তা বা বিভাগ নহে ইহার ফলে লাইব্রেরীসমূহের জন্য একটি স্বাধীন বিভাগ এবং লাইব্রেরী সমূহের জন্য একটি স্বাধীন অধিকর্তার জন্য দাবী করার এক বিরাট সুযোগ ইহাতে নষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথোচিত গুরুত্ব হইতেই বোঝা যায় আজিকার ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে গ্রন্থাগারের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগের সার্থকতা রহিয়াছে।

ডঃ রঙ্গনাথন তাঁহার কেরালা খসড়ায় এবং তাঁহার পূর্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ খসড়ায় যে সুপারিশ করিয়াছেন, যথা পুরা সময়ের জন্য উপযুক্ত একজন রাজ্য গ্রন্থাগারিক এবং একটি বিভাগ—তাহা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া।

দিল্লী খসড়ায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তরের সুপারিশ করা হইয়াছে কিন্তু তাহা রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত হইবে এবং শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম অথবা সহঃ অধিকর্তার সমতুল্য পদের একজন অধিকর্তাকে লইয়া রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃত্বের দপ্তর গঠিত হইবে। এখানেও আবার শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার সমান পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন স্বাধীন অধিকর্তার পরিবর্তে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত দপ্তর এবং ইহার অধিকর্তাকে আমরা শিক্ষাবিভাগের অংশ রূপে দেখিতে পাই। অধিকর্তা ও রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃত্বের একটি অংশ রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদের সম্পাদক এই উভয়রূপে রাজ্যের সমস্ত কার্য নির্বাহ করার জন্য তাঁহার উপর বিস্তৃত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে।

স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ

মাদ্রাজ শহরে পৌরসভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য (নির্বাচক মণ্ডলী কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত নহে) এবং আটজন মনোনীত সদস্য ; এবং (খ) প্রত্যেক জেলায় দশজন মনোনীত সদস্য জেলাবোর্ডগুলি এবং জেলার পঞ্চায়েৎগুলির সভাপতিগণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য ও জনসংখ্যা অনুযায়ী জেলাগুলির পৌরসভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য লইয়া মাদ্রাজ আইনে এক একটি স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃত্ব গঠন করা হইয়াছে। হায়দ্রাবাদ আইনে হায়দ্রাবাদ শহরের জন্য একটি, সেকেন্দ্রাবাদ শহরের জন্য একটি এবং এই আইনের ব্যবস্থানুযায়ী প্রত্যেক জেলায় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

অন্ধ্র প্রদেশে দুই শহর এবং প্রত্যেক জেলার জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃত্ব গঠণের ব্যবস্থা আইনে আছে। দুই শহরের জন্য কর্তৃত্ব চারজন মনোনীত সদস্য, তথাকথিত পাবলিক লাইব্রেরীগুলির পরিচালক সমিতি হইতে ছয়জন, হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ শহরের প্রত্যেক পৌরসংস্থার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন মাত্র সদস্য, রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক দুইজন মনোনীত সদস্য এবং হায়দ্রাবাদ শহরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে লইয়া গঠিত হইবে। জেলাগুলির কর্তৃত্ব চারজন মনোনীত সদস্য, তথাকথিত পাবলিক লাইব্রেরীগুলির পরিচালক সমিতি হইতে নির্বাচিত দুইজন সদস্য, প্রতি তালুকের গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতিগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন, জেলাগুলির পৌরসংস্থা অথবা পৌরসভা হইতে নির্বাচিত ২ জন, গ্রন্থাগার পরিষদের শাখা হইতে মনোনীত ২ জন এবং জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে লইয়া গঠিত হইবে। ক্রমশঃ

শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনুদিত।

মনোজ রায়

বই বাছাই ও বই কেনা

এ দেশের কোন এক বিখ্যাত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এতো যত্ন করে আমরা বই বাছাই করি, অথচ বই যখন সাজানো গোছানো হয়ে আলমারীতে ওঠে, তখন অনাদৃত মহিলার মত তারা নীরবে অপেক্ষা করতে করতে শেষকালে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক ও বিশীর্ণ হয়ে ওঠে। তারপর একদিন আবার একদল নতুন বইদের তাদের স্থান করে দিতে হয়।

কেন এমন হয়, এ কথা আলোচনা করতে গেলে বিভিন্ন ধরণের বই বাছাইয়ের কথাই আগে মনে হয়, যার মধ্যে ত্রিমূর্তির মিল থাকে—যথা লেখক, প্রকাশক আর পাঠক। এই ত্রিমূর্তির ব্যাপার নিয়ে বা বই বাছাইয়ের ব্যাপার নিয়ে মেদিনীপুরের সরকারী এক গ্রন্থাগারের একজন গ্রন্থাগারিক তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী বেশ মজার সংগে বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলছিলেন, ত্রিমূর্তির যিনি প্রধান পুরোহিত বা হোতা সেই পাঠক সমাজ মেদিনীপুরের গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ার দিন থেকে গ্রন্থাগারে ভীড় জমাতে সুরু করেন। তারপর কয়েক মিনিট থাকার পর তাঁরা একই অভিযোগ উপস্থিত করতে আরম্ভ করেন—'কি বই আনছেন মশায়—একখানাও পড়ার মত বই নেই। আজে বাজে সব বই—'

গ্রন্থাগারিক প্রথম প্রথম সন্ত্রস্ত থাকতেন—দেখলেই লুকোতে চেষ্টা করতেন। আবার বুঝি কোন বিদ্রুপের বাণ তাঁর প্রতি না নিক্ষিপ্ত হয়। শেষকালে তিনি একটা অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন—বই বাছাই ও বই কেনার কথা তুললেই তিনি তাঁদের সামনে কাগজ কলম এগিয়ে দেন—দয়া করে স্যার একটা লিষ্ট করে দিন। স্যার ততক্ষণে আমতা আমতা করছেন—আচ্ছা পরে হবে'খন বলে তিনি কেটে পড়েছেন। নাছোড়বান্দা গ্রন্থাগারিক এবার মাছের বাজারেও দেখা হলেও সেই একই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন—স্যার অন্ততঃ দু' একটা নাম বলুন—। স্যার এবার বোধ হয় নিতান্ত অভদ্রোচিত হবে তাই বাজারের থলি শুদ্ধ গ্রন্থাগারিকের মাথায় বাড়ি দেন নি। তবে সেদিন হতে এই সমাজটা কাবুলী দেখে পালানোর মতই পালিয়ে গিয়েছেন গ্রন্থাগারিককে দেখে।

পাঠক সমাজের চাহিদা তখনি হয়, যখন সহসা কোন বড় রকমের ঘটনা, দুর্ঘটনা বা ব্যাপার সংঘটিত হয়। যাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'টপিক্যাল ইন্টারেষ্ট'। যেমন বলা যেতে পারে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী। এখানে ত্রিমূর্তির এক সুষ্ঠু মিলন সংঘটিত হয়েছিল—লেখক, প্রকাশক আর পাঠক। পড়ুন আর নাই পড়ুন, সাজানো গোছানোর জন্যও এক শ্রেণীর পাঠক বই কিনতে মারামারি পর্যন্ত করেছিলেন। গ্রন্থাগারিককে সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়েছিল—বক্তা যাঁরা তাঁরা নিজেরা এসে টুকে নিতেন, সময় বিশেষে গ্রন্থাগারিককেও নোট টুকে টুকে নিতে হয়েছিল।

লেখক, প্রকাশক ও পাঠক সমাজের মধ্যে, তৃতীয়টি, অর্থাৎ পাঠক সমাজের স্তরের মধ্যে গ্রন্থাগারকে ফেলা যায়। আর বই কেনা আর বাছাই এই গ্রন্থাগার গুলিতেই বেশী হয়ে থাকে। অন্যান্য পাঠকেরা কি বই চান ? টপিক্যাল ইন্‌টারেষ্ট বাদ দিয়ে পাঠকেরা অবশ্য মোটামুটি দুই শ্রেণীর আছেন, পরীক্ষার্থী আর সাধারণ পড়ুয়া। পরীক্ষার্থীদের বই বাছাই বিশেষ কষ্টকর নয়। প্রকাশকেরা এটার উপরই নজর রাখেন বেশী, যেহেতু এ বাজারটা বেশ 'সাউণ্ড'। একটা ভাল পাঠ্য সংক্রান্ত বই প্রকাশ করতে পারলে তার বিক্রী অবধারিত। এই বাছাইটা যাতে আরো সুচারু রকম হয়, তাই বিশিষ্ট নামধারী ব্যক্তিকে দিয়ে এই ধরণের বই লেখানো হয়। এর বাজার সুনিশ্চিত, তাই প্রকাশকমাত্রই এইদিকে ঝোঁকেন সবচেয়ে বেশী। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক বইটাই যে নিশ্চিত বাজার পায় বা পাবে, তার স্থিরতা না থাকাতে সঙ্গে সঙ্গে অন্য বইও কিছুটা প্রকাশ করতে হয়। এ ব্যাপারে কি ধরণের বই বাছাই করা হয় ? মেদিনীপুরের গ্রন্থাগারিকের ঘটনা থেকে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়, পাঠক তখনি বলে ভাল বই যখনি ট্যপিক্যাল সাবজেক্টের ওপর বই লেখা হয়। আর নিজের পাণ্ডিত্যের উপর অগাধ বিশ্বাস থাকতে অনুযোগ উপস্থিত করে—'কি বই রেখেছেন মশাই'। কিন্তু যখনি সত্যি সত্যি তাঁর জ্ঞানের ওপর গিয়ে টান পড়ে তখনি ফিরে যেতে হয়। তিনি যে পাণ্ডিত্যকে বাদ দিয়ে শুধু 'টপিক্যাল ইন্টারেষ্টের' বই চান একথা স্বীকার করতেও তাঁর সঙ্কোচ হয়।

টপিক্যাল বইয়ের বাজার অনেকটা সুনিশ্চিত হলেও এর আয়ু খুব কম। গ্রন্থাগারগুলির এদিকটায় নজর মোটামুটি থাকে ভাল। তাঁদের পড়ুয়া সারা বছরের, তাই শুধু টপিক্যাল ইন্‌টারেষ্টেড বই হলে তাঁদের চলে না। যেহেতু দেশে মিটিং লেগে রয়েছে আর সেখানে হোমরা চোমরাদের বক্তৃতা তৈরীর জন্যই মাত্র টপিক্যাল ইন্‌টারেষ্টের বইয়ের প্রয়োজন হয়, আর তা বড় বড় দু একটা গ্রন্থাগার হয়তো চাপে পড়ে কেনে, সেহেতু সাধারণ গ্রন্থাগার সারা বছরের ফসলের কথাই ভাবেন। অথচ এ জগৎটার দিকে প্রকাশক আর বিক্রেতারা খুব বিশেষ আগ্রহ করে এগিয়ে আসেন বলে মনে হয় না। এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা না থাকাতে এই সব গ্রন্থাগার চিরাচরিত বই বাছাইয়ের পন্থা অবলম্বন করে থাকেন—অর্থাৎ যে লেখকেরা নাম করেছেন তার বইই কিনতে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট গ্রন্থাগারে বসে একজন বই বাছাইয়ের কর্মী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দেখেন—সমালোচক হতে আরম্ভ করে উপন্যাস-বা গল্প লিখিয়েদের লেখা এক বছরে অন্ততঃ হারে পাঁচ ছয় খানার কম হয় না। কিন্তু পড়ার মত বই বেশী হয় না।

এই সব বড় বড় গ্রন্থাগারে বহু টাকার বই কেনা হয়, বইয়ের সংখ্যাও কম হয় না, কিন্তু লেখকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

বিদেশের লেখকদের বা বিদেশ থেকে আসা বইয়ের এ সব হাঙ্গামা নেই। খুব আশ্চর্য হতে হয় ভারতের বিভিন্ন চিন্তাধারা কৃষ্টি, অর্থনৈতিক পটভূমি, ইতিহাস, প্রাচীন, আধুনিক জ্ঞান, শিল্পকলা প্রায় সমস্ত লেখা বিদেশের লেখকদের। সেদিন-

কার ঘটনা, বাংলার বুকে দাঙ্গা, তেলেঙ্গানার সংগ্রাম, মুদ্রার ব্যাপার প্রভৃতি রিপোর্ট—জি, নম্বিত তারা একজন বিদেশিনী প্রামাণ্য হিসাবে বই প্রকাশ করেছেন। অথচ এ বিষয় নিয়ে এদেশীয় কোন লেখকের প্রামাণ্য গ্রন্থ আজও প্রকাশ হয়েছে বলে জানা নেই।

কাজেই বড় বড় গ্রন্থাগারের বই বাছাই হওয়ার পর দেখা যায় লাখ টাকায় নব্বুই হাজার টাকার বই এসেছে বিদেশ থেকে—আর দশ হাজার টাকার বই এসেছে মাত্র একশোটি লেখকের হাত থেকে! এ দেশে লেখকদের সংখ্যা খুবই নির্দিষ্ট।

এর কারণ পাঠ্যজগৎ থেকে আমরা দূরে সরে যেতে পারিনি, পারছিও না। যুদ্ধোত্তর জগতে দুটো বিষয়ে পড়ানোর দিকে ঝোঁক এসেছে—কমার্স আর পলিটিকস্। দুটো বিষয় পাশ করতে পারলে আজকাল চাকরী পাওয়া সহজ হয়ে গয়েছে—তাই প্রকাশকেরা এখন ঝুঁকেছেন এই দুইটি বিষয়ের দিকে।

বিদেশের প্রকাশকদের কথা সহজেই বোঝা যায়। ইংলণ্ড আর আমেরিকা এই ধরণের বই প্রকাশের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সবচেয়ে দুঃখের আশংকার জিনিস হোল বিদেশের প্রকাশকেরা এদেশের বাজার দখল করে নিচ্ছেন। অজস্র টাকা খরচ করে দেশীয় প্রকাশকদের ব্যবসাকে ঠুঁটো করে দিতে আরম্ভ করেছেন। বই বাছাই করতে গিয়ে এই ব্যাপারটি দেখে আতঙ্কিত হতে হয়।

যুদ্ধোত্তর জগতে এদেশী পাঠকদের জানবার প্রকৃত আগ্রহকে বিদেশী প্রকাশকেরা সহজেই নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন। ফলে এদেশের বাজার সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। এই আগ্রহ যাতে বজায় থাকে এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রভৃতি সংস্থা বছরে হাজার হাজার টাকা শুধু বই কেনার জন্যই দিয়ে যাচ্ছেন। আর তা হতে প্রকাণ্ড, শুধু প্রকাণ্ড নয় প্রায় গোটা টাকাটাই বিদেশে প্রকাশিত বা ছদ্মবেশধারী বিদেশী প্রকাশকদের হাতে চলে যাচ্ছে!

বই বাছাই আর বই কেনার সময়ে যে সব কর্মীরা এই ব্যাপারে লিপ্ত আছেন তাঁদের অতি দুঃখে এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। ধরুণ যেমন 'উনটুর-এক্সকাভেসনস' আরকিওলজিক্যাল সিরিজের বই লিখেছেন ডঃ এফ, আর, অলচিন, 'আইকোনগ্র্যাফী অফ টিবেটন লামাইজিম' লিখেছেন কে, গর্ডন; 'ইন্টারন্যাসন্যাল পলিটিক্স এণ্ড ফরেন পলিসি' লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন 'জেমস্ এন্ রোজেনাউ' ইত্যাদি। এমন হাজার হাজার বই। বই বাছাই আর কিনতে গিয়ে মনে হয় এদেশের এবং সমগ্র এশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতির জ্ঞান বিদেশীরা কেড়ে নিচ্ছে আর তার জায়গায় পশ্চিমী সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ছে।

এটা দূর হয়ে যাবে, যদি এদেশের প্রকাশকেরা সাহস করে নতুন সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে আসেন। নতুন নতুন জগতের ইতিবৃত্ত তুলে ধরার জন্য লেখক গোষ্ঠীদের প্রেরণা দেন—সাহস করে সমগ্র দেশের শিল্প, সংস্কৃতি, কলা পরিচালনার সমস্ত ছাত্র নিজেরা গ্রহণ করেন। তাহলে দেশও যেমন উপকৃত হবে, আর্থিক সফলতা, স্বচ্ছলতা এগিয়ে আসবে—নতুন সম্ভাবনায় লেখক সমাজও আনন্দিত ও স্ফীত হয়ে উঠবে।

[বই, বৈশাখ ১৩৭০ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

বিদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—ইরান (৬)

অতি প্রাচীন কাল থেকে ইরাণের অধিবাসীরা বই এবং গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আগ্রহশীল। এক সময়ে Persepolis এ একটি বড় গ্রন্থাগার ছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরণো ধরণের বই—মাটির টালির উপর লেখা—এই গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার যখন Achaemenides এর রাজধানী পুড়িয়ে ফেলেছিলেন তখন এগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। কথিত আছে যে তিনি এই গ্রন্থ সম্ভারের কিছু অংশ আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন। Iran Bastan Museum এ অল্প সংখ্যক বই এখনো সংরক্ষিত আছে।

Sassanidদের আমলে ইরানীরা বই এবং গ্রন্থাগারের দিকে নজর দেন। বড় বড় শহরে যেমন Jondi-Shapur এ অনেক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। আরবদের আক্রমণের ফলে পুনরায় এই সমস্ত গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়ে যায়।

আব্বাসিদ খলিফারাও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। মামুন প্রথম সাধারণের পঠন পাঠনের জন্য বৃহদাকার এক গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। এই গ্রন্থাগার 'দার-আল-হিকাম' অর্থাৎ জ্ঞানের মন্দির নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে ইরাণীদের সাহিত্য সাধনায় আগ্রহ এবং পুস্তক সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির ফলে সাহিত্যানুরাগীগণ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

রাজা এবং রাজপুত্রগণ সুধী ব্যক্তিদের অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীর সুবিধার জন্য অথবা কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে পঠন পাঠনের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন করতেন। সাধারণতঃ চার রকম উপায়ে এই সমস্ত গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক সংগৃহীত হ'ত:

(১) ক্রয়। (২) পুঁথি থেকে নকল। সাধারণতঃ সমস্ত গ্রন্থাগারে নকলনবীশ নিযুক্ত করা হ'ত।

(৩) বিত্তবান এবং ধনী ব্যক্তিগণ মসজিদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'ওয়াকফ' হিসাবে তাদের গ্রন্থ সংগ্রহের সমস্ত স্বত্ব দান করে দিতেন।

(৪) অন্যান্য দান। ইরাণের লেখকগণ তাদের রচিত গ্রন্থ নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদের পাঠের জন্য মসজিদে দান করতেন। অন্যান্য ইসলামধর্মী দেশেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

ইরাণে আরব রাজত্বের অবসানের পর গ্রন্থাগারের প্রতি বেশী করে নজর দেওয়া হয়। গজনভীর সুলতান মামুদ একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। পরে এই গ্রন্থাগারের সমস্ত সম্পদ বুখারাসে স্থানান্তরিত হয়।

বাহা-আল্-দৌলার উজীর সাবুর বিন্ আর্দাশীর ৯৯১ খৃষ্টাব্দে ১০ হাজার

গ্রন্থ সমন্বিত একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। খোরসান এবং অক্সাস এ দুটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। প্রখ্যাতনাম ভুগোলবিদ আল্ মুকান্দাসী তাঁর একটি গ্রন্থে Shiraz এ আদুদ-আল্-দৌলা স্থাপিত একটি অতি বৃহৎ গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করেছেন। মুকান্দাসী লিখেছেন যে, আদুদ্-আল্-দৌলার সময় পর্যন্ত লিখিত এমন কোন বই নেই যা এই গ্রন্থাগারে পাওয়া যেত না।

নিজামল-মুল্ক নিশাপুর এবং অন্যত্র জনসাধারণের শিক্ষার জন্য কলেজ এবং মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। এই সমস্ত কলেজের শিক্ষকদের বেতনের জন্য শুধু অর্থ বরাদ্দ থাকতোনা—পুঁথি সংগ্রহের জন্য যথাযথ প্রচেষ্টাও করা হত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলদের আক্রমণে পারস্য দেশ বিধ্বস্ত হয়। শুধু জীবনহানি নয় অমূল্য গ্রন্থসম্পদ সহ আরও জিনিস সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল। পরবর্তীকালে হালাকু-খান-মার যে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করে এই ক্ষতি কিয়দংশে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বর্তমান যুগে ইরাণে অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার আছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশিত হল ঃ

১　তেহরাণ

জাতীয় গ্রন্থাগার ঃ ৬০ হাজার গ্রন্থ সমন্বিত জাতীয় গ্রন্থাগারের দ্বার ১৯৬০ সালে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ— পারসী এবং আরবী ১৭১৫০, ফরাসী ১৪৮৫৫, রাশিয়ান ৬৬০৩, ইংরাজী ৫৯৭০, জার্মানী ৮৯৪৬, বিবিধ ১০০০। এ ছাড়া ৪২০০, পুঁথি এবং ২০০ মাইক্রোফিল্ম এই গ্রন্থাগারে আছে।

Madjles Library ঃ ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠা হবার দিন থেকেই এর দ্বার সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। এই গ্রন্থাগারে আরবী এবং পারশী ভাষার ৫২ হাজার বই এবং ৭ হাজার পুঁথি আছে।

Senate Library ঃ স্থাপিত হয় ১৯৫০ সালে। এটি এখনও সাধারণের ব্যবহারের জন্য নয়। মুখ্যতঃ বিদেশী ভাষার ১৫০০ বই এই গ্রন্থাগারে আছে।

Library of Museum ঃ ১৯৩৬ সালে Iran Bastan Museum এ পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি বিশেষ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে।

তেহরাণ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ—ইরাণের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সর্বসমেত ৯৫ হাজার বই আছে। এ ছাড়া কারিগরী বিভাগে ৬০০ বিদেশী ভাষার বই আছে।

তেহরাণের Royal Library একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার। ১৫০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত এই গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান পুঁথির সংগ্রহ আছে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদে এই গ্রন্থাগার অবস্থিত।

এ ছাড়া সরকারী বিভাগ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার আছে :

(১) Library of Bank-e-Melli ১৯৩৮ সালে স্থাপিত। এই গ্রন্থাগারে ফরাসী, ইংরাজী, জার্মাণ, পারসী এবং আরবী ভাষার প্রায় ১৮ হাজার বই আছে।

(২) বিচার মন্ত্রণালয় গ্রন্থাগার : ১৯৩৭ সালে স্থাপিত এই গ্রন্থাগারে ৩৬০০ খানি বিচার এবং ইতিহাস বিষয়ক পুস্তক আছে।

২ মেশেদ

প্রাদেশিক গ্রন্থাগারের মধ্যে মেশেদ এর গ্রন্থাগারটি অন্যতম। এর প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ জানা নেই। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল এ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। এর পুস্তক সংখ্যা ২৭০০০।

৩ শিরাজ

শিরাজে তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার আছে : (১) জাতীয় গ্রন্থাগার—পুস্তক সংখ্যা ৯ হাজার। গ্রন্থাগারটি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য।

(২) নামাজি হাসপাতাল গ্রন্থাগার—পুস্তক সংখ্যা ৪৫০০।

(৩) Archaeological Library

৪ এস্হান

এস্ফাহানে পৌর প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার এবং American Council এর গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার : ফোর্ড ফাউণ্ডেশন এবং ফ্রাংকলিন পাবলিকেশনের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রায় ৪০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষকদের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষা দেবার জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় একটি শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে নির্বাচিত কয়েকজন শিক্ষা লাভ করে নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

[*Information Bulletin on Reading Materials* (Unesco) January, 1963, পত্রিকায় প্রকাশিত Dr. M. Mossaheb লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।]

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

জেরোগ্রাফী

গ্রন্থাগারে কোন বই বা পত্র-পত্রিকা থেকে প্রয়োজন মত কোন প্রবন্ধের প্রতিলিপি গ্রহণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে জেরোগ্রাফী অন্যতম। জেরোগ্রাফী কথার অর্থ হ'ল 'শুষ্ক মুদ্রণ' (Dry Printing)। প্রচলিত ফটোগ্রাফী থেকে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক।

ফটোগ্রাফী একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া পক্ষান্তরে জেরোগ্রাফী ভৌত এবং বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া।

এক পর্দা সেলেনিয়াম দিয়ে ঢাকা একখানি এলুমিনিয়ামের পাত হ'ল জেরো-গ্রাফীর আসল ভিত্তি। সেলেনিয়ামের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, অন্ধকারে এটি বৈদ্যুতিক অন্তরক অর্থাৎ এর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না। কিন্তু আলোতে বিদ্যুৎ পরিবাহী। সেলেনিয়ামের এই বিশেষ গুণের উপরই জেরোরাগ্রাফীর প্রক্রিয়া নির্ভর করে।

জেরোগ্রাফীর প্রথম ধাপ হ'ল সেলেনিয়াম মাখানো পাতখানিকে আলোক সংবেদী (light sensitive) করা। খুব সূক্ষ্ম বিদ্যুৎবাহী তার এই পাতের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় (চিত্র নং ১)। ফলে পাতখানির চার দিকের বাতাস আয়নিত (ionised) হয়। সেলেনিয়াম পজিটিভ আয়ন টেনে নিয়ে পাতখানিকে আলোক সংবেদী করে তোলে।

এখন এই পাতখানি (চিত্র নং ২) ফটোগ্রাফী ফিল্মের সঙ্গে তুলনা করা চলে। যে দলিলের প্রতিকৃতি গ্রহণ করতে হবে একটি ক্যামেরার সাহায্যে এই পাতের উপর অভিক্ষিপ্ত (project) করতে হবে (চিত্র নং ৩)। প্রতিকৃতির আকার প্রয়োজন মত বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। ক্যামেরার মধ্য দিয়ে যখন দলিলটির লেখা পাতের উপর অভিক্ষিপ্ত হয় তখন পাতের যে অংশ আলোর সংস্পর্শে আসে সেই অংশ থেকে পজিটিভ আয়ন অদৃশ্য হয়। যে অংশ অন্ধকারে থাকে সেখানে পজিটিভ আয়ন থেকে যায়। অর্থাৎ দলিলে যে অংশটুকুতে লেখা থাকে পাতে দলিলের প্রতিকৃতির অনুরূপ অংশটুকুতেই পজিটিভ চার্জ থাকবে।

এখন নেগেটিভ চার্জযুক্ত সূক্ষ্ম রেসিন চূর্ণ এই পাতের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রেসিন চূর্ণের রঙ কালো করে নেওয়া হয়। রেসিন চূর্ণ নেগেটিভ চার্জযুক্ত, সুতরাং পাতের যে অংশে পজিটিভ চার্জ আছে, কেবলমাত্র সেই অংশে রেসিন চূর্ণ লেগে থাকবে। যে অংশে চার্জ নেই, সেই অংশে রেসিন লেগে থাকবে না।

এরপর একখানি বন্ড কাগজ নিয়ে এই সেলিনিয়াম পাতের উপর রেখে পজিটিভ চার্জ দেওয়া হয়। কাগজখানি পাতের উপর রাখলে পাত থেকে রেসিন চূর্ণ এই কাগজে উঠে আসবে। অর্থাৎ রেসিন চূর্ণ দিয়ে গড়া মূল দলিলের একটি প্রতিকৃতি এই কাগজে স্থানান্তরিত হবে।

এখন একটি গরম রোলার কাগজখানির উপর দিয়ে চালিয়ে নিলে রেসিন গলে কাগজে এঁটে যাবে এবং কাগজের উপর প্রতিকৃতিটি স্থায়ী হয়ে যাবে।

জেরোগ্রাফী পদ্ধতি ১৯৪০ সালে আমেরিকায় C. F. Carlson আবিষ্কার করেছিলেন, বর্তমানে Xerox Corporation কৃত ৯১৪ নং মডেল গ্রন্থাগারের ব্যবহারের উপযোগী। এই মডেলে ৯"×১৪"র বড় কোন প্রতিকৃতি করা সম্ভব হয় না।

আমেরিকায় ৯৫ ডলারের বিনিময়ে যে কোন গ্রন্থাগার Xerox 914 ভাড়া নিতে পারে।

Xerox 914 যন্ত্রে প্রথম কপিটি করতে আধ মিনিট লাগে, তারপর প্রতি মিনিটে সাতটি করে কপি পাওয়া যাবে।

জেরোগ্রাফী কেমন করে কাজ করে ঃ
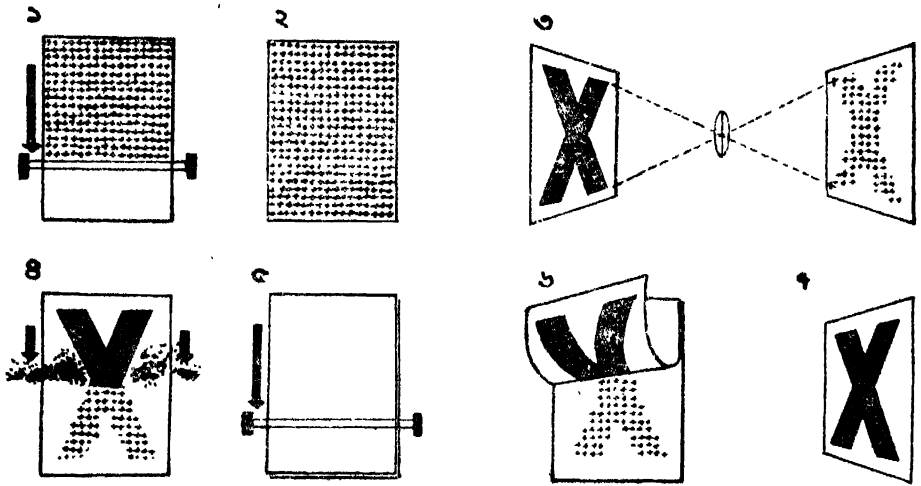
(১) সেলেনিয়াম মাখানো এলুমিনিয়াম পাতখানির উপর বৈদ্যুতিক তার চালিয়ে পজিটিভ চার্জ দেওয়া হচ্ছে।

(২) পজিটিভ চার্জ দেওয়ার পর অবস্থা।

(৩) X অক্ষরটির প্রতিকৃতি নিতে হবে। ক্যামেরার মারফৎ পাতের উপর এটি অভিক্ষিপ্ত হ'ল। প্রতিকৃতিটি এখানে উল্টো হয়ে পড়বে। পাতের উপর যেখানে X অক্ষরটির ছায়া পড়ল, সেই জায়গাটুকু ছাড়া অন্য সর্বত্র আলোর সংস্পর্শে আসার ফলে পজিটিভ চার্জ সরে গেল।

(৪) এবার কালো রঙের নেগেটিভ চার্জযুক্ত রেসিন চূর্ণ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পজিটিভ চার্জযুক্ত জায়গায় নেগেটিভ চার্জযুক্ত রেসিন আকৃষ্ট হয়ে লেগে থাকবে।

(৫) একখানি বণ্ড কাগজ পাতের উপর রেখে পজিটিভ চার্জ দেওয়া হয়।

(৬) কাগজখানা পজিটিভ চার্জযুক্ত হবার ফলে নেগেটিভ চার্জযুক্ত রেসিন চূর্ণ আবার এই কাগজে এসে লাগবে। এবার অবিকল প্রতিকৃতিটি এই কাগজে পাওয়া যাবে।

(৭) গরম রোলার চালানোর পর অবিকল স্থায়ী প্রতিকৃতি পাওয়া গেল।

[এই প্রবন্ধ লিখতে *Library Journal,* May 1, 1963, p. 1858-59 এবং Kirk & Othmer. *Encyclopedia of Chemical Techonology* (Vol. 11 p. 144-145) এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।]

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক

British Standards Institution. Guide to the Universal Decimal Classification (U D C). London, the Institute, 1963 128p. (B.S. 1000C : 1963) 15s.

গ্রেট ব্রটেনের Library Association এর অনুরোধে ব্রটেনের মানকসংস্থা (B S I) কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশনা পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এটি তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ (৪৫পৃঃ) ব্রটেনের খ্যাতনামা বর্গীকরণ ও সূচীকরণ শিক্ষক ও Modern outline of classification পুস্তক রচয়িতা J. Mills কর্তৃক লিখিত। গ্রন্থাগারে বর্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা, বর্গীকৃত গ্রন্থসূচী, বর্গীকরণ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধেও প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে UDC বর্গীকরণ তালিকা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন দেশের UDC ব্যবহারকারীদের একটি তালিকা সংযোজিত হ'য়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্ররা এই গ্রন্থখানি পাঠে উপকৃত হ'বেন। এটি Indian Standards Institution থেকে ক্রয় করা যেতে পারে।

বই ।। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার মুখপত্র। সম্পাদক : শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। প্রতি সংখ্যা ৫০ নঃ পঃ। বার্ষিক ৬ টাকা। মাসিক পত্র।

চৈত্র ১৩৬৯ সাল থেকে প্রথম প্রকাশ। বৈশাখ ১৩৭০ সংখ্যায় পাঠ্যপুস্তক জাতীয় করণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। নতুন বইয়ের তালিকা গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের সহায়ক হবে।

Jaylor (R S). Glossary of terms frequently used in scientific documentation. N. Y., [American Institute of Physics], 1962. [10] [5] p.

American Institute of Physics এর উদ্যোগে সংকলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত শব্দের পৃথক পৃথক কয়েকটি কোষ গ্রন্থের অন্যতম।

Aslib. The foreign language barrier in science & technology. London, Aslib, 1962. 12s.

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রপত্রিকার কৌলিন্য অনেকাংশে ম্লান হয়েছে। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এর অন্যতম কারণ। অন্য ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ইংরেজী জানা বৈজ্ঞানিকদের কাজে কি অসুবিধা সৃষ্টি করে এ সম্বন্ধে Asib Research Department পরিচালিত একটি সমীক্ষার বিবরণ। বৈজ্ঞানিকদের রুশ ভাষা শিক্ষাদান ব্যবস্থার ফলাফল এবং যে সমস্ত বিদেশী ভাষার

পত্র পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি প্রায়ই ইংরেজীতে অনূদিত হয় তার একটি তালিকা এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

Landau (T) *Compiler*. Library furniture and equipment. London, Crosby Lockwood, 1963. 81p. 25s.

গ্রেটবৃটেনের প্রখ্যাতনামা গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র নির্মাতাদের সচিত্র তালিকা থেকে সংকলিত।

Dag Hammarskjold Library. Bibliographical style manual $0·75 (U N Library's Bibliographical ser. ST/LIB/SER.B/8)

Ulrich's periodical directory. 10th edition. N. Y., Bowker, 1963.

সুপরিচিত পত্রপত্রিকার গ্রন্থপঞ্জীর নবতম সংস্করণ।

Thornton (John L). Medical librarianship principle and practice, London, Crosby Lockwood, 1963. viii, 153 p. 15 s.

আমেরিকার Medical Library Association প্রকাশিত সুপরিচিত গ্রন্থের অনুরূপ কিন্তু ক্ষুদ্রায়তনের নির্দেশ পুস্তিকা।

Wofford (A). Book selection in school libraries. N. Y., Wilson, 1962. 318p. $5·00.

পুস্তক নির্বাচনের নীতি, পদ্ধতি এবং নির্বাচনের সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে আলোচনা।

মুখ্যতঃ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে আলোচিত হলেও সাধারণভাবে সমস্ত গ্রন্থাগারের উপযোগী। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্ররা Drury এবং McColvin এর সঙ্গে এটি পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

Murra (K O), *Comp.* International scientific organizations : a guide to the library, documentation and information services. Washington, Library of Congress (General Reference and Bibliography Division, Reference Department), 1962. xi, 784 p. $3·25.

৪৪৯ বৈজ্ঞানিক সংস্থার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, ডকুমেন্টেশন কার্যকলাপের পরিচয় সহ একটি উল্লেখযোগ্য রেফারেন্স বই। বিভিন্ন দেশের ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র এই বইয়ের সাহায্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান প্রদানে সক্ষম হবেন।

Wallace (S L). So you want to be a librarian. N Y, Harper Low, 1963. $ 3·00.

বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে চাকুরীর সুযোগ সুবিধা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং পেশাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা। আমেরিকা এবং কানাডার যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষা দেওয়া হয় তার ঠিকানা, প্রতিষ্ঠা তারিখসহ একটি তালিকা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে।

International Federation of Library Associations. Libraries in the world. Holland, Martinus Nijhoff.

I F L A র ভবিষ্যত দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথ্য।

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী। রিষড়া (২৪ পরগণা), দেবদত্ত এন্ড কোং, ১৯৬৩। ৫৭ পৃঃ। ১·৭৫ নঃ পঃ।

যুগান্তর, গ্রন্থাগার, কথাবার্তা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধের সংকলনঃ গ্রন্থাগার—ভারতবর্ষ (ইতিহাস), গ্রন্থাগার—বঙ্গদেশ (ইতিহাস), গ্রন্থসূচী—গ্রন্থপঞ্জী, পুস্তক সংরক্ষণ ও ওরিয়েন্টাল ক্লাসিফিকেশন (সংক্ষিপ্তসার)। ৺সতীশ চন্দ্র গুহ মহাশয়ের প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থাগার পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৬৬) প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান যুগের গ্রন্থাগারিকদের নিকট প্রায় অজ্ঞাত এই বর্গীকরণ পদ্ধতিটিকে একটি বইয়ের মধ্যে ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা ছিল। শ্রীভট্টাচার্য বাংলাদেশের গ্রন্থাগার (২ খণ্ড) পুস্তকের লেখক।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ॥ বীরভূম ॥

গত ১৬ই জুন রবিবার প্রাত ৯ ঘটিকায় সময় রামরঞ্জন পৌরভবনে, বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, বিখ্যাত জননায়ক স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতি স্থাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী বর্ধমানের মহারাণী অধিরাণী শ্রীযুক্তা রাধারাণী মহতাব মহোদয়া। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুভাষ স্মৃতি পাঠাগার ॥ মেদিনীপুর ॥

সুভাষ স্মৃতি পাঠাগারের ত্রৈমাসিক মুখপত্র "প্রান্তর" পুনরায় প্রকাশিত হ'বে। পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ এই পত্রিকার জন্য উন্নত মানের লেখা পাঠানোর জন্য তরুণ লেখকদের অনুরোধ জানিয়েছেন। শিশুদের উপযোগী লেখাও সাদরে গৃহীত হবে। লেখা পাঠাবার ঠিকানা : সুভাষ স্মৃতি পাঠাগার, সুভাষ পল্লী (জায়নগর), পোঃ হরিয়া, মেদিনীপুর।

রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার ॥ মুর্শিদাবাদ ॥

জাতীয় সরকারের পল্লী গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনানুযায়ী রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার পল্লী গ্রন্থাগাররূপে উন্নীত হইয়া নবরূপায়ণে সুসংগঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থাগার ও নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব গত

৫ই জুন বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গ্রন্থাগার ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিক্রমা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীউমানাথ সিংহ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করেন মুর্শিদাবাদ জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবী শ্রীদুর্গাপদ সিংহ। দেশবন্ধু পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করিয়া একটি বিবরণী পাঠ করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রীত্রিভঙ্গমুরারী দত্ত। প্রধান অতিথি শ্রীভট্টাচার্য গ্রন্থাগার আন্দোলনে সরকারী পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

পাশলা বসন্তকুমার মেমোরিয়্যাল রুর‍্যাল লাইব্রেরী

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ৯ই জুন প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় মুর্শিদাবাদ জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাশুলো বসন্তকুমার মেমোরিয়াল রুর‍্যাল লাইব্রেরীর "দ্বারোদ্ঘাটন" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী শ্রীদুর্গাপদ সিংহ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। উদ্বোধন সংগীতের পর পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন সভাপতি শ্রীভট্টাচার্য। যে কাঁচি দিয়া ফিতা কাটা হয় তাহা সভার মধ্যে নিলাম বিক্রয় করেন শ্রীদুর্গাপদ সিংহ। সাগরদীঘির শ্রী ভকত ১১১৲ টাকায় কাঁচিটি লন এবং তৎক্ষণাৎ ডাকের মূল্য সভাপতির হস্তে প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগারের তহবিলে উক্ত অর্থ প্রদান করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও তাহার ভূমিকা সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন সর্বশ্রী কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, উমানাথ সিংহ, প্রধান অতিথি সভাপতি মহাশয় প্রভৃতি।

বালী শিশু সমিতি গ্রন্থাগার ॥ হাওড়া ॥

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের ১৯৬১-৬২ সালের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ যে গ্রন্থাগারে দৈনিক গড়ে ৪০ খানি পুস্তকের আদান প্রদান হয়। নতুন ১৮১ খানি পুস্তক গ্রন্থাগারে সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থাগারের অন্যান্য কার্যসূচী হল মৃৎশিল্প ও চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা ব্যবস্থা খেলাধুলা, আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি।

সালেপুর নগেন্দ্র সাধারণ পাঠাগার ॥ হুগলী ॥

উপরোক্ত পাঠাগারের ১৯৬২—৬৩ সালের কার্যবিবরণী থেকে কিছু তথ্য উদ্ধৃত হল :

(ক) বর্তমান বৎসরে সংগৃহীত ২১০ খানি পুস্তকসহ মোট পুস্তক সংখ্যা ১৮০৩। (খ) বর্তমান বৎসরে সংগৃহীত ৩০৫ খানি সাময়িক পত্রিকা সহ মোট সংখ্যা ২১৮৩। (গ) মোট সদস্য সংখ্যা ২৬৪। (ঘ) পাঠকক্ষ ২টি। (ঙ) দৈনিক পাঠকের সংখ্যা ৩২। (চ) বর্তমান বৎসরে পুস্তক আদান প্রদানের সংখ্যা ৪৩৮৪।

কাগজ

১০১টি রাষ্ট্রের মাথাপিছু কাগজ ব্যবহারের একটি হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া হল ঃ

তালিকায় স্থান	দেশ	জনসংখ্যা	মাথাপিছু ব্যবহার (পাউন্ড)	
			১৯৬০	১৯৬১
১	আমেরিকা	১৮০,৫০০,০০০	৪৩১·৬	৪৩১·৮
২	কানাডা	১৮,০০০,০০০	২৮০	২৮০·২
৩	সুইডেন	৭,৪৯৪,০০০	২৬৫	২৬৫
১৬	জাপান	৯৩,৪০৮,৮৩০	১০২·৫	১০৪
৩৬	রাশিয়া	২১৪,৪০০,০০০	৩৩·২	৩৪
৬৬	সিংহল	৯,৬১২,০০০	৬·১	৬·২
৮৩	পাকিস্তান	৯৩,৮০০,০০০	২·৪	২·৪
৮৮	ঘানা	৫,২০০,০০০	২	২·৩
৯১	ভারতবর্ষ	৪৭০,০০০ ০০০	১·৯	২·৫
১০১	সোমালিল্যান্ড	২,৫০০,০০০	·৫	·৫

সূত্র ঃ *Paperprintpack India*
March 1963 পৃঃ ১৮—১৯

কেমিক্যাল আবস্ট্রাক্‌ট্‌স্‌

রসায়ন শাস্ত্র এবং রসায়নশিল্প বিষয়ক পত্র পত্রিকা এবং এই সমস্ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সংখ্যা কি হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'চ্ছে *Chemical abstracts* এবং তার সূচী থেকে কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

*Chemical abstracts*এর প্রকাশ সুরু হয় ১৯০৭ সালে। প্রতি দশ বৎসরের একটি করে, এ রকম একত্রিত ৫টি সূচী এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে।

১৯০৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই ৪০ বৎসরে প্রায় ১,৪১৭,২৬০টি প্রবন্ধ ও পেটেন্টের সারাংশ প্রকাশিত হয়েছে। আর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কেবলমাত্র ১০ বৎসরে প্রকাশিত সারাংশের সংখ্যা ৬৪৭,৩১৩। অর্থাৎ এই দশ বৎসরেই

পূর্ববর্তী ৪০ বৎসরে প্রকাশিত সারাংশের শতকরা ৪৫'৭ ভাগ সারাংশ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৪৭—৫৬ সালে প্রকাশিত সারাংশ ১৯০৭—২৬ সাল থেকে ৩০৮% ভাগ, ১৯১৭—২৬ সাল থেকে ২৩৫% ভাগ, ১৯২৭—৩৬ সাল থেকে ৫৮% এবং ১৯৩৭—৪৬ সাল থেকে ৫৩% বেশী।

১৯৪৭—৫৬ সালের একত্রিত সূচী ১৯ খণ্ডে সম্পূর্ণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ২১,৫০০, শব্দ সংখ্যা ২৮'৫ লক্ষ। এই সূচী প্রণয়নে প্রায় ৬০ লক্ষ কার্ড ব্যবহৃত হয়েছে। লাইন করে সাজিয়ে দিলে এর দৈর্ঘ্য হবে ২,১৫০ ফুঃ। এই সূচী ছাপাতে ১৫০ টন ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে—গ্যালী প্রুফের দৈর্ঘ্য ১২ মাইল।

১৯৫৭—৬১ এই পাঁচ বৎসরের একত্রিত সূচী প্রকাশের সংবাদ খুব সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। এটি ১৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। এই পাঁচবৎসরে প্রকাশিত সারাংশের সংখ্যা ৬২০,৮৬৮ অর্থাৎ ১৯০৭—৬১ এই ৫৫ বৎসরে প্রকাশিত মোট সারাংশের (২,৬৮৫,৭০৯) শতকরা ২৩ ভাগ।

Chemical abstractsএর বর্তমান বাৎসরিক চাঁদার হার ১০০০ ডলার। প্রস্তাবিত নতুন সূচীর প্রাক্-প্রকাশন মূল্য ১০০০ ডলার। পরে ১৪০০ ডলার।

এডওয়ার্ড এডওয়ার্ডস

গ্রেট বৃটেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা এডওয়ার্ড এডয়ার্ডস এর কোন ছবি নেই। Penny rate গ্রন্থের লেখক W. A. Munford এডওয়ার্ডসের জীবনী নিয়ে গবেষণায় রত আছেন। তিনি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে ১৮৪৮ সালে জন ফিপিল নামক জনৈক শিল্পী এডওয়ার্ডসের একটি ছবি এঁকেছিলেন। তিনি এই চিত্রটির একটি ফটোও সংগ্রহ করছেন। এখন আসল চিত্রটি তিনি অনুসন্ধান করছেন।

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী

১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (Indian National Bibliography) প্রতি মাসে প্রকাশিত। এ পর্যন্ত এটি ত্রৈমাসিক হিসাবে প্রকাশিত হত। বাৎসরিক চাঁদার হার যথা সময়ে ঘোষিত হ'বে। ১৯৬১ সালের একত্রিত বাৎসরিক সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এটির মূল্য ৫৪ টাকা। ১৯৫৮ সালের বাৎসরিক সংখ্যাটি (মূল্য ৫০টাঃ) এখনও কিনতে পাওয়া যায়। ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালের বাৎসরিক সংখ্যার সমস্ত কপি নিঃশেষিত। তবে সব বছরেরই ত্রৈমাসিক সংখ্যাগুলি (প্রতি বৎসরের মূল্য ৬৮ টাকা) এখনও পাওয়া যায়। ১৯৬৩ সালের চারটি ত্রৈমাসিক সংখ্যার জন্য চাঁদা হ'ল ৮৪ টাকা।

দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির ব্যবহার

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ আমেরিকা ব্যতীত অন্যান্য দেশে কিভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা পরিচালনার কথা আমেরিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ঘোষণা করেছেন।

দশমিক বর্গীকরণের বর্তমান প্রকাশক "ফরেষ্ট প্রেস", "এশিয়া ফাউন্ডেশন" এবং "কাউন্সিল অন লাইব্রেরী রিসোর্সেস" এর আর্থিক আনুকুল্যে এই সমীক্ষা পরিচালিত হবে।

এই সমীক্ষা দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রাচ্যের নিম্নলিখিত দেশগুলি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে :

বার্মা, সিংহল, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, মালয়, পাকিস্তান, পারস্য, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, তাইওয়ান এবং থাইল্যান্ড ;

দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে ব্রাজিল, গ্রীস, ইসরায়েল, নাইজেরিয়া, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক এবং যুগোশ্লভিয়া।

এই সমস্ত দেশে দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির যাতে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে এই সমীক্ষায় নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে :

(১) কি উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির ব্যবহারিক উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য এর পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন প্রয়োজন কি না ?

(২) দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির পরিবর্তিত তালিকা সংগ্রহ এবং এই পরিবর্তনের ভিত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান।

(৩) ভবিষ্যত কর্মসূচী রূপায়ণে এই সমস্ত দেশ থেকে সহযোগিতা সংগ্রহ।

৺তিনকড়ি দত্ত

আমরা গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে শ্রীতিনকড়ি দত্ত মহাশয় ১লা জুলাই ১৯৬৩ (১৬ই আষাঢ় ১৩৭০) পরলোক গমন করেছেন। ইদানীং তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল কিন্তু এই মৃত্যু নিতান্তই আকস্মিক।

শ্রী দত্তর তিরোধানের সাথে পরিষদের প্রারম্ভিক যুগের সংগে অন্যতম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি হিসাবে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের সংগে শ্রী দত্তর নাম সকলেই সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করবেন। শ্রীদত্তর খ্যাতি বাংলা দেশে নয় সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। অন্যান্য রাজ্যের প্রবীণ গ্রন্থাগারিকগণ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বলতে এখনও তাঁকেই বোঝেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রত্যেক সম্মেলনে পরিষদের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে সর্বাগ্রে শ্রী দত্তর ডাক পড়ত।

বাংলাদেশের বর্তমান যুগের তরুণ গ্রন্থাগারিকগণ গ্রন্থাগার আন্দোলনে শ্রী দত্তর অবদান সম্বন্ধে খুব কমই জানেন। পরিষদের সংগে ঘনিষ্ঠ কর্মীগণ ব্যতীত অন্যের পক্ষে এর সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তার অন্যতম কারণ হ'ল আত্মপ্রচারে শ্রী দত্তর পরাঙ্মুখতা।

গ্রন্থাগারিকতা পেশা না হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছে।

পরিষদের নিজস্ব ভবন তাঁর জীবনের অন্যতম স্বপ্ন। একমাত্র তাঁরই দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ফলে পরিষদ সি আই টি থেকে জমি সংগ্রহের আর্থিক ঝুঁকি নিতে সমর্থ হয়েছে। মৃত্যুর তিন চারদিন পূর্বেও তিনি পরিষদের সম্পাদককে পরিষদ ভবনের নক্সা নিয়ে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং সেই নক্সার কিছু অদল বদলও করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে পরিষদ একজন অভিভাবক হারাল।

'গ্রন্থাগারের' শ্রাবণ সংখ্যা তিনকড়ি দত্ত সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে।

১২ই জুলাই ১৯৬৩

২৭শে আষাঢ় ১৩৭০

৺তিনকড়ি দত্ত সংখ্যা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

ত্রয়োদশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা | শ্রাবণ ১৩৭০

সখা, আজ হতে, হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

—রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ত্রয়োদশ বর্ষ] শ্রাবণ ঃ ১৩৭০ [চতুর্থ সংখ্যা

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

সজ্জন তিনকড়ি দত্ত

শক্তি শেল-আহত লক্ষ্মণ যখন মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিলেন তখন শোক বিহ্বল রামচন্দ্র সখেদে বলেছিলেন ঃ দেশে দেশে ভার্যা মেলে, বন্ধুও মেলে, কিন্তু এমন দেশ নাই যেখানে সহোদর ভাই পাওয়া যেতে পারে। সংসারে ধনী ও ধনগর্বস্ফীত মানুষ প্রচুর আছে—সংখ্যায় এরা এখন দ্রুতবর্ধমান। আর আছে ক্ষমতালোভী ও ক্ষমতামত্ত মানুষ—এরাও সংখ্যায় কম যায় না। সংসারটাই এখন চলেছে টাকা পয়সাওয়ালা আর ক্ষমতামত্ত কতকগুলি মানুষের অঙ্গুলি হেলনে। সত্যিকারের সজ্জন আর ভদ্রলোক সংখ্যায় বড় কম। ভদ্রতার মুখোসধারী আছেন অনেকে,—যাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় যখন তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার কোন কারণ ঘটে। ভদ্রতার মুখোশটি খুলে পড়ে, আর তার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসে স্বার্থপরতার নির্লজ্জ ভ্রূকুটি।

তিনকড়ি দত্ত রেলওয়েতে কাজ করতেন। ঠিক কি কাজ করতেন, আর কি ছিল তার পদবী তা জানতাম না। জানবার প্রয়োজনও হয় নি। তবে শুনেছিলাম যে, তিনি রেলওয়ের বাস্তু বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। ১৯৪৮ সনে নাগপুরে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনকড়ি বাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। পরিচয় ঘটল জাতীয় গ্রন্থাগারের লাইব্রেরিয়ান শ্রী বি, এস, কেশবনের মধ্যস্থতায়। শ্রীকেশবন তিনকড়ি বাবুকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ An engineer by profession, and a librarian by passion। তিনকড়ি বাবুর জীবনের প্রধান এবং পরম সখ ছিল লাইব্রেরি। নিজে তিনি পেশাদার লাইব্রেরিয়ান ছিলেন না, লাইব্রেরি বিজ্ঞানে কোন শিক্ষণ ও তিনি নেন নি। কিন্তু আজীবন লাইব্রেরির সেবায়, লাইব্রেরিয়ানদের স্বার্থ-সংবর্ধনে এবং দেশময় লাইব্রেরি আন্দোলনের প্রসারকল্পে নিজের সব শক্তি, সব অবসর নিয়োগ করেছিলেন। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এবং অন্তর দিয়ে তিনি লাইব্রেরি আন্দোলনকে ভালবাসতেন, এবং এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলতে তিনি নানা ভাবে ছিলেন যত্নশীল। তাঁর ছিল একটি অকপট, সুন্দর স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব।

অনেক তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী আছেন যাঁরা আসলে হচ্ছেন আত্মসেবী। কিসে নিজের নাম জাহির করা যায়, আর কি উপায়ে লোকদেখান স্বেচ্ছাসেবার ঢাক পিটিয়ে

আর একটা মতলব হাসিল করা যায় তারই ফিকিরে ঘোরেন একশ্রেণীর লোক। অনেক স্বেচ্ছাসেবীর মধ্যে আবার দেখা যায় একটা চাপা দাম্ভিকতা। "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি"—এ রকম একটা মনোভাব এদের করে তোলে খানিকটা অসহিষ্ণু ও অহঙ্কারী। এরা মনে করে যে যেহেতু এরা বিনা পারিশ্রমিকে দেশোদ্ধার করছে সেহেতু সবাই এদের খাতির করুক।

স্বেচ্ছা সেবার যা মূলগুণ তা হচ্ছে নম্রতা ও নিরহঙ্কারিতা। যেজন্য পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : জীবে দয়া নয়, জীবসেবা। স্বেচ্ছাসেবাধর্মের এই মূলসূত্রটি যারা ধরতে পারে না তারা আর যাই হউক প্রকৃত স্বেচ্ছাসেবী নয়।

তিনকড়ি বাবুর সঙ্গে ১৯৪৮ সনের প্রথম পরিচয়ের পর দীর্ঘ ষোল বৎসর অসংখ্য বৈঠক ও সভাসমিতিতে দেখা হয়েছে ও আলাপ আলোচনা চলেছে। বহু স্থানে একসঙ্গে গিয়েছি। এক জায়গায় থেকেছি। সাধারণ পরিচয় ক্রমশঃ একটা নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। সদালাপী, হাস্যময়, নিরহঙ্কারী মানুষ হিসেবে তিনকড়ি বাবুর সাহচর্য ছিল অত্যন্ত কাম্য। মনে হত চরিত্রের মাধুর্যে তিনি বোধ হয় অজাত শত্রু। ব্যক্তিগত ভাবে আমি যে জন্য তিনকড়ি বাবুর কাছে ঋণী, তা হচ্ছে এই যে, কার্যগতিকে আমাকে পশ্চিমবঙ্গে লাইব্রেরি সংগঠন ব্যাপারে সামান্য কিছু দায়িত্ব বহন করতে হয়। আমি পেশাদার লাইব্রেরিয়ান নই, কিন্তু বহু লাইব্রেরিয়ান এবং লাইব্রেরি পরিচালকের সঙ্গে সেই সূত্রে কাজকর্মের সম্বন্ধ। তিনকড়ি বাবুর সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল তাতে বিরূপতা বা বিপক্ষতার লেশমাত্র ছিল না। তাঁর ভিতরে যে সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করেছি তা অবিস্মরণীয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে বলেই আজ তিনকড়ি বাবুর কথা মনে পড়ছে বিশেষভাবে।

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হ'ল ১৪ই এপ্রিল কাকদ্বীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন। সারাদিন বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির জের মিটে যাওয়ার পর বিকেল বেলা একই গাড়িতে আমরা রওনা হলাম কলকাতা অভিমুখে। সঙ্গে ছিলেন সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক শশিভূষণ দাসগুপ্ত আর ২৪-পরগণা জিলা সমাজ-শিক্ষা আধিকারিক শ্রীগদাধর চরণ নিয়োগী। পথে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে কিছুটা সময় কাটিয়ে সন্ধ্যায় কলকাতায় এসে গেলাম। কলেজ স্ট্রিট—হ্যারিসন রোডের (মহাত্মা গান্ধী রোড) সঙ্গমস্থলে তিনকড়ি বাবু নেমে গেলেন হাওড়ার ট্রাম ধরবেন বলে। স্মিত হাস্যে বিদায় নিলেন। সেই শেষ দেখা। এত তাড়াতাড়ি তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তা' ভাবতেও পারি নি।

তিনকড়ি বাবু বড়লোক ছিলেন না, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত নামকরা লোক ছিলেন না, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মানুষও তিনি ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুতে আমরা ধনবান কোন মানুষকে হারাই নি, কোন প্রভাবশালী সমাজপতিকেও হারাই নি। কিন্তু হারিয়েছি একজন সত্যিকারের সজ্জন ব্যক্তিকে। প্রকৃত ভদ্রলোকের সংখ্যা সংসারে সীমিত। তাই তিনকড়ি বাবুর লোকান্তর আমাদের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি।

এস. আর. রঙ্গনাথন :

তিনকড়ি দত্ত স্মরণে

সোমবার ১লা জুলাই ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনকড়ি দত্ত ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবিকা নির্বাহক বৃত্তি ছিল ইন্‌জিনিয়ারিং। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থাগার জগতের সেবাই ছিল তাঁর সারা জীবনের প্রকৃত বৃত্তি। রেলে চাকুরীরত অবস্থায় ও অবসর গ্রহণের পর, তিনি তাঁর সমস্ত অবসর সময় গ্রন্থাগারের উন্নতি বিষয়ক চিন্তায় নিয়োগ করতেন ও এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভ্রমণ করতেন।

১৯৩০ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে কলেজ স্কোয়ারের Buddhist Hallএ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একটি সভায় তিনকড়ির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এই সভায় সভাপতি ছিলেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আমি ছিলাম একজন বক্তা। বাঁশবেড়িয়া রাজ পরিবারের কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, তাঁর রাণী শংকরী লেনের বাসভবন থেকে আমাকে সভায় নিয়ে আসেন ও সর্ব প্রথমে যে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তার মধ্যে তিনকড়ি অন্যতম। পরদিন রাত্রে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ও আমি সর্ব এশিয়া শিক্ষা সম্মেলনে (গ্রন্থাগার বিভাগ) যোগ দেবার জন্য বারাণসী যাই। ওখানে তিনকড়ি আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। এই অধিবেশনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ভাবে যোগ না দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহের অভাব দেখি নি। এটি সভায় আমি "ভারতীয় আদর্শ গ্রন্থাগার আইন" এর প্রথম খসড়াটি পেশ করি। এই আইনটি সভায় সাধারণ ভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর রায় মহাশয় ও তিনকড়ি এটিকে বাংলাদেশের অবস্থার উপযুক্ত করে দেবার জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে বলেন। এই উদ্দেশ্যে, মাদ্রাজ ফেরার পথে কয়েক দিন কলকাতায় থাকি। এই সময় এঁরা দুজন আমার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে আমরা কলকাতা থেকে গঙ্গাতীর ধরে বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করি। একে একটি গ্রন্থাগার মিছিল বলে বর্ণনা করা চলে। শেষে আমরা বাঁশবেড়িয়ার জনসভায় এসে পৌঁছাই। এই মিছিল পরিদর্শন করার সময় তিনকড়ি যেভাবে, অনুষ্ঠানের প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করছিলেন তা দেখে একজন নীরব একনিষ্ঠ কর্মীর কর্মতৎপরতা ও দক্ষতা উপলব্ধি করি।

কয়েক বছর পর তিনকড়ি গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করার জন্য সপরিবারে মাদ্রাজে এসে আমার সাথে বাস করেন। ঐ সময় আমি জানতাম না যে উনি রেল বিভাগের একজন ইন্‌জিনিয়ার। আমি তাঁকে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের

প্লাবন আনতে দৃঢ় সংকল্প একজন অত্যন্ত উৎসাহী গ্রন্থগারিক বলে মনে করেছিলাম। দুবছর পর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর একটি সভায় যোগ দেবার জন্য আমাকে কলকাতায় আসতে হয়। তখন তিনকড়ি বিভিন্ন স্থানে আমার বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই জায়গাগুলির মধ্যে হাওড়ার নিকটে লিলুয়া একটি। সভাটি রেলের অফিসারে পূর্ণ দেখলাম। এই সময় আমি প্রথম জানতে পারি যে তিনকড়ি নিজে একজন রেল বিভাগের অফিসার। সভাটি রেল ইন্‌স্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ রেল ইন্‌স্টিটিউটের গ্রন্থাগারটি অফিসার ও তাঁদের পরিবার বর্গের দ্বারা সুব্যাহৃত দেখলাম।

পরে তাঁর ইচ্ছা ছিল যে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত কাজ করি। যাহোক, বহুদিন আমাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে নি। অবশেষে ১৯৫৯ খৃঃ আমার সভাপতিত্বে ভারতীয় মানক সংস্থার (Indian Standard Institutite) একটি সমিতি গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ ও তাহার উপযুক্ত আসবাবপত্রের মান নির্ধারণ করে। তখন, আমি যে এই মান নির্ধারিত করতে পেরেছি তাতে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে সর্বপ্রথম তিনকড়ি আমাকে পত্র লেখেন।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাগুলিতে তিনি নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন। অন্তত পক্ষে ১৯৪২ খৃঃ বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত সভা থেকে আরম্ভ করে ১৯৫২ খৃঃ হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত ছয়টি সভা, যেগুলিতে আমি উপস্থিত ছিলাম সেগুলি সম্পর্কে এই কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদই তাঁর প্রকৃত স্মৃতিসৌধ। এই পরিষদের কার্যে তিনি একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, পরিষদের কোন পদে অভিষিক্ত থাকা বা না থাকার সঙ্গে তাঁর এই নিষ্ঠার কোন যোগ ছিল না। যখন তিনি এই পরিষদের সভাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি এর কাজের মান উন্নত করেন। তিনি কখনও নিজেকে জাহির করতেন না, কিন্তু সর্বদা একটি আকর্ষণীয় শক্তি ও মাধুর্য তাঁকে ঘিরে থাকতো। তাঁর এই গুণটির দ্বারা তিনি বাংলার বহু নবীন গ্রন্থগারিককে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন। আমি যতবার কলকাতায় এসেছি প্রায় তার প্রত্যেকটি দিন তিনকড়ি আমার সঙ্গে দেখা করতেন। আমি কলকাতায় এলে তিনি একদিন আমাকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে নিয়ে যেতেন। কখন কখন সেখানকার কর্মকোলাহল দেখে আমার ঈর্ষা হত। কারণ আমাদের দেশের খুব অল্প গ্রন্থাগার পরিষদের এই রকম কয়েকজন বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ গ্রন্থাগারিকের সেবা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। যদি বলি তিনকড়ির ব্যক্তিত্ব ও নিষ্ঠা নবীন গ্রন্থগারিকদের মধ্যে এইরূপ গভীর নিষ্ঠার সঞ্চার করার জন্য বিশেষভাবে দায়ী তাহলে নিশ্চয়ই নবীন গ্রন্থগারিকগণ ক্ষুণ্ণ হবেন না।

আমি জানি তিনি তাঁর শক্তির পূর্ণ বিকাশের তৃপ্তি ও চরিতার্থতা অর্জন করে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়ে

গেলে তিনি আরও সুখে যেতে পারতেন। যদিও তিনি আজ সশরীরে আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই, আমার বিশ্বাস যে তিনি ও কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্মের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখবেন আর তাঁদের সূক্ষ্ম শক্তি এমন ভাবে প্রয়োগ করবেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তিত হবে।

তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

কল্যাণী সুব্বারাও
কর্তৃক অনূদিত

যাদব মুরলীধর মুলে

তিনকড়ি দা স্মরণে

গত ২রা জুলাই মঙ্গলবার সকালে যখন জানলাম আমাদের ঘনিষ্ট বন্ধু তিনকড়ি দা সামান্য রোগভোগের পর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তখন অত্যন্ত শোকার্ত হলাম। এ সম্ভাবনার কথা আমার মনেই আসে নি, কারণ আমি জানতাম তিনি এ বয়সেও কর্মঠ ছিলেন এবং এই সে দিনও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ কার্য্যালয়ে যোগদান করেছেন।

১৯৩৩ সাল থেকে তাঁর প্রিয় সঙ্গের কত স্মৃতি আমার মনে সাড়া তুলছে। তিনকড়িদার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ত্রিশ বছর পূর্বে ১৯৩৩ সালের প্রথম নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনে। তখন আমরা দু'জনেই যুবক। সেই মধুর প্রথম পরিচয়ের পর পরবর্তী অনেক সম্মিলনে সদস্য হয়ে পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছি। শুধু তাই নয়, আমরা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছি। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি গাঢ় হয়েছে। পরে যখন ১৯৪৭ সালের প্রথমে কলকাতা এলাম তখন ঘন ঘন দেখা সাক্ষাতে সে প্রীতি ও শ্রদ্ধা ক্রমবর্ধিত হয়েছে।

বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর যে কাজ সে কথার বিবরণ-বিস্তার করা আমি বাহুল্য মনে করি। তিনি গ্রন্থাগারিক ছিলেন না, কিন্তু গ্রন্থাগারিকতায় তাঁর উৎসাহ উদাম যে কোন গ্রন্থাগার কর্মীকে লজ্জা দেবে।

সকলেই জানেন, তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শ থেকে কখনো আড়ালে থাকতেন না এবং সর্বদা সেই আদর্শে উন্নয়নের জন্য কাজ করতেন। পরলোকগত কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের উদ্দীপনাই তাঁকে গ্রন্থাগার জগতে

আসতে প্রভাবান্বিত করেছিল। তিনকড়িদার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমন্বয় ঘটেছিল যাতে তাঁর সংসর্গে যাঁরাই এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁকে প্রিয় বলে জ্ঞান করেছেন।

এই নিঃস্বার্থ কর্মীর প্রয়াণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ দীন হ'ল নিঃসন্দেহ, তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের স্মৃতিতে চিরস্মৃত থাকবেন। এ' দেশের নানা স্থানের বহুজনের সহিত তাঁহার প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। আমি অনেককে জানি যাঁরা তিনকড়িদাকে আপন জন মনে করেন।

জাতীয় গ্রন্থালয়ের সহকর্মীদেরও আমারা নিজের পক্ষ থেকে তিনকড়িদার প্রয়াণে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক।

প্রমীল চন্দ্র বসু

তিনকড়ি বাবুর কথা

কা'রও সম্বন্ধে স্মৃতি মন্থন ক'রে কিছু লিখতে হ'লে লেখকের নিজের অনেক কথা লেখার মধ্যে প্রায় অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। সে অপরাধের জন্য শুরুতেই পাঠকের কাছে মার্জনা চেয়ে রাখছি।

প্রথম পর্যায়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নাম ছিল নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ। ইংরাজীতে বলা হ'ত All-Bengal Library Association। এই পরিষদ স্থাপনে তখনকার দিনে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রভৃতির নেতৃত্বে প্রধান কর্মী ও উদ্যোগী ছিলেন শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এবং গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনে সর্বসাধারণের মধ্যে যতে অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয় সেজন্য সুশীল বাবু দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড' কাগজে মধ্যে মধ্যে লেখা ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ক'রতে থাকেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তিনকড়ি বাবুর সহজ আকর্ষণ ছিল। সুশীল বাবুর কাছে শুনেছি তিনকড়ি বাবু 'ফরওয়ার্ড' কাগজের আফিসে চিঠি লিখে সুশীল বাবুর ঠিকানা জেনে নিয়ে সুশীল বাবুর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কাজে সহযোগিতা রাখার জন্যে। সেই থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পরিষদের সাথে তিনকড়ি বাবুর ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন পর্যায় শুরু হয় এবং পরিষদের পূর্বনাম পরিবর্তন ক'রে এর নাম দেওয়া হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা ইংরাজীতে Bengal Library Association। পরিষদের প্রথম পর্যায়ের প্রায় শেষ পর্বে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শেষে অথবা ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তিনকড়ি বাবুর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি আমারও আকর্ষণ ছিল। বরোদা রাজ্যের বিচিত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিবরণ আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। বরোদা গ্রন্থাগারের তদানীন্তন 'কিউরেটর' স্বর্গীয় নিউটন মোহন দত্তকে বরোদায় গ্রন্থাগার পরিচালন বিষয়ে শিক্ষালাভে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে রেঙ্গুণ থেকে ওকথা জানাই ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে। পত্রোত্তরে তিনি আমাকে বরোদা যাবার জন্য আহ্বান জানান। কার্যগতিকে সে সময়ে আমার যাওয়া হয় না। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শেষে অথবা সম্ভবতঃ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে শ্রীরামপুরে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে এক গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। খবরের কাগজে সম্মেলনের বিষয় অবগত হয়ে কৌতূহল বশতঃ একদিন এই সম্মেলনে উপস্থিত হই। সেখানে সম্মেলনের (সম্ভবতঃ) সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাথে পরিচয় হয়। এই সময়ে আমি বরোদা যাবার কথা পুনরায় চিন্তা ক'রছিলাম। কথা প্রসঙ্গে সে কথা জেনে ফণীবাবু আমাকে তিনকড়ি বাবুর সাথে পরিচয় করার কথা ব'লেলন এবং তিনকড়ি বাবুর নামে এক পরিচয় পত্র দিলেন। তিনকড়িবাবু তখন লিলুয়াতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের বোধহয় এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টার অফ ওয়াকর্স। লিলুয়া ই, আই, আর, ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরীর তিনি তখন কর্ণধার। ঐ ইনষ্টিটিউটে তাঁর সাথে দেখা করি। আমার পরিকল্পনার কথা শুনে তিনি খুবই উৎসাহ বোধ করলেন এবং আমি বরোদা থেকে ফিরলে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে একযোগে কাজ করার সুবিধা হবে ব'লে উল্লেখ ক'রলেন। যতদূর মনে হয় সে সময়ে তিনি নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।

নিউটন মোহন দত্ত মহাশয়ের সাথে পুনরায় চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে আমার বরোদা যাওয়া ঠিক হ'য়ে যায়। বরোদা যাত্রার পূর্বে কুমার মণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি ক্ষুদ্র সভার আয়োজন করা হয় আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে। ঐ সভা আয়োজনের পশ্চাতে তিনকড়ি বাবুর প্রয়াসের কথা পরে জানতে পারি। সভায় মুনীন্দ্রবাবু, এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রী জন ভ্যান ম্যানেন, শ্রীসুশীল ঘোষ প্রভৃতি ব্যতীত তিনকড়িবাবুও বক্তৃতা করেন। সেখানেই তিনকড়ি বাবু বরোদায় শিক্ষা গ্রহণের পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দেবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। পরে রায় মহাশয় এবং তিনকড়িবাবু উভয়েই এ বিষয়ে নানা রকম পরামর্শ দিয়ে এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পরলোকগত লালা লাভুরামকে চিঠিপত্র লিখে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি লিলুয়া ই, আই, আর, রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরীর সে সময়ে তিনকড়িবাবু কর্ণধার ছিলেন। ই, আই, আর ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরীটি বিজ্ঞান সম্মত প্রথায় গড়ে তুলবার এবং পরিচালন করার উদ্দেশ্যে তিনকড়িবাবু ঐ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীপরিমল আচার্য কলিকাতার তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান খান বাহাদুর খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লার কাছে ঐ বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করতে পারেন তার জন্য বেসরকারীভাবে এক বন্দোবস্ত করেন। এর ফলে এবং তিনকড়িবাবুর প্রচেষ্টায় ইনষ্টিটিউটের ছোট লাইব্রেরিটি শীঘ্রই এক আকর্ষণীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়। গ্রন্থাগারটির কার্যকলাপ দেখবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমি সেখানে গিয়েছি এবং সেইসূত্রে তিনকড়িবাবুর সাথে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে সে যুগে।

আমার বরোদায় থাকাকালে তখনকার দিনের কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আত্মশক্তিতে' বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার এক প্রবন্ধ বার হয়। সে প্রবন্ধ পাঠ করে তিনকড়িবাবু উচ্ছ্বসিতভাবে আমাকে চিঠি লেখেন এবং গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। পূর্বেই বলেছি বরোদা যাবার পূর্বেই তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। বরোদা থেকে ফেরার পরে এই পরিচয় ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

বাংলা সন ১৩০৫ সালের (ইংরাজী ১৮৯৮ খৃঃ) মহালয়ার দিন চন্দন নগরে মাতুলালয়ে তিনকড়ি বাবুর জন্ম হয়। তিনকড়ি বাবুর পৈত্রিক বাসস্থান হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে। পরলোকগত কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়েরও বাসস্থান ছিল বাঁশবেড়িয়াতে। উভয়ের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ছিল—যার ফলে বাংলাদেশের তথা সারা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে শুভ ও সহায়ক হ'য়েছে। তিনকড়ি বাবুর পিতার নাম ছিল বলাইচাঁদ দত্ত। কংসবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত বলাই চাঁদের জাতিগত ব্যবসাই তাঁর পেশা ছিল। তারপর দুই ভগিনীর মৃত্যুর পরে তিনকড়ি বাবুর জন্ম হয়, সেজন্য তাঁর তিনকড়ি নামকরণ হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে তিনকড়ি বাবু প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর হুগলী মহশীন কলেজে আই, এস, সি ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আই, এস, সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ঐ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং জামালপুরে ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দেন। শিক্ষানবীশির কার্যকাল অন্তে তিনি লিলুয়া,জামালপুর, টাটানগর, ব্যান্ডেল এবং বালি প্রভৃতি স্থানে প্রথমে সাব ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হয়ে পরে এ্যাসিষ্টেন্ট ইন্সপেক্টর এবং শেষে ইন্সপেক্টর অফ ওয়ার্কসের পদে উন্নীত হন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয় এবং ১৯৫৪ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে বালিতে কার্যকালে তিনি রেলওয়ের কাজ থেকে অবসর-গ্রহণ করেন। অতঃপর বালিতেই একটি বাড়ী কিনে এখানেই বসবাস করতে থাকেন।

গ্রন্থাগারিকতা তাঁর পেশা না হলেও গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় সকল বিষয়ে তিনকড়ি বাবুর অখণ্ড এবং অবিমিশ্র নেশা ছিল। এই অত্যুগ্র নেশার ঝোঁকে তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে কোন ক্ষেত্রে দ্রুত ও বাস্ত গতিতে অগ্রসর হতে চাইতেন এবং তাঁর উৎসাহের এই আতিশয্যকে সামলে চলা আমাদের অনেকের পক্ষে অনেক সময়েই দুঃসাধ্য মনে হতো। কোন অনুষ্ঠানের কার্যসূচীর মধ্যে কোন ফাঁক না রেখে ঠাস বুনন দিয়ে যতটা বেশী কাজ আদায় হয়ে যায় বা কাজ এগিয়ে যায় সেটাই তাঁর লক্ষ্য থাকতো সব সময়ে। সে জন্য কোন কার্য্যসূচী প্রণয়ন কালে বাস্তব অসুবিধার কথাটাকে সব সময়ে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চাইতে না। তাঁর এই ঝোঁকের ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের অনেকের সাথে অনেক সময়ে মতান্তর হলেও অনেক বিষয়ে কাজ যে অনেক এগিয়ে গিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর এই ঝোঁকের প্রথম পরিচয় পেলাম পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থাগারিক বিদ্যা শিক্ষা লাভের পর কলকাতায় ফেরার পরেই। মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের অনুরোধে, তিনকড়ি বাবুর আগ্রহে, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং বেনামীতে হলেও প্রকৃত পক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তত্ত্বাবধানে বাঁশবেড়িয়াতে পনরদিনব্যাপী বাংলাদেশের সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। তখন জুন মাস, প্রচণ্ড গরম। সকাল থেকে বেলা বোধ হয় এগারটা কিম্বা বারটা পর্যন্ত ক্লাশ তারপর ঘণ্টা দুই স্নানাহার ও বিশ্রাম পুনরায় আবার কয়েক ঘণ্টার ক্লাশ। প্রধানতঃ তিনকড়ি বাবুর ইচ্ছাকে মেনে নিয়েই গ্রীষ্মের মধ্যে এই কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। তবে তখনকার দিনকাল অন্য রকম ছিল। বিশেষ ক্লেশদায়ক হলেও কেন্দ্রের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক সকলেই হাসি মুখেই ঐ কার্যক্রম মেনে চলেছিলেন। কয়েকমাস বাদে শীতকালে (ডিসেম্বর মাসে) একমাস ব্যাপী হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমূহ পরিদর্শন ও সমীক্ষার এক দায়িত্ব ভার গ্রহণ করি। তিনকড়িবাবু মুণীন্দ্রবাবুর সাথে পরামর্শ ক্রমে এ বিষয়ে কার্যসূচী প্রণয়ন করেন। এই কার্যসূচীতেও অল্প সময়ের মধ্যে যাতে মুহূর্ত সময় নষ্ট না হ'য়ে ব্যাপক ভাবে পরিদর্শন ও আনুষঙ্গিক কাজ চ'লতে পারে তারই ব্যবস্থার প্রয়াস ও প্রমাণ ছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একই দিনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি গ্রন্থাগার পরিদর্শন, গ্রন্থাগার কর্মীদের সাথে আলোচনা সভা এবং জনসভার আয়োজনের ব্যবস্থা কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকতো। ফলে ঘোর শীতের অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ ক'রে পায়ে হেঁটে, সাইকেল যোগে, রেলপথে, নৌকাযোগে এমনকি পালকীতে উঠে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় ছুটাছুটি ক'রতে হ'তো। তিনকড়ি বাবুর সাথে দীর্ঘদিনের সংস্রবে প্রতি সভা, সম্মেলন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের কার্যসূচীতে তাঁর এই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলার আগ্রহের পরিচয় সব সময়েই পেয়েছি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনার মধ্যে বোধহয় তাঁর এই দ্রুত চলার আগ্রহের শেষ পরিচয়। তাঁর অদম্য ও অসম সাহসের ধাক্কাতেই সকলকে এই পরিকল্পনা গ্রহণ

ক'রতে হ'য়েছে নচেৎ গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণের দুঃসাহস গ্রহণে সম্ভবতঃ কেহই অগ্রণী হতেন না—একথা ব'ললে অতিশয়োক্তি হবেনা বলেই মনে করি।

নিজে গ্রন্থাগারিক না হয়ে এবং গ্রন্থাগার বিদ্যা সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ না করেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ অনেককেই বিস্মিত করতো। 'গ্রন্থকারনামা' প্রণয়নে তাঁর তাগিদ এই কাজ তখনকার মত দ্রুত সমাপ্ত করতে সাহায্য করেছিল। প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে জনৈক গ্রন্থাগারিক কর্তৃক গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কীয় বাংলায় লিখিত প্রায় সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ এবং বাংলা সাময়িক পত্রের এক সূচী দৈব-দুর্বিপাকে বিনষ্ট হওয়ায় তাঁর আক্ষেপ ও মনোবেদনা সেদিন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদের নিদর্শন ছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির সহায়ক হবে মনে করলে ব্যক্তিগত এমন কি সমষ্টিগত মান অপমানের প্রশ্ন গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে তিনি যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর এই কাজের ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন তাঁর মনের উদারতার প্রকাশ পেত অন্যদিকে তেমনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠতা প্রমাণ পাওয়া যেত।

তিনকড়িবাবু পুনর্গঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যখন সম্পাদক বা সচিব (Secretary) তখন তাঁর কর্মস্থল লিলুয়া। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তখন নিজস্ব কোন কার্যালয় ছিল না। টি, সি, দত্ত (তিনকড়ি দত্ত), বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, লিলুয়া, হাওড়া এই ঠিকানাতেই পরিষদ সংক্রান্ত চিঠি-পত্রের আদান প্রদান চ'লতো। বিকালের দিকে তিনকড়িবাবু তাঁর চামড়ার ব্যাগে পরিষদের চিঠি ও কাগজ-পত্রাদি ভরে নিয়ে ক'লকাতায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোকের কাছে ঘোরাফেরা করতেন। আমরা ঠাট্টা ক'রে তাঁর পোর্টফোলিও ব্যাগের নামকরণ করেছিলাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 'হেড অফিস' বা 'প্রধান কার্যালয়'। পুনর্গঠিত পরিষদের প্রথম দিকে কিছুকাল যাবৎ প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে আমরা কয়েকজন (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর হেড এ্যাসিস্টেন্ট এবং পরিষদের তদানীন্তন কোষাধ্যক্ষ স্বর্গীয় মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন) তিনকড়িবাবুর সাথে কলকাতার নানা শ্রেণীর ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যেতাম পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের কাজকর্মের প্রসার সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে। কোথাও পেতাম উৎসাহের বাণী এবং সাহায্যের আশ্বাস, কোথাও বা সহানুভূতির অভাব এমন কি বিদ্রূপ। বিরূপ সমালোচনা বা বিরুদ্ধ আচরণে আমরা অনেক সময়ে দমে গেলেও তিনকড়িবাবু কিন্তু কখনও নিরুৎসাহ হতেন না। অনেক সময়ে অনেকে আমাদের লাইব্রেরী সম্বন্ধে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মনোভাব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতেন, তাতে আমাদের অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটতো। মনে আছে একদিন তিনকড়ি বাবুর সাথে আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম পরলোকগত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের বাড়ীতে। কর্পোরেশনে তখন তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। কর্পোরেশন থেকে শহরের

বহু গ্রন্থাগারকে প্রতি বৎসর অনেক টাকা সাহায্য করা হতো। এই সব সাহায্যের অনেকটা অংশ অপব্যয়ের এবং অযথা স্থানে প্রদানের অভিযোগ নানা দিকে শোনা যেত। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শাসমল মশায়কে এ বিষয়ে অবহিত ক'রে সমুদয় অর্থ যাতে সহরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধিকতর কল্যাণজনক কাজে ব্যয় করা সম্ভব হয় তার জন্য চেষ্টা করা। সন্ধ্যার পর যখন আমরা তাঁর বাড়ীতে গেলাম শাসমল মশায় তখন বাড়ী ছিলেন না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে তিনি বাড়ী ফিরলেন। তাঁকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল সেজন্য আমরা তাঁর কাছে অন্যদিন আসার প্রস্তাব করায় তিনি তৎক্ষণাৎ চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়লেন এবং ফিরতে দেরী হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ ক'রে আমাদের বক্তব্য তখনই শুনতে চাইলেন। প্রধানতঃ তিনকড়ি বাবুই আমাদের বক্তব্য ব'ললেন। আমাদের সকলের কথা শুনে শাসমল মশায় হেসে ব'ললেন কর্পোরেশনের রাজনীতির বিষয়ে আপনারা এখনও শিশু। আপনারা যা ব'ললেন এসব কথা কি আমরা আর জানি না। কিন্তু যে সব লাইব্রেরী বা কেন্দ্রে এই সব সাহায্য দেওয়া হয় তার অনেকগুলোই কর্পোরেশন সভার সদস্যদের নির্বাচনের ঘাঁটি। এই ঘাঁটি হাত ছাড়া ক'রতে কেউ কখনই রাজী হবে না। আর এই নিয়ে খোঁচাখুঁচি করবে সদস্যদের মধ্যে এখন মূর্খ কেউ নেই—আমিতো নইই। এরকম সত্য ও অকপট কথা আমরা এই সব অভিযানে অনেক সময়ে শুনতাম। তিনকড়ি বাবু ব'লতেন, এরকম অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। শুনে শুনে এই রকম কথায় অভ্যস্ত হ'লে আমরা সহসা আর হতাশ বা নিরাশ হব না।

হাল্‌কা কথাবার্তা ব'লতে বা ঠাট্টা তামাসা ক'রতে তিনকড়ি বাবুকে বড় একটা দেখিনি। অনেক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে তিনকড়ি বাবুর সাথে একই ঘরে বাস ক'রেছি। কটকে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে অবসর কালে নিজেদের ঘরে সাহিত্যিকদের সাথে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও সাহিত্যিকদের নানাদিকে পরস্পরের নির্ভরশীলতার বিষয় নিয়ে তিনকড়ি বাবু গভীর আলোচনা ক'রছেন দেখেছি। আবার গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত হ'য়ে অবসর সময় সম্মেলনের বিভিন্ন কার্যসূচী অথবা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কীয় বিষয় সব সময়ে আলোচনায় রত থাকতে দেখেছি। মালদহের গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনকড়ি বাবু, জাতীয় গ্রন্থাগারের কেশবন, বিশ্বভারতীর প্রভাত বাবু প্রভৃতি আমাদের অনেকের আশ্রয় এক ঘরে ছিল। তিনকড়ি বাবু নিজে লঘু কথাবার্তা না ব'ললেও বা হাস্য পরিহাস না ক'রলেও তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে অনেক সময় আমরা (বিশেষতঃ কেশবন) নানারকম হাসি ঠাট্টার কথা ব'লতাম। তিনি কিন্তু তা'তে একটুও ক্ষুন্ন হ'তেন না। মনে আছে পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের সম্মেলনে রাত্রে শয্যায় ঘুমে আমাদের চোখ বুজে আসছে কিন্তু সম্মেলন বা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কীয় বিষয়ের আলোচনায় তিনকড়ি বাবুর উৎসাহের অভাব নেই। একাই ব'লে চ'লেছেন। পরে একসময়ে আমাদের আর সাড়া শব্দ না পেয়ে অগত্যা নীরব হ'তেন।

একসময়ে ক'লকাতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবার প্রয়াস কোন ক্ষমতাসম্পন্ন পক্ষ থেকে করা হয়। পরিষদের কর্মীদের অনেকে অপর পক্ষের আচরণে বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। অপর পক্ষের নিকটে অযথা হীনতা স্বীকার অথবা অপমান বরণ করা হ'চ্ছে তিনকড়ি বাবুর এই সময়ের কার্যকলাপের এরকম ব্যাখ্যা সত্বেও তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের নির্ধারিত পথেই চ'লতে থাকেন। সাময়িক উত্তেজনা তাঁর গ্রন্থাগার আন্দোলনের শুভ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নি। অপর পক্ষের প্রচেষ্টা অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই স্তিমিত হ'য়ে যায়। ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের পরিষদের কর্মী বা কাজকর্মের প্রতি বাহ্যতঃ অবজ্ঞা অথবা তাচ্ছিল্য অনেক কর্মীর মনে অনেক সময়ে ক্ষোভের সঞ্চার ক'রেছে। সহকর্মীদের তীব্র সমালোচনা সহ্য ক'রেও পরিষদের স্বার্থে তিনকড়ি বাবু ঐ প্রকার উন্নাসিক ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হ'তে কখনও ইতস্ততঃ করেন নি। এ থেকে একদিকে যেমন তাঁর মানসিক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি পরিষদের জন্য তাঁর একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়।

মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকে তাঁর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। তা' সত্বেও তিনি বিশ্রাম গ্রহণ ক'রতেন না। পুনরায় তিনি বিশেষ অসুস্থ হ'য়েছেন শুনে তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁকে দেখতে গেলাম বালিতে তাঁর গৃহে। দেখলাম রাস্তার ধারে গৃহসংলগ্ন বারান্দায় ব'সে আছেন স্থানীয় ২।৩ জন ভদ্রলোকের সাথে। ব'ললেন কয়েকদিনের পরে সেদিনই প্রথম বাইরে এসেছেন এবং সেদিন অনেকটা ভাল বোধ ক'রছেন। একঘণ্টারও বেশী সময় ছিলাম সেখানে। ব্যক্তিগত কথাবার্তা সামান্য কিছুক্ষণ হবার পর বাকী সময় গ্রন্থাগার আন্দোলন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পরিষদের নিজস্ব গৃহের পরিকল্পনা এইসব বিষয়ের আলোচনাই ক'রলেন। নিজের অসুস্থতার মধ্যেও আমাকে আদর আপ্যায়নের অভাব একটুও হ'লনা। শীঘ্রই আর একদিন তাঁর ওখানে আসবো একথা মনে ক'রে এবং তাঁকে তা' জানিয়ে বিদায় নিলাম। কিন্তু সেই বিদায়ই যে চিরবিদায় হবে তখন সেকথা মনে করি নি। ইহজগত থেকে তিনকড়ি বাবুর চিরবিদায় এদেশের গ্রন্থাগার জগতের লোকের কাছে মাত্র 'তিনকড়ি'র অভাব মাত্র নয় এদেশের গ্রন্থাগার জগতের সমগ্র কড়ির এক প্রধান অংশের অভাব ব'লেই অনুভূত হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর আশা আকাঙ্খা পূরণ হোক, তাঁর আত্মার শান্তি হোক এই কামনা করি।

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

৺তিনকড়ি দত্ত

৩০ বছর আগের কথা—তখনকার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর হেডক্লার্ক ৺ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘরে তিনকড়িবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপ—তিনি তাঁর পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাগজপত্র বার করে পরিষদ বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। আমরা তখন ছাত্র এম, এ, ক্লাসের। ভূপেনবাবু আমাদের গ্রন্থাগার বৃত্তি নেবার জন্য প্রলুব্ধ করছিলেন। সেই সময়ের কিছু পরেই ঐস্থানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক সভা হয়। তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক স্বর্গীয় আসাদুল্লাহ সাহেব এবং স্বর্গীয় কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়কে সেই সময়ে প্রথম দেখি—আরো বহু জ্ঞানী জনের সমাবেশ হয় এবং মিটিংএর শেষে একটি গ্রুপ ফটো তোলা হয়—যদিও মিটিংএ আমাদের স্থান ছিল না তবুও ছবি তোলার সময় তিনকড়িবাবু আমাদের ডেকে নিয়ে ঐ ছবিতে দাঁড় করিয়ে দেন এবং ছবি তোলা হয়। ছবি তোলার লোভ না থাকলেও অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে গ্রুপ ছবি তোলায় মনে মনে বেশ শ্লাঘার উদ্রেক হচ্ছিল। সে ছবির কপি আর দেখার সুযোগ হয়নি—তবে বহুদিন পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক রিপোর্টের কপিতে ঐ ছবি ছাপা হয় এবং তাতে নিজেদের দেখে স্বভাবতই স্ফূর্তি হয়।

তারপর কখনো কখনো তিনকড়িবাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়—জানতাম যে উনি রেলে কাজ করেন—লিলুয়া রেল কোয়ার্টারে থাকেন আর তাঁর পেশা ভিন্ন হলেও নেশা তাঁর গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পরিষদ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের Portable অফিস তাঁর ব্যাগে ব্যাগেই ঘুরতো। ১৯৩৫ সাল তদানীন্তন ভারত সরকারের পরিচালনায় কলিকাতায় ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী কেন্দ্রে প্রথম গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ শিবির খোলা হয়। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক খাঁ বাহাদুর আসাদুল্লাহ সাহেবের পরিচালনায় জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর অবধি ঐ শিক্ষা চলে এবং পরিশেষে পরীক্ষার পর ফলাফল প্রকাশ করা হয়। লাইব্রেরীর রিডিং রুমের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ৺সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ও ঐ ক্লাশে শিক্ষা দিতেন। সেই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান মিলে আমরা ২০ জন ছাত্র ঐ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করি। তিনকড়িবাবুকে আমরা প্রায়ই দেখতাম বড় গ্রন্থাগারিক অথবা মনিবাবুর সঙ্গে নানান আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত।

তিনকড়িবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ হয় আরো কিছু পরে। ডিপ্লোমা পাশ করবার পর দিল্লীতে এবং বরোদা রাজ্যে গ্রন্থাগারের কাজে ২॥ বৎসর কাটাতে হয়। সুদূর বিদেশে বাংলা দেশের কাগজ সেই সময়ে নিয়মিতরূপে আমার কাছে আসত এবং ঐ দৈনিক কাগজের মাধ্যমে দেশে গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচার তথা গ্রন্থাগারের প্রসারের বিবরণ কিছু কিছু চোখে পড়ত এবং ঐ সবের পুরোধা হিসাবে মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়, তিনকড়ি দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নাম প্রায়ই উল্লিখিত দেখতাম। কাগজেই পড়ি যে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ভবনে গ্রন্থাগার পরিষদের এক সম্মেলন হয়। সভায় বরোদার ৺নিউটন মোহন দত্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। আবার এক বৎসর পরে অধুনালুপ্ত সিনেট হলে গ্রন্থাগার পরিষদের আরেক সম্মেলন হয় তথায় বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সারগর্ভ বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি সেই বক্তৃতায় ভাল শিশু গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অতি সুন্দর কয়েকটি কথা বলেছিলেন। ১৯৩৮ সালে বরোদা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করবার পর—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয় এবং সেই সময় থেকে তিনকড়িবাবু সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ইতিপূর্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র থাকা কালীন হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে কুমার মুণীন্দ্রনাথ দেবরায় মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় জেলার প্রথম কর্মী সম্মেলন তথা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়ের অধীনে শিক্ষা শিবির পরিচালিত হয়। স্বর্গীয় আসাদুল্লাহ সাহেবের নির্দেশানুযায়ী আমরা তথায় যাই এবং মানপত্র বিতরণী সভায় অনেকের বক্তৃতা শুনি। বক্তাদের মধ্যে তিনকড়িবাবুও ছিলেন। ১৯৩৮ সালের পর থেকে তিনকড়িবাবুর সঙ্গে অনেক স্থানেই এক সঙ্গে যাতায়াত করতে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিষদের সব সভাতেই একযোগে কাজ করবার সুযোগ হয়। পরিষদের শিক্ষা শিবির তখন ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজে এবং আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাজ শেষ করে সন্ধ্যার পর আশুতোষ কলেজে ঐ ট্রেনিং ক্লাশে পড়াতে যেতাম। তিনকড়িবাবুকেও ঐ সময়ে ক্লাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখতাম।

গ্রন্থাগার পরিষদের তখন নিজস্ব কোনো আস্তানা না থাকায় চিঠিপত্র দেওয়া চাঁদা আদায় ও সভাসমিতি করা সবই ঐ বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে। আজও মনে পড়ে বন্ধুবর শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু, শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরিষদের তরফে সামান্য ছোট ছোট কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করতেন—কি ভাবে একসঙ্গে ২।৪শত খামে টিকেট মারতে হবে কি ভাবে তা দ্রুততর করা যায় পাল মহাশয় আমাদের শিখিয়ে দিতেন। এই সব ছোটখাট কাজ আজকাল যা হয়ত পিওন বেয়ারা দ্বারা করা হয় তা আমরা সানন্দে করতাম এবং তিনকড়িবাবু, দেবরায় মহাশয় ও ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় আমাদের সর্বভাবে উৎসাহিত করতেন। আমাদের বয়স তখন অল্প কাজেই সারাদিন কাজকর্ম সেরেও

পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগে আমাদের বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বা অবসাদ আসত না। কিন্তু তিনকড়িবাবু তথা মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়কে দেখে আমরা আশ্চর্য্য হতাম তাঁরা অন্যত্র হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরও হাসিমুখে পরিষদের মিটিংয়ে যোগদান করতেন এবং শুধু যোগদান নয়—তাঁদের অভিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশাদি দ্বারা পরিষদের কর্ম্মপন্থা স্থির করতে সাহায্য করতেন। দেবরায় মহাশয় বাংলার অভিজাত বংশের লোক। তাঁকে কায়িক পরিশ্রম বেশী করতে হত না সত্য—কিন্তু তিনকড়ি বাবু মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের এবং রেলকোম্পানীর কাজে তাঁকে বেশ কিছু শারিরীক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হত, কিন্তু তথাপি তাঁর অদম্য উৎসাহ অকৃত্রিম গ্রন্থাগার প্রীতি দেখে আমাদের ন্যায় ছেলেছোকরারা অনেকেই ভাবত ভাল এক পাগল বিশেষ। সত্যিই তিনি গ্রন্থাগারের পাগল ছিলেন—গ্রন্থাগারকে তিনি প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন এবং ঐ একই রকম দরদ দিয়ে বাংলা দেশের তথা ভারতের গ্রন্থাগার সমূহের সেবা করে গিয়েছেন।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম অধিবেশন হতে আরম্ভ করে কলকাতা মহীশূর, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই বরোদা, জয়পুর, নাগপুর ইত্যাদি প্রতিটি সম্মেলনেই তিনি উপস্থিত থাকতেন এবং এছাড়াও তাঁর গ্রন্থাগার প্রীতি যে কত গভীর ছিল তা বেশ বোঝা যায় তাঁর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ ও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মানের গ্রন্থাগার সমূহ পরিদর্শন ও পুঙ্খাণুপুঙ্খ ভাবে বিভিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিসংখ্যান সংগ্রহের আগ্রহ দেখে। যদিও তিনি সুদক্ষ গ্রন্থাগারিক ছিলেন না কিন্তু গ্রন্থাগার বিষয়ে তাঁর সাধারণ জ্ঞান বহু শিক্ষিত গ্রন্থাগারকর্মী অপেক্ষা শত গুণ গভীর ছিল। গ্রন্থাগার বিষয়ে ব্যবহারিক ও টেকনিক্যাল বহু বিষয়ে তাঁর পরামর্শ ও উপদেশাদি আমরা ধৈর্য্য ধরে শুনতাম ও তার সারবত্তা প্রণিধান করতাম। শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ রঙ্গনাথন মহাশয়ও তাঁর এই অকপট গ্রন্থাগার প্রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে সম্মান দিতেন। কি করে গ্রন্থাগার পরিষদ নিজের কাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়—জনসাধারণকে কি করে গ্রন্থাগারমুখীন করা যায়—পরিষদের বিভিন্ন কর্ম্মপন্থা কি করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা সম্ভব—বৎসরের পর বৎসর কেমন করে সভ্যসংখ্যা বাড়ানো যায়, সরকারের কাছে কি করে অর্থ আদায় করা যায়—পরিষদের বিভিন্ন কর্ম্মপন্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বাজেট কিরূপ ভাবে করা যায়—সর্ববিষয়েই তিনকড়ি বাবু অদম্য উৎসাহে নানা তর্কবিতর্কাদির সাহায্যে পরিষদের সভা মুখরিত করে রাখতেন। পরিষদের যে কোনো সভায় উপস্থিত থাকলেই তিনকড়ি বাবু কিছু না কিছু বলতেনই। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি আজীবন সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি প্রাক্তন সম্পাদক, সহ-সভাপতি, সভাপতি ও আজীবন সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি এই দুই পরিষদের বিভিন্ন কমিটীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে তা সকলেই

জানেন। রেলের কাজে তাঁহাকে ২/১ বার স্থানান্তরে যেতে হয়—কিন্তু এই বদলি সত্বেও তিনি সুযোগ পেলেই পরিষদের মিটিংএ যোগদান করতেন। বর্দ্ধমানে থাকাকালীন তাঁহার ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক সম্মেলন তথায় অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিনিধি দল সকলেই জানেন কী অদ্ভুত নিষ্ঠার সহিত তিনি সমস্ত ব্যাপারই পরিচালনা করেছিলেন। বাংলাদেশে ডাঃ রঙ্গনাথন মহাশয়কে পরিচিত করবার কাজে তিনকড়ি বাবুই অগ্রণী—আমরা দেখেছি সুদূর পল্লী গ্রন্থাগারে তিনি ডাঃ রঙ্গনাথন মহাশয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মহান অবদান বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন—শ্রোতা হয়ত সামান্য ২।৪ জন মাত্র। কোনো কিছুতেই তিনি হতাশ হতেন না—আশাবাদী তিনি—কাজেই অদম্য উৎসাহে নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করে যেতেন। গীতার সেই 'মা ফলেষু' ছিল তাঁর মন্ত্র।

১৯৪৭ সালে তিনি তাঁর স্ত্রীকে হারান। কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও কেউ তাঁকে শোকে মুহ্যমান হতে দেখেন নি—তাঁর কাজ তিনি নির্লিপ্ত ভাবে করে চলতেন। তাঁর গার্হস্থ্য জীবন কিছু ছিল বলে মনে হয় না—বাড়ীর বাইরে তিনি অফিসের ও পরিষদের কাজে ব্যস্ত—বাড়ীতে যখনই গিয়েছি দেখেছি তিনি Stamp Albumএ Stamp মারছেন—এও তাঁর এক নেশা। কর্ম হতে অবসর গ্রহণ করে তিনি নবদ্যোমে পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উৎসাহ ও উদ্যম যুবকের ন্যায়। আমরাও তাঁর সেই উদ্যমের সঙ্গে তাল রাখতে পারতাম না—নিজেদের অক্ষমতায় লজ্জিত হতাম। তাঁর সাথে পরিষদের বহু সম্মেলনে একত্রে যাবার সুযোগ আমাদের হয়—তাঁর সাথে কথা বার্তায় কেউ কখনো ধরতে পারে নি যে তিনিও একজন বিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নন। সাহিত্যের প্রতিও তাঁর বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল—রবিবাসরের তিনি সক্রিয় সদস্য ও মৃত্যুকালে তার সম্পাদক ছিলেন।

স্বাস্থ্য তাঁর খারাপ ছিল না বটে তবে গত দুই বৎসর তিনি অসুস্থ ছিলেন। বয়স বাড়তে থাকে—কিন্তু উৎসাহ পড়তে থাকে কাজেই অপটু শরীর অত্যধিক ঘোরাফেরা, আহার ইত্যাদিতে অনিয়মে তাঁকে শয্যা নিতে হয়। গত বৎসরের ধাক্কা সামলিয়ে উঠলেও শরীর তাঁর মনের উৎসাহের সাথে পাল্লা দিতে অক্ষম হলেও তিনি আমাদের কথা শুনতেন না—অদম্য উৎসাহে ভগ্ন শরীরের কথা ভুলে যেতেন। মৃত্যুর মাস খানেক পূর্বে যখন আবার অসুস্থ হলেন তাঁর মুখচোখের চেহারা দেখে আমার খুব ভাল লাগে নি। বিপত্নীক—একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি নাতনী তাঁর বালির বাড়ী হতে লিলুয়া রেলকোয়ার্টারে স্থানান্তরিত—কাজেই রোগীর পরিচর্য্যার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা সম্ভব হয় নি। তাঁর মুখ চোখ ফুলে যায়—শরীর রক্তহীন ও রুগ্ন হয়ে পড়ে। যদিও বাড়াবাড়ি কিছু হয় নি—তাঁর নিজের শক্তি সামর্থ্য ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে। ওষুধের গুণে মধ্যে মধ্যে কিছু সামর্থ্য ও জোর পেলে বাইরের রোয়াকে এসে বসতেন, আবার ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। মৃত্যুর দুদিন পূর্বেও পরিষদের নব

পরিচালিত ভবনের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নানান আলোচনা করেন—কি করে অর্থ সংগ্রহ হবে এবং তার জন্য যথাযথ পরিকল্পনার প্রযোজন ইত্যাদির কথা বলেন। পরিষদের নবীন কর্মীদের উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণার কথা বলেন—তারা যে তাঁর সব পরামর্শ গ্রহণ করে না সে সম্বন্ধেও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এও বলেন যে তাহারা নিজেদের মত ব্যবস্থা করতে নিশ্চয় সক্ষম হবে। পরিষদের কয়েকজন কর্মী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন তাহাদের সেবা ও সাহায্যের কথা বারংবার উল্লেখ করেন। সোমবার ১লা জুলাই ১৯৬৩ তিনি মরধাম ত্যাগ করেন—শুক্রবার আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়—শনিবারও লোক মারফৎ খবর পাই যে বমির ভাব বাড়ছে এবং তাতেই তাঁকে আরো দুর্বল করে ফেলে। সোমবার সকালে পুত্রকে খবর দেবার পর Ambulanceএ করে লিলুয়া রেলওয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বেলা ১২টা নাগাৎ—রক্ত দানের ব্যবস্থা হয়—রক্ত আনতে লোক যায়—রক্ত এসে পৌঁছুবার পূর্বেই তাঁর অমর আত্মা চিরশান্তি লাভ করে। রাত্রি ১১টায় বাড়ী ফিরে বন্ধুবর শ্রীপরিমল আচার্য মশাইয়ের চিঠিতে ৺তিনকড়ি বাবুর খবর পেয়ে বালী পাঠকপাড়া শ্মশান ঘাটে যাই—চিতা তখন জলন্ত। বৈশ্বানর সহস্র লেলিহান জিহ্বায় তিনকড়ি বাবুর নশ্বর দেহকে গ্রাস করেছে—তাঁর অবিনশ্বর আত্মা এ জগতের ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ গ্রন্থাগার জগতের এক অকৃত্রিম দরদী বন্ধু হারালো। তাঁর অমর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। তাঁর প্রেরণা পরিষদ কর্মীদের অনুপ্রাণিত করুক—তাহলেই তিনি পরিতৃপ্ত হবেন।

নারায়ণ চক্রবর্তী

গ্রন্থাগার বন্ধু তিনকড়ি দত্তের স্মরণে

ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস লেখা হয়নি। এই ইতিহাসে যে সব দিক্‌পালের নাম চিরউজ্জ্বল থাকবে তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত মশাই একজন। প্রথম জীবনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর উৎসাহ পরবর্তী জীবনে একনিষ্ঠ সাধনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। অনুরাগের এই রূপান্তরের ইতিহাস তাঁর দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস, যার সঙ্গে জড়িত বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস।

সদ্য-শোকসন্তপ্ত মনে শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও অধুনা-সংঘটিত ঘটনাবলীর কথাই আসছে। তিনকড়িবাবুর সঙ্গে আমার শ্রেষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

তাঁকে আমি দাদা বলে ডাকতাম ও মানতাম। গ্রন্থাগার জগতে আমার একমাত্র দাদার মহাপ্রয়াণ ঘটল। ঠিক এই সময়টায় দাদাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসের খসড়া তৈরী হয়ে গেলে দাদার সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করব ভাবছিলাম। এ সম্বন্ধে আরও খানিকটা তথ্য সংগ্রহ করে বরোদা থেকে ফিরছি ২রা জুলাই। ক'দিন পরে দুঃসংবাদ পেলাম দাদার দেহান্ত ঘটেছে ১লা জুলাই, ১৯৬৩। তাঁর যা দেবার ছিল তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে দিয়ে গেলেন দীর্ঘকাল। সেই মহান দানের গৌরব ও তাঁর পুণ্য স্মৃতির আদর্শ রক্ষার দায়িত্ব রইল আমাদের উপর।

১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে তিনকড়িদা ক'দিন এসে দিল্লীতে আমাদের বাসায় ছিলেন। অতি সহজ, সরল ছিল তাঁর জীবন যাত্রা, একান্ত আপন জনের মত ছিলেন। সকালে সন্ধ্যায় কত আলাপ হতো গ্রন্থাগার আর গ্রন্থাগারিকদের বিষয় নিয়ে। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পূর্বে দু'একবার আমাদের বাসা হয়ে গেছেন তিনকড়িদা। ১৯৬১ সালে এখানে অবস্থানের সময় জানতে পারলাম ডাক টিকিট সংগ্রহের উপরও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু সবার উপরে ছিল তাঁর গ্রন্থাগার প্রীতি, আর কদিন ঘনিষ্ট আলাপের ফলে বুঝতে পারলাম জড়ভরতের অবস্থা হয়েছিল তাঁর। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদরূপী মৃগশিশু তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছিল। দাদার আগমন উপলক্ষে একদিন সন্ধ্যায় আমি স্থানীয় কয়েকজন গ্রন্থাগারিক বন্ধুদের আমন্ত্রণ করি। সর্বশ্রী ধনপত রায়, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রলাল ভরদ্বাজ, রাখাল চক্রবর্তীবিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ কয়েকজন আসেন। অনেকক্ষণ ধরে সহৃদয় আলাপ আলোচনা হলো। হঠাৎ দাদার কি খেয়াল হলো, একখানা রসিদ বই বার করে আমাকে বললেন, "এই নিন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহ নির্মাণ তহবিলের জন্য দিল্লীতে চাঁদা আদায়ের জন্য রসিদ বই।" আমি একটু ইতস্ততঃ করছিলাম দেখে তিনি দাদার মতো আমার আচরণের প্রতিবাদ করলেন এমন স্পষ্টভাবে যে উপস্থিত সবাই একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। রাখালবাবু ও জগন্নাথ বললেন, "আপনি রাগ করবেন না, এইতো সেদিন IASLIC Building Fund এর জন্য ইনি আবেদন পাঠিয়েছেন, এখানকার In service Library Science Course ইত্যাদির দায়িত্বও রয়েছে ওর।" শিশুর ন্যায় দাদা বললেন, "আমি দিচ্ছি, উনি কি পাঁচটা টাকাও তুলে দিতে পারেন না।" আমি বললাম, "এক্ষুণি পাঁচ টাকা দিয়ে দিচ্ছি।" তিনি আরও রেগে জবাব দিলেন, "চাইনা, আপনার কাছ থেকে তো চাইনি, তুলে দিতে বলছিলাম।" পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে দাদা আবার হঠাৎ বলে উঠলেন, দেখলেন তো বুড়ো হয়ে গেছি।" কি হলো জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "এই যে নিজের উপর Control হারিয়েছি ; কাল সবার সামনে কী কাণ্ডটাই না করে বসলাম, ইত্যাদি।" তাঁকে আশ্বাস দিলাম, আমি বা

বন্ধুরা কেহ কিছু মনে করেনি। বললেন, "ওখানেও এই কাণ্ড হয়, ছেলেগুলোর উপর হঠাৎ রাগ করে বসি অনেক সময়, তাঁরাও কিছু মনে করে না, আমার ছেলের মতো।" এই ছেলের মত যাঁরা তাঁদের সম্বন্ধে দাদা সস্নেহে ও সগর্ব্বে আমার সঙ্গে পূর্ব্বেই অনেক আলাপ করেছিলেন কদিন ধরে; এরা হচ্ছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরুণ কর্ম্মিগণ। স্বর্গীয় মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের পরে তিনকড়িবাবুর ন্যায় এমন একনিষ্ঠ দরদী বন্ধু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আর ছিল না। আমার মনে হয় তিনকড়িবাবুর তিরোধানের সঙ্গে পরিষদের জীবনের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হলো।

তিনকড়িদার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত একটা গুরু দায়িত্বের কথা মনে পড়ছে। দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রবর্ত্তনের গতি যেরূপ অবহেলিত ও মন্থর গতিতে চলছে তা দাদাকে বড়ই পীড়া দিত। কয়েকবার শ্রীসোহন সিংহের (কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়) সহিত তাঁর এ বিষয়ে আলাপের ব্যবস্থা করে দিলাম। শ্রীসোহন সিংহ Library Advisory Boardএর রিপোর্টে এক অলিক সৌধ নির্ম্মাণ করেছেন Library Cessএর অবাস্তব মার্ব্বেল পাথরে গেঁথে। এ বিষয়ে দাদাকে আমার মতামত জানালে তিনি বহু প্রশ্ন করলেন আমাকে। আমার সাধ্যমত দেশের আর্থিক, বিশেষ করে কর সংবিধানের ক্রমবর্দ্ধমান চিন্তাধারা ও রূপায়ণের কথা সবিশেষ তাঁকে জানালাম। 'যে কারণে সরকার (কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয়) প্রাথমিক শিক্ষার সকল ব্যয়ভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ঠিক সেই কারণেই সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পোষণের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।' আমার এই মত দাদাকে বড়ই আকৃষ্ট করল। তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখালেন এ সম্বন্ধে; আর বারবার আমাকে বললেন এ মত প্রচার করতে। কলকাতা ফিরে কয়েক বার তাগাদাও দিলেন এসম্বন্ধে। ২৭শে নবেম্বর, ১৯৬১ তারিখের চিঠিতে লিখছেন, "আপনার প্রবন্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যত শীঘ্র পারেন উহা পাঠাইবেন।" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত এক বিশেষ সভায় 'গ্রন্থাগার আইনে আর্থিক সংবিধান' নামক যে প্রবন্ধটি আলোচিত হয় এবং পরে 'গ্রন্থাগার' বৈশাখ, ১৩৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তা লিপিবদ্ধ করা হয় তিনকড়িদার প্রেরণায়। পরে Trend and Progress of Public Library Development in India' শীর্ষক যে প্রবন্ধ *IASLIC Bulletin* সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তা পূর্ব্বোল্লেখিত প্রবন্ধের অনুসরণ ও পরিবর্দ্ধনার্থে। একান্তভাবে ব্যক্তিগত কল্পনায় যেন দেখছি সরল, সহৃদয়, সহাস্যবদন, ঋজু, উন্নত চরিত্র তিনকড়িদা সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন, দেখবেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নয়নের জন্য আমরা কে কি করি। ভিক্টর হিওগো বলেছিলেন, "The dead are not absent, but invisible." তিনকড়িদা অলক্ষ্যে চলে গেলেন—তাঁকে প্রণাম।

অনাথ বন্ধু দত্ত

তিনকড়ি দত্ত স্মরণে

স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্তের সহিত আমার বন্ধুত্ব বহু বৎসরের, আজ আর স্মরণ করিতে পারিতেছি না তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় কখন হইয়াছিল। তবে পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম হইবে না। আর এ পরিচয় যে কেবল গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কেই হইয়াছে তাহাও নহে তবে প্রধানতঃ গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় কাজে, বিশেষতঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য্য পরিচালনায় সহকর্মী হিসাবে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছে এবং দৃঢ় হইয়াছে।

সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা সম্পর্কীয় যে কোন অনুষ্ঠান ও আন্দোলনের প্রতি তিনকড়ি বাবুর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। সুতরাং এরূপ যে কোন একটি বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যিনি বা যাঁহারা যুক্ত তিনি বা তাঁহারা তিনকড়ি বাবুকে চেনেন না বা জানেন না একথা বলিলে আমি বিশ্বাস করিব না। এমন সুদর্শন, মিষ্টভাষী, সদালাপী মানুষটি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। আর ক্রমশঃ আলাপ পরিচয় হইলে বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী, তিনকড়ি বাবু ছিলেন এমন মানুষ। পুরাতন দিনের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে, নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে (বর্তমানে ইহার নাম পরিবর্তন হইয়াছে) তাঁহার সহিত বহুস্থানে, বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে, যোগ দিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া রবিবাসরে ও অন্যান্য সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ও মজলিসে যে তাঁহার সহিত কতবার মিলিয়াছি তাহার হিসাব না থাকিলেও স্মৃতির মাধুর্য্য আজও মনে লাগিয়া আছে। তাঁহার বন্ধুত্বের গণ্ডী বয়সের ব্যবধান কখনও স্বীকার করে নাই। এজন্য স্কুল কলেজের বালক বালিকা হইতে নূতন কর্মী, তরুণের দল এবং তাঁহার সমবয়স্ক ও বয়োবৃদ্ধ সকলের সহিত তিনি অবাধে মিশিতেন। আর কিভাবে তিনি তাঁহার প্রাণের অধিক প্রিয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁহাদিগকে টানিয়া আনিবেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য করিবেন এই ছিল তাঁহার চেষ্টা।

তিনকড়ি বাবুর কথা বলিতে গিয়া আর একটী ব্যক্তির মধুর স্মৃতি স্বতঃই মনে জাগিয়া উঠে—তিনি ছিলেন কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি—গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক স্বরূপ। একবার একজন বিখ্যাত তৎকালীন জননেতা মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়কে হাসিয়া বলিয়াছিলেন "দেখুন আপনার কাজের ক্ষেত্রটী একেবারে নিষ্কণ্টক, এখানে কলহ বিবাদ ত দূরের কথা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পর্য্যন্ত নাই—লাইব্রেরি আন্দোলন এমন জিনিস। আর আপনাকে

দেখলেই লাইব্রেরী মনে পড়ে।" তিনকড়ি বাবু সম্বন্ধেও বলা চলে যে তাহাকে দেখিলে সর্বাগ্রে লোকের মনে পড়িত—"লাইব্রেরীর" কথা। তিনি যেন ছিলেন লাইব্রেরী আন্দোলনের প্রতীক। তিনকড়ি বাবু ছিলেন মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের উপযুক্ত শিষ্য ও ভক্ত এবং গুরুর আদর্শে চিরদিন কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই উভয়ের অবদান বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মিগণ চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখিবেন। অথচ ইহাদের কেহই পেশায় গ্রন্থাগারিক ছিলেন না—একজন ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান, এবং সমাজসেবী এবং আর একজন রেল কর্মচারী—ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু উভয়েই বুঝিয়াছিলেন দেশের শিক্ষা বিস্তারে এবং শিক্ষা আন্দোলনে লাইব্রেরীর স্থান অতি উচ্চে। তিনকড়ি বাবুর বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ সয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন, প্রথম পরিচয়ের বহু বৎসর পরে জানিতে পারিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন যে তিনকড়ি বাবু 'পেশায়' ইঞ্জিনিয়ার।

গ্রন্থাগার আন্দোলন যাহাতে শক্তিমান হয় এ জন্য তিনকড়ি বাবুর আগ্রহে এবং চেষ্টায় মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে কয়েকখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনকড়ি বাবুর খুবই উৎসাহ ছিল। খুবই আনন্দের বিষয়, কর্মিগণের চেষ্টায় 'গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরী'র নূতন সংস্করণের ছাপা আরম্ভ হইয়াছে তাহা তিনি দেখিয়া গিয়াছেন।

পরিষদের একখানি মুখপত্রের অভাব প্রথম হইতেই অনুভূত হয় এবং বর্তমান প্রবন্ধের লেখক সম্পাদক থাকাকালে (১৯৫৬) 'গ্রন্থাগার' ত্রৈমাসিক পত্রিকা রূপে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় (কার্তিক, ১৩৫৮)। বর্তমানে মাসিক (বৈশাখ, ১৩৬৩ হইতে) পত্রিকাগুলির মধ্যে ইহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে—ইহাতে তিনকড়ি বাবু খুবই আনন্দ পাইতেন।

তিনকড়ি বাবুর একটী বড় আশা ছিল পরিষদের যাহাতে একখানি নিজস্ব গৃহ হয়। এই গৃহে ইহার নিজের লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম থাকিবে, ছাত্র-ছাত্রীগণের ক্লাসের স্থান হইবে এবং বক্তৃতা ও সভার জন্য একটা হল থাকিবে। তিনি ইহার পত্তন দেখিয়া গিয়াছেন. ইহা খুবই আনন্দের কথা। তাঁহার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত এবং সার্থক করিবার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের অনুরোধে ১৯৬০, ১৯৬১ এবং ১৯৬২ সনে তিনকড়ি বাবু ভারত সভার সমাজ সেবা শিক্ষণ কেন্দ্রে লাইব্রেরী আন্দোলন, লাইব্রেরী সংগঠন এবং লাইব্রেরীর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ সেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এ বৎসর তাঁহার অভাব সকলেই অনুভব করিবে।

তিনকড়ি বাবুর বাংলা ও ইংরেজি রচনায় বেশ হাত ছিল। আমি যখন Free Lance (1954-57) নামক একটী কলিকাতার সান্ধ্য পত্রিকার সম্পাদনার সহিত যুক্ত ছিলাম তখন লাইব্রেরী আন্দোলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ দিয়া তিনকড়ি বাবু আমাদের সাহায্য করিয়াছিলেন।

তিনকড়ি বাবু নির্দোষ কাজ পছন্দ করিতেন এজন্য প্রত্যেকটী কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখা তাঁহার স্বভাব ছিল। এজন্য তরুণগণকে সকল রকম সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার এই আন্তরিকতাকে কেহ কেহ অপরের কার্যে হস্তক্ষেপ বলিয়া যে ভুল বুঝিত না তাহা নহে। কিন্তু তাহাতে তিনি কিছুই মনে করিতেন না। পরিষদের তরুণ কর্মিগণ এবং তাঁহার সহকর্মী সকলেই তিনকড়ি বাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিতেন। এরূপ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়া একমাত্র তিনকড়ি বাবুর মত সদাশয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁহাকে সম্পাদক, সহকারী সভাপতি এবং সর্বশেষে সভাপতি রূপে নির্বাচন করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

আজ বন্ধুবৎসল, সহকর্মী, দরদী বন্ধু হারাইয়া বড়ই নিঃস্ববোধ করিতেছি।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনকড়ি বাবুকে যেমন দেখিয়াছি

জাগাতিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মানুষ নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান গড়ে। কিন্তু জনজীবনে কোন প্রতিষ্ঠান যদি স্বীয় সত্তার প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করিতে না পারে তবে তাহা জনমনে স্বীকৃতি না পাইয়া অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয় আর যাহা নিজের অস্তিত্বকে অপরিহার্য করিয়া তুলিতে পারে এবং সত্যসত্যই কল্যাণ সাধন করে তাহাই ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

প্রতিষ্ঠান আদরনীয় হয় কর্মী যদি সৃজনী বুদ্ধি ও সংগঠন শক্তির অধিকারী হয় তবেই প্রতিষ্ঠান জনমনে স্থায়ী আসন লাভ করে এবং তাহার প্রসারও হয়।

বাংলা দেশে যখন গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হয় তখন জনমনে ইহার প্রয়োজনীয়তা তেমনভাবে অনুভূত হয় নাই, হইতে পারেও না। কারণ আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই অশিক্ষিত। গ্রন্থের সঙ্গে যাহার সম্পর্ক নাই সে গ্রন্থাগারের মূল্য বুঝিবে কিরূপে? তাই যে মুষ্টিমেয় লোক ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া কাজে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমশ ঐ সম্পর্কে জনচেতনা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনেরও প্রসার হইতে থাকে। যাঁহাদের সৃজনী বুদ্ধি ও সংগঠন শক্তির বলে গ্রন্থাগার আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের নাম বিশেষ-

ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি প্রথমে হুগলী জিলা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক, সহকারী সভাপতি ও সভাপতি হন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্পেনের বার্সিলোনা সহরে চতুর্থ আন্তরাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের বাঙ্গালাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্তক কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় ঐ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হইয়া যোগ দিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা কলিকাতায় আহূত এক সভায় প্রকাশ করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া জনজীবনে যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং গ্রন্থসজ্জা, গ্রন্থপাঠ, গ্রন্থনির্বাচন, গ্রন্থাগারের পরিবেশ, গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতি সম্পর্কে যে অনেক কিছু ভাবিবার, বুঝিবার ও বুঝাইবার আছে সে বিষয়ে আমরা সচেতন হই এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝিতে পারি।

তাহার ফলে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আমরা বিক্রমপুরে গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করিতে উদ্যোগী হই। আমাদের আহ্বানে ও পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা পেঁৗছাইয়া দিবার আগ্রহে কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় উক্ত সম্মেলনের সভাপতি হইতে সম্মত হন। ঐ সম্পর্কে পত্রালাপ করিবার সময় তিনি লিখিয়া জানান যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে গিয়া ঐ সম্মেলনে যোগ দিতে চান। আমরা ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভাবী সম্ভাবনা কিরূপ আছে তাহা লক্ষ্য করিবার জনাই বোধহয় তিনি ঐ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সানন্দে তাঁহার আগমনে সমর্থন জানাইয়া আমাদের সম্মতিপত্র দিলাম। তিনি নিজ ব্যয়েই আমাদের সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সম্মেলন স্থলে তিনকড়ি বাবু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, নিয়মিত সময়ে গ্রন্থাগার খোলা রাখা ও বন্ধ করা একই পাঠকবর্গের নিকট গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন।

তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছেন। কাজে বেশ উৎসাহ। নূতন স্থানে আসিয়া তিনি যেন আরও উৎসাহ পাইলেন। সমাগত গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে তাহাদের গ্রন্থাগারের অবস্থা, অভাব-অসুবিধা, সমস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কাহারও কাহারও কাজের প্রশংসা করিলেন কাহাকে কাহাকেও বা কিছু কিছু পরামর্শ দিলেন। তাঁহার নিজের সঙ্গে ছিল ফটো তোলার একটী যন্ত্র। তাহা দ্বারা সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধি ও পদাধিকারীদের ছবি তুলিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। পূর্বে কোন পরিচয় না থাকিলেও আমাকে ও অন্যান্য সকলকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই আপন করিয়া লইলেন। সম্মেলনের উদ্বোধক সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত তাঁহার পরিচয় দিতে উঠিয়া বলিলেন; 'তিনকড়ির সম্বন্ধে আর কি বলব, সে

আমাদের সোনার তিনকড়ি'। তিনকড়ি বাবুর সঙ্গে যোগেন্দ্র বাবুর পূর্বেই পরিচয় ছিল এবং তিনি তাঁহাকে যোগেন-দা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সম্মেলনে যাইবার পূর্বে কলিকাতায়ই তাঁহাদের মধ্যে এই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী হিসাবে তাঁহার ঐকান্তিকতা ও কর্মকুশলতা দেখিয়া তিনি 'সোনার তিনকড়ি' কথাটী তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া আমার মনে এই প্রতীতিই জন্মিয়াছে যে ইহা শুধু একটী স্তোকবাক্য নয় প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষকর্মটী সুপ্রযোজ্যও।

বলিতে গেলে গ্রন্থাগার সম্পর্কে তিনকড়ি বাবুর একটা পূর্বসংস্কার ছিল। এই সংস্কার থাকার ফলেই তাঁহাকে অপরের বুদ্ধিতে চলিতে হইত না, স্বকীয় স্বাধীন চিন্তাই তাঁহাকে নূতন নূতন পথের সন্ধান দিত। রেলের কর্মচারী হিসাবে তিনি সারা ভারতে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সৌখীন পর্যটকের প্রমোদ-ভ্রমণের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি সেই সুযোগকে কাজে লাগান নাই, তিনি ইহার সদ্ব্যহার করিয়াছিলেন ভারতের আনাচেকানাচে যে গ্রন্থাগার ছিল তাহা স্বচক্ষে দেখা ও তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করার জন্য। ইহার ফলে তাঁহার অভিজ্ঞতা বাড়িল এবং তাঁহার সহজাত গ্রন্থাগারোন্মুখতা গ্রন্থাগারের শ্রেয় ও প্রেয় সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষভাবে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ না হইলেও তাঁহার এতৎসম্পর্কীয় কাণ্ডজ্ঞান এত বেশী ছিল যে তাহা দ্বারাই তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাফল্যের পথে আগাইয়া নিতে পারিয়াছিলেন। সম্মেলনের শেষে তিনি আমাকে ঢাকা জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি নাই। পরে তিনি ঢাকা সহরের গ্রন্থাগারগুলি দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

আন্তরিকতাই ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ। গ্রন্থাগার পরিষদের যখনই যে কাজে তিনি হাত দিয়াছেন তখনই সেই কাজের খুঁটিনাটি জানিয়া তাহাকে ত্রুটীহীণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দায়সারা গোছের কাজ তিনি কখনও করিতেন না। তিনি আমাদের গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি শুধু সভায়ই সভাপতিত্ব করিতেন না। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সত্যকার সভাপতি। খুঁটিনাটি ব্যাপারের খোঁজখবর লওয়া তাঁহার স্বভাব এবং কোন কাজ অসমাপ্ত থাকিলে বারবার তাগিদ দিয়া তাহা করাইয়া লইতেন। সভাপতি হইলেও তিনি অনেক সময় কেরাণীর মত পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। এছাড়া সভায় রীতিমত উপস্থিত থাকাও তাঁহার আর একটী উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল। পারতপক্ষে তিনি কখনও সভায় অনুপস্থিত থাকেন নাই।

হনুমানের রামের প্রতি অনুরক্তি কতটা গভীর ছিল তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া রামায়ণকার লিখিয়াছেন, 'রাম সে জ্ঞান, রাম সে ধ্যান, রামময় তাহার প্রাণ।' তিনকড়িবাবুর সম্বন্ধেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তিনি ছিলেন

গ্রন্থাগার পরিষদগত প্রাণ। গ্রন্থাগার পরিষদের কিসে উন্নতি হয়, কিসে ইহা সার্থকভাবে জনগণের সেবায় লাগিতে পারে ইহাই তাঁহার ছিল সর্বক্ষণ চিন্তা। রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও তাঁহার স্বস্তি ছিল না। কোন কাজ করিতে বিলম্ব হইলে কেন হইল তাহার সম্বন্ধে শুভানুধ্যায়ীর দৃষ্টি লইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বা গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ভারতীয় বা বিদেশী কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে পরিষদে নেওয়া বা তাঁহার দ্বারা বক্তৃতা দেওয়ান ইত্যাদি কাজে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

শিলিগুড়ির গ্রন্থাগার সম্মেলনের পরে তাঁহার সঙ্গে গ্যাংটক পর্যন্ত যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল। পথে আমরা কালিম্পংয়ে দুইদিন ছিলাম। সেখানে অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখার কর্মসূচীর মধ্যে তিনি সেখানকার সরকারের পরিচালিত গ্রন্থাগার দেখার কাজটাও অন্তর্ভুক্ত করিতে বলেন। পথশ্রমের দরুণ আমরা গ্রন্থাগার দেখিতে রাজী ছিলাম না। কিন্তু আমাদের থেকে বয়োবৃদ্ধ হইলেও এই পথশ্রম তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার একান্ত পীড়াপীড়িতে অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার ইচ্ছানুবর্তী হইয়া আমাদিগকে সহগামী হিসাবে কালিম্পংয়ের গ্রন্থাগার দেখিতে যাইতে হইল। সেখানকার গ্রন্থাগারিক তাঁহার নানাবিধ খবরাখবর লইবার আগ্রহ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং আমরাও লাভবান হইলাম। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের গোরক্ষপুর অধিবেশনের সময়ও তিনি সেখানে গিয়া স্থানীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে খোঁজখবর লইয়া তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন এবং পরিচালককে নানাবিধ পরামর্শ দেন।

বার্ধক্যের দরুণ ইদানীং তাঁহার চরিত্রে একটা অসহিষ্ণুতার ভাব দেখা গিয়াছিল। এই অসহিষ্ণুতা আমাদের কাছে কখনও কখনও অশোভন মনে হইত এবং আমাদের সহনশীলতার উপর আঘাত করিত। কিন্তু তাঁহার এই অসহিষ্ণুতা আমাদের পক্ষে শাপে বর হইয়াছে। গ্রন্থাগার পরিষদের জন্য নিজস্ব বাড়ী করার একটা দুর্বার ঝোঁক তাঁহার মাথায় চাপিয়া বসিয়াছিল। আমাদের বাড়ী করার মত সম্বল না থাকিলেও তিনি কলিকাতা করপোরেশনের নিকট হইতে জমির সন্ধান লইয়া জমি সংগ্রহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তাঁহার আগ্রহাতিশয্যেই নিঃসম্বল অবস্থায়ও আমাদের পরিষদের জন্য জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

গ্রন্থাগার পরিষদ ছাড়া তিনকড়ি বাবুর দেশের অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিতও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি পূর্বেকার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং রবিবাসরের উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

এছাড়া তাঁহার কয়েকটী সখও ছিল। দেশবিদেশের ডাক টিকিট ও নানা প্রকার গাছপালা সংগ্রহ করিতে ও ছবি তুলিতে তিনি ভালবাসিতেন।

মানুষের দেহ নশ্বর, কিন্তু তাহার সৎকাজ অবিনশ্বর। যুগ যুগ ধরিয়া এই সৎকাজ ভবিষ্য পুরুষকে তাহার নিজের জীবন মহনীয় করিয়া তুলিবার জন্য প্রেরণা যোগায়। তিনকড়িবাবুর গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা গ্রন্থাগার কর্মীদের পথের পাথেয় হউক ইহাই কামনা। তাঁহার আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করি।

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

৺তিনকড়ি দত্ত স্মরণে

৺তিনকড়ি দত্ত মশায়ের লোকান্তরিত হওয়ায় তাঁহার সহকর্মী গুণমুগ্ধ এবং পরিচিত শত শত ব্যক্তি শোকে মুহ্যমান হইয়াছেন। তিনকড়ি বাবু ব্যক্তিগত জীবনে অমায়িক নিরহংকার, বন্ধুবৎসল, সর্বজনপ্রিয় অজাতশত্রু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরিচিত সমস্ত ব্যক্তিদের যে শোক সৃষ্টি করিবে ইহা অতি স্বাভাবিক কথা।

তিনকড়ি বাবুকে অমি প্রথম দেখি ছাত্রাবস্থায়। তখন তাহাকে চিনিতামও না, তাঁহার নামও জানিতাম না। স্কুলে পড়ি। হাওড়া জেলা ছাত্র সংঘ পরিচালিত গ্রন্থাগারে কাজ করি এবং দেশ বিদেশের ছাত্রদের দেশ সংগঠনে অবদানের কথা আলোচনা করি। জনশিক্ষা প্রচার এবং প্রসারের মধ্যেই দেশের সমুন্নতির তথা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাফল্যের যে প্রধানতম সম্ভাবনা নিহিত আছে ইহা তখন আমাদের সকলেরই বিশ্বাস। এই অবস্থায় হাওরা ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন হলে হাওড়ার গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা আহূত হয়। হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ্ সংগঠনের জন্য। ৺গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই পরিষদ গঠিত হয়। তিনকড়ি বাবু এই সভায় উপস্থিত হন এবং যতদূর মনে করিতে পারি ঐ পরিষদ্ সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

তাহার প্রায় কুড়ি বৎসর বাদে শান্তিপুরের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রাক্কালে তিনকড়ি বাবুর সহিত দ্বিতীয় মিলন। তদানীন্তন পরিষদ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় ঐ সম্মেলনে আমাকে "স্কুল লাইব্রেরী" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পড়িতে আদেশ করেন। ৺তিনকড়ি বাবু স্কুল লাইব্রেরীর বিষয়ে সমধিক উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল স্কুল লাইব্রেরীগুলি ঠিকভাবে পরিচালনা করিয়া তরুণ ছাত্রদের মনে গ্রন্থ প্রীতি সঞ্চার করিতে পারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তাই তিনি আমার প্রবন্ধ রচিত হইলে তিনি আমাকে ঐ বিষয় বিস্তারিত

আলোচনা করিয়া একখানি পুস্তক রচনা করিতে বলিয়াছিলেন—ইহা আমাকে কম উৎসাহিত করে নাই।

পরবর্তী কালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের জন স্মিটন যখন পরিষদ আয়োজিত সভায় ধারাবাহিক চারিটি বক্তৃতা করেন (ঐ বক্তৃতাগুলি ভারত সরকার পুস্তক আকারে প্রকাশ করিয়াছেন) তখন ৺তিনকড়ি বাবুর আদেশে আমি ঐ বক্তৃতাগুলি বাংলায় অনুবাদ করি এবং উহা 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত হয়। তিনকড়ি বাবুর সহিত আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে এবং যখন পরিষদে অধিকতর দায়িত্বজনক পদলাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটে তখন ৺তিনকড়ি বাবুর আরও অধিক পরামর্শ ও উপদেশ লাভ করিতে থাকি।

মৃত্যুর পূর্বের দুই বৎসর ৺তিনকড়ি বাবু পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন আমি সম্পাদক নিযুক্ত হই। এই দুই বৎসর নিয়মিত প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শনিবার তিনি পরিষদ কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া পরিষদের আভ্যন্তরীন কাজকর্ম পর্যালোচনা করিতেন। আমরা উপস্থিত থাকিতে না পারিলে ছোট ছোট টুকরা কাগজে তিনি বিভিন্ন বিভাগের ত্রুটি বিচ্যুতি, কর্তব্য এবং অনিষ্পাদিত কার্য সম্বন্ধে নির্দেশনামা দিয়া যাইতেন। পরিষদের গঠনতন্ত্র এবং আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার নিখুঁত স্পষ্ট ধারণা ছিল এবং এই দুইটি বিষয়ে যথাযথ গুরুত্বের অবহেলা তিনি কখনই ঘটিতে দিতেন না। তাঁহার সহিত তাল রাখিয়া কাজ করা আমার নানা কারণে সহজ ছিল না। কিন্তু তিনি কখনই অব্যাহতি দিতেন না। দীর্ঘদিন তাঁহাকে এড়াইয়া চলিলে তিনি সোজা আমার কলেজে চলিয়া আসিতেন ও কাজের কৈফিয়ৎ দাবী করিতেন। পরিষদের কাজের নানাবিধ সম্প্রসারণের জন্য তিনি এমন কি জুলুম করিতেও ছাড়িতেন না। আমি তাঁহার সহিত তাল রাখিয়া উঠিতে না পারায় একাধিকবার তিনি পদত্যাগের ভীতিও প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত লোককে লইয়া কাজ করিবার তাঁহার অস্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। নানা বিভাগ সৃষ্টি করিয়া নূতন নূতন লোককে এক একটি বিভাগের ভার দিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ, বহু লোককে তিনি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। নূতন প্রতিষ্ঠান ও লোককে পরিষদের সভ্য করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অবধি ছিলনা। পরিষদের জমি সংগ্রহ, মার্কিণ সংবাদ প্রচার সঙ্ঘের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্রের সম্বন্ধে পুস্তক প্রচার, নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ এবং ডিরেক্টরী সম্পূর্ণীকরণে ৺তিনকড়ি বাবুর উৎসাহ, সজাগ প্রহরা, তীব্র সমালোচনা ও ভর্ৎসনা এবং আনন্দ প্রকাশ ভুলিবার নয়। আত্মসমালোচনায় তিনি কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। আমরা যাহারা দায়িত্ব লইয়া অনেক সময় ঠিকমত পালন করিতে পারি নাই—সেই আমরা তাঁহাকে বিশেষ ভয় করিতাম। শুধুমাত্র আদেশ বা উপদেশ দিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না। আমাদের সচেতন করিবার জন্য প্রকাশ্য সভায় পর্যন্ত আমাদের শাসন করিয়াছেন। তবে অব্যবহিত পরক্ষণেই তিনি তাঁহার স্মিতহাস্যে আমাদের তদানীন্তন দুঃখ দূরীভূত করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা শিক্ষকের মত

দেখিতাম। শাসনের সময় নিশ্চয়ই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু তাঁহার বাধাবিহীন স্নেহামৃতের অদৃশ্য স্পর্শ সর্বদা অনুভব করিতাম। তিনকড়ি বাবুর ব্যবহার স্বতঃই আমাদের বৈদিক প্রার্থনা মনে করাইয়া দেয়—

সহনাববতু, সহনৌভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ,
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ।।

স্বর্গত তিনকড়ি বাবুর অন্তিম সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারি নাই—তাঁহার শেষ ইচ্ছা জানিতে ও শেষ উপদেশ লাভ করিতে পারি নাই—ইহা আমার জীবনের কম পরিতাপের কথা নহে। যখন মনে করি তিনি মৃত্যুর পূর্বে সাপ্তাহিক-কাল শয্যাগত ছিলেন আর সৌরেন, প্রবীর, ফণীবাবু, বাণীদি প্রভৃতি অনেকেই তাঁহাকে সেই সময় দেখিয়া আসিয়াছেন—কেবল আমি পারি নাই, তখন নিজেকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী মনে হয়।

স্বর্গত তিনকড়ি বাবু না থাকায় আমরা স্বাধীন হইয়াছি। আজ আমাদের ভয় করিবার কিছু নাই, আমাদের বিবেচনার ভুল কেহ ধরিবে না, নূতন কাজ আরম্ভ না করিলেও সাহস করিয়া কেহ আমাদের গালি দিবে না। আরব্ধ কার্য অসমাপ্ত রাখিলেও এক বিবেক দংশন ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করিতে হইবে না। কিন্তু তবুও আমরা নিশ্চিন্ত নই কেন? কেন, মনে হয় শাসন করিবার, আদেশ করিবার, ভুল ধরিবার জন্য তিনি আরও বহুকাল বাঁচিয়া থাকিলে আমরা পর্বতের আড়ালে থাকিতাম, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম।

স্বর্গত তিনকড়ি বাবু জীবনে সম্মান ও ভালবাসা কম পান নাই। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতির সম্মুখে সরকার তাঁহাকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। হাওড়া-হুগলী হইতে নিখিল ভারত পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থাগার-সংগঠনেই তাঁহার নেতৃত্ব অবিসংবাদী ছিল। গ্রন্থাগার কর্মী মাত্রই তাঁহাকে আপন জন মনে করিতেন। তাঁহার জন্য আয়োজিত শোক-সভায় যে জনসমাগম হইয়াছিল তাহা যে কোন প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীর জন্য অনুষ্ঠিত শোক সভার পক্ষেও গৌরবজনক। সারা ভারতের গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁহার বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করিয়াছে। একাধিক প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁহার স্মরণে বিশেষ সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে।

তাঁহার মত নিষ্ঠাবান, কর্তব্যোনিবেদিতপ্রাণ কর্মীর এই কীর্তিলাভ ও শ্রদ্ধালাভ আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করিবে, ইহাই আমাদের ভরসা।

শোক সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, ও বর্তমান বৎসরের সহঃসভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্তর তিরোধানে শোক প্রকাশ করবার জন্য ৭ই জুলাই ১৯৬৩ সন্ধ্যা ৬ ৩০ মিঃ এ কলেজ স্কোয়ারস্থ স্টুডেন্টস হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সভার প্রারম্ভে জাতীয় গ্রন্থাগার এবং পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে তিনকড়ি দত্তর প্রতিকৃতিকে মাল্যভূষিত করা হয়।

শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু বলেন যে তিনকড়িবাবুর মৃত্যুতে পরিষদ তথা সমগ্র গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল, তাঁর এটা ব্যক্তিগত ক্ষতি তো বটেই। তিনকড়িবাবুর পরিষদের প্রতি অসীম মমতা ছিল। পরিষদের বর্তমান যুগের অনেক তরুণ কর্মীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হ'ত। তাঁর কোন প্রস্তাব এদের দ্বারা অগ্রাহ্য হ'লে তাঁর মানসিক বেদনার কথা কখনো কখনো বক্তার কাছে প্রকাশ করতেন—কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত না হ'লেও পরিষদকে কখনো পরিত্যাগ করেননি। বিনা আহ্বানে আবার হাসি মুখে পরিষদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। প্রাচীন এবং নবীন মতবাদের সংঘর্ষে অনেক প্রাচীন, নবীনদের জন্য পথ করে সরে গেছেন। কিন্তু তিনকড়িবাবু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজকে খাপ খাইয়ে পরিষদের কর্মধারাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন। এটাই হ'ল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় বলেন যে তিনকড়িবাবুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। নাগপুরে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে শ্রীকেশবন প্রথম পরিচয় করিয়ে বলেছিলেন "Tincorida is an engineer by professon but a librarian by passion" পরবর্তীকালে এই বক্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করেছে। কাকদ্বীপ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ। তিনি নিরভিমানী ছিলেন, স্মিত হাস্য তাঁর জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। প্রত্যাখ্যান, উপেক্ষা কোন কিছুই তাকে কর্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। গ্রন্থাগারের প্রসার ও বিকাশ তার জীবনের আকাঙ্খা। পরিষদের নিজস্ব ভবন ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সফল করবার দায়িত্ব পরিষদের বর্তমান কর্মীদের। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সাম্প্রতিক ক্ষীণ কলেবর তাঁকে ব্যথিত ক'রত—প্রায়ই তিনি বক্তার কাছে একথার উল্লেখ করতেন। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের দ্বারা তার স্মৃতির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করা হবে। এর জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একটি তহবিল গঠন করতে হবে।

শ্রীমতী বাণী বসু বলেন "তিনকড়িবাবুর অনুপস্থিতিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোন সভার অনুষ্ঠান বোধহয় এই প্রথম। তিনি নিজে কেবলমাত্র কর্মী ছিলেন না—কর্মী গঠনেও তিনি তৎপর ছিলেন। তিনি পরিষদের পিতৃস্থানীয় ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁরই উৎসাহ ও প্রেরণায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কয়েকটি কাজে আত্মনিয়োগ করে বক্তা তাঁর পরিবারের একটি শোকাবহ ঘটনাকে ভুলতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি তাই সকলের অভিভাবকের ন্যায় ছিলেন।"

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে তিনকড়িবাবু কেবলমাত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন নি। রবিবাসর এবং বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। রবিবাসরের তিনি অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন। প্রায় ২২।২৩ বৎসর পূর্বে তাঁর উদ্যোগে বর্ধমানে সাহিত্য সভায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রবিবাসর ও সাহিত্য সম্মেলনের কোন সভায় তাঁকে অনুপস্থিত হতে দেখা যায়নি। তিনকড়িবাবুর সবচেয়ে বড়গুণ হ'ল যে তিনি আত্মপ্রচারের পরাঙ্মুখ ছিলেন তিনি যে রবিবাসরের একজন উৎসাহী কর্মী একথা পরিষদের অনেকেই জানতেন না।

শ্রীবিনয়েন্দ্র দেবরায় মহাশয় বলেন যেন তিনি বাল্যকাল থেকেই তিনকড়ি বাবুর সঙ্গে পরিচিত। তাঁর পিতার সহযোগী হিসাবে তিনকড়ি বাবু বাঁশবেড়িয়ার গ্রন্থাগার সংগঠন, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন এবং পরবর্তীকালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে সমগ্র বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে দেখেছেন। "তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একজন শুভানুধ্যায়ী হারাল আর আমরা যেন আমাদের পরিবারের একজন নিকটতম আত্মীয়কে হারিয়েছি।"

শ্রীমতী প্রমীলা দাতার বলেন যে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে তিনকড়ি বাবুকে তিনি দেখেছেন। পরিষদের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তিনি অপ্রিয় সত্য বলতে পশ্চাদপদ হতেন না। কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে তিনি কঠোর ছিলেন কিন্তু আচার ব্যবহারে তিনি ছিলেন সজ্জন।

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগারের পক্ষ থেকে শ্রীগোপাল চন্দ্র সাধু, জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিতা শিক্ষণ শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষ থেকে শ্রীরাধাকান্ত দত্ত স্বর্গতঃ দত্তর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযাদব মুরলীধর মুলে কলিকাতার বাইরে থাকার জন্য সভায় পাঠ করবার জন্য একটি লিখিত ভাষণ প্রেরণ করেছিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেটি পাঠ করেন। ভাষণটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে মানুষের দেহ নশ্বর কিন্তু তার কীর্তি অবিনশ্বর। মানুষ তার কীর্তির মধ্যে বেঁচে থাকে। তিনকড়িবাবু গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য তাঁর সমগ্র ধ্যান ধারণা নিয়োজিত করেছিলেন, তাই আজ

পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের এত প্রসার। এই জন্যই তাঁর স্মৃতি সকলের মধ্যে জাগরূক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হ'ল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর আরব্ধ কাজ যদি সুসম্পন্ন হয় তবেই তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হবে এবং সকলকে মৃত্যুশোক ভুলতে সাহায্য করবে। তিনকড়িবাবুর পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন—সকলের সমবেত চেষ্টায় যদি এই ভবন নির্মিত হয়, তবেই তাঁর স্মৃতি যথার্থরূপে রক্ষিত হবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

শ্রী বি এস কেশবন :

তাঁর প্রতি আমার গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা আছে। পনর বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্কের ফলে অধিকাংশ ব্যাপারে তাঁর উপদেশকে আমি শ্রদ্ধা করেছি। বরোদার মহারাজা শ্রীসায়াজী রায় গায়কোয়াড়, বাংলার কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, মহারাষ্ট্রের শ্রীকাভের্ এবং মাদ্রাজের শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়ারের সঙ্গে ভারতীয় গ্রন্থাগার জগতের ইতিহাসে তাঁর আসন চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার আন্দোলনে একনিষ্ঠ উৎসাহী তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। এমন নিরভিমান কর্মী বিরল। পরিণত বয়সেও গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁর অনুরাগ এতটুকু ও হ্রাস পায় নাই। তাঁর উদাহরণ নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় :

তোমার চিঠি যে এমন নিদারুণ সংবাদ বহন করে আনবে ভাবিনি। কেবলই মনে হচ্ছে আর দেখা হবে না তিনকড়ি ভায়ার সঙ্গে। বয়সে তো আমার থেকে কনিষ্ঠ, সে চলে গেল। তার কর্মময় জীবনের অনেক কথা আজ মনে পড়ছে। ইদানিং আমি তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য হয়েছি। কিন্তু একদিন তো যোগ ছিল। এই যোগের কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল তিনকড়ি ভায়ার হাতে। আমার এ বাড়ীতে কতবার এসেছেন। সে সব দিনগুলি আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তিনকড়ি ভায়া তো বহকাল বিপত্নীক তাঁর পুত্র কোথায় এখন জানি না। তাকে আমার সান্তনা বাণী কেমন করে পাঠাবো জানি না। আজ তাঁর জন্য শোক করছে বাংলা গ্রন্থ জগতের সঙ্গে যার কোনো সম্বন্ধ আছে। কেবলই মনে হচ্ছে, আর দেখা হবে না।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :

শ্রীতিনকড়ি দত্তের মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে রূঢ় আঘাতের ন্যায় পৌঁছেছে। গ্রন্থাগারের জন্য তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ এবং অধ্যাবসায়ের জন্য তিনি দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তিনি কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন। মুখ্যতঃ তাঁদের জন্যই বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তাঁরাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগঠক। প্রারম্ভিক যুগের যে মৃদু আন্দোলন আমাদের দেশের মাটীতে শিকড় গ্রহণ করেছে এবং তাঁর প্রচেষ্টার ফললাভ হয়েছে তা তিনি যদি দেখে যেতে পারতেন তবে খুব আনন্দের ব্যাপার হ'ত। চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর এই আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর উৎসাহে ভাটা পড়ে নি। যে উদ্দেশ্য তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল তার উন্নতির জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই দেশের গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য নিশ্চয় কিছু করবেন।

শ্রী পি এন কাউলা :

গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি গ্রহণ না করেও যিনি গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সেই তিনকড়ি দত্ত আর আমাদের মধ্যে নেই, এ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু যে নির্দেশ তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন তা অনুসরণ করে কেবলমাত্র বাংলা দেশের জন্য নয় সমস্ত দেশের জন্য গ্রন্থাগার আইন বিধিবন্ধ করবার জন্য সচেষ্ট হব।

শ্রীদত্তর তিরোধানে আর যাঁরা শোক প্রকাশ করে পত্র এবং তারবার্তা প্রেরণ করেছেন :

(১) শ্রী ভাটিয়া, সম্পাদক Indian Librarian. (২) শ্রী এস বসিরউদ্দীন, গ্রন্থাগারিক রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় (৩) শ্রী পি এন গৌর, গ্রন্থাগারিক, সিনহা লাইব্রেরী, পাটনা (৪) শ্রীসতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, প্রতাপ চন্দ্র মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট (৫) শ্রীডি আর কালিয়া, দিল্লী পাব্লিক লাইব্রেরী

ইন্‌সডক্‌ :

ইনসডকের (INSDOC) কর্মীবৃন্দ ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কর্মে নিঃস্বার্থ এবং একনিষ্ঠ কর্মী এবং তাঁর পরিচিতদের প্রিয় বন্ধু শ্রীতিনকড়ি দত্তর তিরোধানে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁর শোকার্ত পরিবারকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে। (শোক সভার প্রস্তাব)

রবিবাসর :

গত ২২শে আষাঢ় রবিবাসরের এক অধিবেশন কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের বাসভবনে আহূত হয়। সর্বাধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনটি রবিবাসরের সম্পাদক তিনকড়ি দত্তের আকস্মিক

পরলোকগমনে শোকসভা হিসাবে পালিত হয়। সভাকক্ষে তিনকড়িবাবুর প্রতিকৃতি মাল্যভূষিত ছিল ধূপধূনায় সভাস্থলে পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছিল।

বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সভার কার্য সুরু করেন কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। তিনি স্বরচিত কবিতায় তিনকড়িবাবুর স্মৃতিতর্পণ করেন। অতঃপর ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে ভারতীয় দর্শনে মৃত্যুর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া তিনকড়িবাবুর চরিত্রমাধুর্য, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং জনসাধারণের সেবায় আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একমিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভায় চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত) অশোককুমার সরকার, কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, কবি কৃষ্ণধন দে। মনোমোহন ঘোষ রবীন্দ্রকাব্য হইতে পাঠ করিয়া শোনান।

সাধারণ পাঠাগার, অশোকগড় ॥ কলিকাতা-৩৫ ॥

গত ২১শে জুলাই '৬৩ রবিবার, সকাল ৮-৩০ টায় সাধারণ পাঠাগারে ৺ তিনকড়ি দত্তের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁহার বিশিষ্টতা পূর্ণ অবদানের কথা আলোচনা করা হয়। এক মিনিট কাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থ সকলে নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন ঃ

"সাধারণ পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির এই সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ৺তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন প্রকৃত গ্রন্থাগার দরদীকে হারাইল। এই সভা ইহাও প্রস্তাব করিতেছে যে এই প্রস্তাবের অনুলিপি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক।"

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী ॥ উত্তরপাড়া ॥

গত বুধবার ১০ই জুলাই সন্ধ্যায় উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীভবনে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ৺তিনকড়ি দত্তের তিরোধান উপলক্ষে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীদত্ত মৃত্যুর স্বল্পকালপূর্বে এই গ্রন্থাগারের উন্নয়ন পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন এবং এই শতাব্দীপ্রাচীন গ্রন্থাগারের সর্বাংগীন উন্নয়নের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ খাঁ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় স্বর্গত দত্তের জীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেন। সভান্তে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীচঞ্চলকুমার সেন :

আলো আছে, জ্ঞান আছে,
আছে বিদ্যা আর—
আছে গ্রন্থাগার।

আছে ছোট, আছে বড়
জ্ঞানের ভাণ্ডার
আছে এক পরিষদও তার।

কর্মী আছে, কর্ম আছে,
আছে কর্ণধার
তবু হায় ব্যথিত সংসার।

বন্ধু তার ছেড়ে গেছে এই মর্তধাম
তিনকড়ি দত্ত যাঁর নাম।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক

UNESCO. *Vocabularam bibliothecarii.* Paris, Unesco, 1963. 627p. $ 5·75 .

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রায় তিন হাজার ইংরেজী শব্দের ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ এবং রাশিয়ান প্রতিশব্দ সহ একটি তালিকা। এখানি পূর্বে প্রকাশিত (১৯৫৩) অনুরূপ গ্রন্থের পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ। এই সংস্করণে শব্দগুলি বর্ণানুক্রমে UDC বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী বিন্যস্ত। গ্রন্থাগারিকতা, প্রকাশনা, ছাপা বাঁধাই, কাগজ ইত্যাদি সম্পর্কিত শব্দগুলি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থাগারিকতার আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কার্যে এই তালিকাটি সাহায্য করবে।

COLVIN (L C). *Cataloging sampler.* Hamden, Connecticut, Shoe String Press (Archon books), 1963. 368p. $ 10·00.

এখানি সূচীকরণ সম্বন্ধে সাধারণ পুস্তক থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা, পুঁথি, Braille পুস্তক, ম্যাপ, মাইক্রোফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতির সূচীকরণের উদাহরণ। পাঠ্যাংশের পরিমাণ খুব কম। উদাহরণস্বরূপে কার্ড ক্যাটালগের ছবি তুলে দেওয়া হয়েছে—সেই হিসাবে এখানিকে ক্যাটালগের এলবাম বলা চলতে পারে।

আমেরিকার সূচীকরণের প্রচলিতপদ্ধতি গুলির প্রতিফলন এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের পদ্ধতি অবশ্য এই গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু উইলসন কার্ড এবং আমেরিকার অন্যান্য গ্রন্থাগারের উদাহরণও এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক সূচীকরণ শিক্ষায় এই গ্রন্থখানি সহায়তা করবে।

RANGANATHAN (S R). *Elements of library classification.* 3rd ed Bombay, Asia, 1962. 168p. Rs 9/-

গ্রন্থাগার বর্গীকরণ সম্বন্ধে সহজপাঠ। গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। ১৯৪৪ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে রঙ্গনাথন প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার উপর ভিত্তি করে প্রথম সংস্করণ খানি ১৯৪৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালে গ্রেটবৃটেনে কয়েকটি গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিদ্যালয়ে রঙ্গনাথন বর্গীকরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। B I Palmer এর সম্পাদনায় Association of Assistant Librarians (U K) এই বক্তৃতাগুলি সংযোজিত করে দ্বিতীয় সংস্করণখানি প্রকাশ করেন। তৃতীয় সংস্করণে তিনটি নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হ'ল ব্যবহারিক বর্গীকরণ সম্বন্ধে। দশমিক (DC), UDC এবং কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে ৬টি বইয়ের বর্গীকরণের সমস্ত ধাপগুলি বিশদ ব্যাখ্যা করে বোঝানো হ'য়েছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীরা এই বইখানিতে উপকৃত হবেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

দেশের জনশিক্ষাকে সম্পূর্ণ ও সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে গ্রন্থাগারগুলোকে নতুন ক'রে গড়তে হবে। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ ও আবশ্যক জ্ঞান আহরণের প্রতিষ্ঠা হিসাবে এদের গুরুত্ব বুঝতে হবে। উৎসাহী পাঠকের চাহিদার কতক অংশ মেটাবার কিংবা অবসর বিনোদনের খোরাক জোগাবার দুর্বল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগারগুলোকে সহ্য ক'রলে চ'লবে না।

এক দশক আগেও গ্রন্থাগারের এই নতুন দায়িত্ব ও ভূমিকার কথা আমরা ভাবিনি। গ্রন্থাগারকে পাড়ার, গাঁয়ের বা প্রতিষ্ঠানের অলংকার হিসাবেই দেখেছি। জীবন যুদ্ধে এ যে হাতিয়ার হয়ে উঠবে এতটা আমরা কেউই আশাও করিনি' এবং তার জন্যে গ্রন্থাগারকে প্রস্তুতও করিনি। কিন্তু আজ ছাত্রদের জন্য বিশেষ ভাবে সংগঠিত ষ্টুডেন্টস্‌ হোম কিংবা ঐ রকম গ্রন্থাগারগুলোকে দেখলে আমরা যুগ পরিবর্তনের নিশ্চিন্ত পরিচয় পাব। দিনরাত কর্মময়, পাঠক-ভর্তি এইসব পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগারগুলো নিশ্চয়ই নবযুগের সন্দেহাতীত পরিচয়।

এই রকম গ্রন্থাগারের বহুব্যবহারই এই রকম গ্রন্থাগার আরও প্রতিষ্ঠা করার দাবী তুলছে। দুঃখের কথা জায়গার অভাবে, টাকার অভাবে, হয়ত বা উপযুক্ত কর্মী ও সংগঠকের অভাবে এই জাতীয় গ্রন্থাগার প্রয়োজনমত গ'ড়ে তোলা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় আমাদের প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে যাতে এই জাতীয় গ্রন্থাগার অনেক গ'ড়ে ওঠে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ক'লকাতা সহরের ছাত্রদের সুবিধা দেখলেই আমাদের দেশের সমস্যা মিটবেনা। এখনও দেশের বেশী লোক গ্রামেই বাস করে! সেখানেও যাতে এ জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রসার হয় আমাদের সেদিকে নজর দেওয়া দরকার।

বলা বাহুল্য গাঁয়ের দিকে বিদ্যার্থীদের একমাত্র মিলন পীঠ হ'চ্ছে বিদ্যালয়। নানা কারণে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ছাত্রদের পৃথক পাঠ-স্থান গড়া অসুবিধার। তাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছাত্রদের উপযুক্ত করে—তাদের সুবিধা মত সময়ে খোলা রাখা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন আমাদের ক'রতেই হবে। জ্ঞান সাধনার তীর্থ হিসাবে গ্রন্থাগারের নতুন জন্ম নেওয়ার যে শুভলক্ষণ আজ দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলো সুষ্ঠু পরিচালনায়ই তার বরণের আল্পনা হতে পারবে।

মাধ্যমিক শিক্ষোত্তর ছাত্রদের জন্যে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্‌ কমিশন নিশ্চয়ই কিছু করবেন। ততদিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলো পুনর্গঠনের দিকেই আমাদের সমধিক দৃষ্টি দেওয়া দরকার। রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক সংস্থাগুলো এবং গ্রন্থগার কর্মীদের এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মান আজ উন্নত হ'তে চ'লেছে। ভাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ক'রে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষায় স্বাবলম্বী ক'রে তুলতে না পারলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি কথার কথা হ'য়ে দাঁড়াবে।

"তিনকড়ি দত্ত মহাশয় আজীবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য চেষ্টা ক'রে গেছেন। এই বিষয়ে নতুন উৎসাহে কাজ করতে পারলে তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখান হবে।"

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৩শ বর্ষ] আশ্বিন : ১৩৭০ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিল

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিযুক্ত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। এই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাবিভাগের সচিব ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেনের সভাপতিত্বে) প্রত্যেক রাজ্যের উপযোগী একটি আদর্শ খসড়া আইন প্রণয়ন করবার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটি কর্তৃক রচিত খসড়া আইনটি কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত হয়ে এখন "আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিল" নামে প্রচারিত হচ্ছে। 'গ্রন্থাগারে'র শ্রাবণ সংখ্যা থেকে গ্রেট বৃটেনের গ্রন্থাগার আইন বিশেষজ্ঞ এ, আর, হিউইট লিখিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবর্তিত এবং বিবেচনার জন্য রচিত গ্রন্থাগার আইনের তুলনামূলক সমালোচনা প্রকাশিত হ'চ্ছে। সেই আলোচনায় এই "আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিল"-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এখানে "আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিলের" প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি উদ্ধৃত হ'ল। এটিকে পুরোপুরি ভাষান্তরিত করা হয়নি।

অনুচ্ছেদ ১ঃ সংক্ষিপ্ত আখ্যা, বিস্তৃতি এবং সূচনা।

অনুচ্ছেদ ২ঃ সংজ্ঞা।

(১) পুস্তক—(ক) যে কোন ভাষায় প্রকাশিত প্রত্যেকটি খণ্ড, খণ্ডের প্রতি অংশ এবং পুস্তিকা।

(খ) পৃথকভাবে মুদ্রিত অথবা লিথোগ্রাফ করা প্রত্যেকটি স্বরলিপি, মানচিত্র, নক্শা।

(গ) সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা এবং অনুরূপ পাঠ্যবস্তু।

(২) পুস্তক পরিবেশন—রেফারেন্স পরিবেশন, সাধারণ গ্রন্থাগারের সদস্যদের বই ধার দেওয়া, জনসাধারণকে বইয়ের খোঁজ খবর দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি সংগ্রহ করতে সাহায্য করা।

(৩) বিভাগীয় গ্রন্থাগার—রাজ্য সরকার পরিচালিত বিভাগীয় গ্রন্থাগার।

(৪) সাধারণ গ্রন্থাগার—রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার যেখানে সদস্যদের কোন চাঁদা অথবা ফি না দিয়ে পাঠ্যবস্তু ব্যবহার করা অথবা ধার নেবার অধিকার থাকবে।

(৫) রেফারেন্স পরিবেশন—গ্রন্থাগার কর্মী কর্তৃক পাঠক অথবা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারিদের।

(৬) আঞ্চলিক ভাষা—রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা অথবা ভাষা সমূহের মধ্যে যে কোন ভাষা।

(৭) রাজ্য—যে রাজ্যে এই আইন প্রবর্তিত হবে।

(৮) বৎসর—আর্থিক বৎসর।

অনুচ্ছেদ ৩ : রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।

(১) রাজ্য সরকার রাজ্যের জন্য পর্যাপ্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্প্রসারণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

(২) উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজন হলে :

(ক) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য রাজ্যে প্রকাশিত পুস্তক, আঞ্চলিক ভাষা অথবা ভাষা সমূহের পুস্তক, রাজ্যের জনসাধারণ অথবা আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধীয় পুস্তক, রাজ্য সরকারের প্রকাশন সমূহ, ইংরেজী অথবা অন্য বৈদেশিক ভাষার প্রতিনিধিমূলক গ্রন্থ সংগ্রহ এবং রাজ্যের সংখ্যালঘু ভাষা-ভাষীদের ব্যবহারের জন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রতিনিধিমূলক গ্রন্থ সংগ্রহ অধিকার করতে পারবেন।

(খ) রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মারফৎ রাজ্যের জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পুস্তক পরিবেশন এবং রেফারেন্স পরিবেশনের বন্দোবস্ত করবেন।

(গ) জনসাধারণের হিতার্থে পুস্তক ব্যবহারের ব্যাপ্তি সাধন করিবেন।

(ঘ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অধিকতর পরিমাণে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য সংস্থা গঠন করবেন।

(ঙ) সমস্ত সরকারী বিভাগ এবং অধীনস্থ বিভাগ সমূহের জন্য পর্যাপ্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করবেন।

(চ) রাজ্যের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক গ্রন্থাগারিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের বন্দোবস্ত করবেন।

(ছ) রাজ্যের গ্রন্থাগারিকদের জন্য চাকুরীর উপযুক্ত শর্ত নির্ধারণ করবেন।

(জ) রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করবেন।

(ঝ) কার্যকরী এবং উপযোগী পাঠ্যবস্তুর প্রকাশ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৪ : গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার সংস্থা :—

রাজ্য সরকার এই দায়িত্ব নিম্নলিখিত সংস্থার মারফৎ পালন করবেন :

(ক) রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ,

(খ) রাজ্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং

(গ) সংযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ।

অনুচ্ছেদ ৫ঃ রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ঃ

(১) রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ (এর পর কেবল 'কর্তৃপক্ষ' বলে উল্লেখিত হবে) নিম্নলিখিতদের নিয়ে গঠিত হবে ঃ

(ক) পদাধিকার বলে ঃ

শিক্ষামন্ত্রী (সভাপতি), শিক্ষাসচিব, শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা। রাজ্য গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের সভাপতিগণ, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সভাপতিগণ, রাজ্য সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের সচিব, রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি, রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারের অধিকর্তা (সম্পাদক)।

(খ) স্পীকার কর্তৃক মনোনীত গ্রন্থাগার উন্নয়নে অনুরাগী রাজ্য বিধানসভার একজন সদস্য।

(গ) 'কর্তৃপক্ষের' সভাপতি মনোনীত গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ অনধিক চারজন বে-সরকারী সদস্য।

(২) 'কর্তৃপক্ষ' রাজ্যের গ্রন্থাগার উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করবেন।

(৩) 'কর্তৃপক্ষ' বৎসরে অন্ততঃ একবার মিলিত হবেন।

(৪) পদাধিকার বলে নিযুক্ত সদস্যগণ ব্যতীত অন্য সমস্ত সদস্যদের কার্যকাল ৪ বৎসর। অন্তবর্তীকালীন শূন্য সদস্যপদ মনোয়ন দ্বারা পূরণ করা হবে। মনোনীত সদস্যের কার্যকাল তিনি যাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তাঁর কার্যকালের অনুরূপ হবে।

(৫) 'কর্তৃপক্ষ' নিজ কর্ম পরিচালনার জন্য এবং আইনের ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে এবং উপসমিতি গঠন করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ ৬ঃ স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি।

(১) 'কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠিত হবার একমাসের মধ্যে সভাপতি সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত ৮ জন সদস্য বিশিষ্ট স্থায়ী কমিটি গঠন করবেন। এর ভিতর শিক্ষাবিভাগের সচিব, রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারের অধিকর্তা এবং রাজ্য গ্রন্থাগারিক, পদাধিকার বলে সদস্য হবেন। যে কোন একটি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতিও অন্যতম সদস্য হবেন।

(২) 'কর্তৃপক্ষের' সভাপতি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটির একজন সদস্যকে কমিটির সভাপতি হিসাবে মনোনীত করবেন। 'কর্তৃপক্ষের' সম্পাদক এই কমিটিরও সম্পাদক হবেন।

(৩) কোন সদস্যের 'কর্তৃপক্ষের' সদস্যপদ খারিজ হলেই সঙ্গে সঙ্গেই স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটির সদস্যপদও খারিজ হবে।

(৪) স্থায়ী উপদেষ্টা পরিষদের কার্য্য হবে ঃ

(ক) রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারকে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও সাংগঠনিক ব্যাপারে কারিগরী উপদেশ দান।

(খ) রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশ সম্পর্কিত ব্যাপারে 'কর্তৃপক্ষের' নিকট সুপারিশ করা।

অনুচ্ছেদ ৮ঃ রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার।

(১) রাজ্য শিক্ষাবিভাগের অধীনে রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার 'কর্তৃপক্ষে'র সহাকরণ হবে।

এই অধিকারের কাজ হবে ঃ

(ক) রাজ্য সরকারের উন্নয়ন বিভাগ ও অনুরূপ বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় রাজ্যের গ্রন্থাগার সমূহের জন্য বাৎসরিক এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(খ) রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার সমূহের কার্যাবলীর বর্ণনামূলক এবং পরিসংখ্যানমূলক বিবরণী প্রস্তুত এবং প্রকাশ করা।

(গ) বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা।

(ঘ) জেলা, ব্লক এবং রাজ্যের অন্যান্য গ্রন্থাগার সমূহের পরিদর্শন ও উপদেশ দানের বন্দোবস্ত করা।

(ঙ) চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগার সমূহকে সহায়ক অনুদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং গ্রন্থাগার সমূহ পরিদর্শনের বন্দোবস্ত করা।

(চ) জেলা গ্রন্থাগার সমূহ এবং জেলার অন্তর্গত গ্রন্থাগার সমূহের কর্মক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণ করা।

(২) রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারের অধিকর্তা (এর পর শুধুমাত্র অধিকর্তা বলে উল্লেখিত হয়েছে) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। পদমর্যাদায় তিনি যুক্ত/সহ শিক্ষা অধিকর্তার সমতুল্য হবেন।

(৩) রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারে পর্যাপ্ত যোগ্যতা ও শিক্ষা সম্পন্ন কর্মী থাকবেন।

(৪) অধিকর্তা নিম্নলিখিত কর্তব্য পালন করবেন।

(ক) তিনি 'কর্তৃপক্ষের' সমস্ত সভা এবং 'কর্তৃপক্ষ' নিযুক্ত সমস্ত কমিটির সভায় যোগ দেবেন।

(খ) রাজ্য সরকার অনুমোদিত 'কর্তৃপক্ষের' সুপারিশগুলি কার্যকরী করবার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

(গ) 'কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মাবলী অনুযায়ী অন্যান্য সমস্ত কর্তব্য পালন করবেন।

(ঘ) রাজ্য সরকার প্রবর্তিত নিয়মাবলী সাপেক্ষ 'কর্তৃপক্ষ' অনুমোদিত প্রত্যেক বৎসরের জন্য গৃহীত কর্মসূচীকে কার্যকরী করবেন; চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলির সহায়ক অনুদান পরিকল্পনা পরিচালনা করবেন; চাঁদা ভিত্তিক কোন গ্রন্থাগারকে রাজ্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন; এবং রাজ্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে

কোথায় জেলা এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করবেন এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের গঠনতন্ত্র এবং উপবিধি অনুমোদন করবেন।

অনুচ্ছেদ ৮ঃ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাংগঠনিক রূপ।

রাজ্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (কেবল মাত্র দ্বিভাষিক রাজ্যে) এবং ব্লক, অঞ্চল/পঞ্চায়েত/পল্লী এবং চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলি সহ জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ ৯ঃ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

রাজ্যের রাজধানীতে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অবস্থিত হবে।

অনুচ্ছেদ ১০ঃ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ।

(১) রাজ্যে প্রকাশিত পুস্তকসমূহ বাধ্যতামূলক ভাবে জমা দেবার জন্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত পুস্তক এবং ক্রয়, বিনিময় এবং দান মারফৎ প্রাপ্ত পুস্তকাদি নিয়ে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ গঠিত হবে।

(২) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহের মধ্যে ফিল্ম, স্লাইড, রেকর্ড, মানচিত্র, চার্ট, ইশতাহার, আলোকচিত্রও থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ১১ঃ পুস্তক সংগ্রহের পন্থা।

(১) রাজ্য বিধান সভার সচিব বিধান সভা এবং বিধান পরিষদের সমস্ত বিতর্ক এবং কার্যবিবরণী সম্বলিত বাধানো বই রাজ্য গ্রন্থাগারিককে দেবেন।

(২) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অপ্রয়োজনীয় পুস্তকাদি যদি রাজ্যগ্রন্থাগারিক কর্তৃক রাজ্য গ্রন্থাগারে স্থান পাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তবে বিভাগের প্রধানগণ এই সমস্ত পুস্তক রাজ্য গ্রন্থাগারিককে দেবেন।

(৩) রাজ্য গ্রন্থাগারিক কেবলমাত্র পুস্তক নির্বাচন কমিটির উপদেশ অনুযায়ী রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ১২ঃ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগঃ—

(১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্ততঃ পক্ষে দুটি বিভাগ থাকবেঃ রাজ্য রেফারেন্স গ্রন্থাগার এবং রাজ্য লেনদেন গ্রন্থাগার।

(২) রাজ্য রেফারেন্স গ্রন্থাগারের কার্যাবলীঃ

(ক) ৩নং অনুচ্ছেদের ২নং উপবিভাগের (ক) ধারায় বর্ণিত প্রতিনিধিমূলক পুস্তক সংগ্রহ রক্ষণাবেক্ষণ।

(খ) সমস্ত পুস্তক এবং কার্যবিবরণী বিশেষতঃ লোকসভা, রাজ্য বিধান সভা, বিধান সভা, পরিষদ এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যবিবরণী সংগ্রহ ও সূচীসহ সহজলভ্য ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ।

(গ) রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থসংগ্রহের ইউনিয়ন ক্যাটালগ রক্ষণাবেক্ষণ করা।

(ঘ) পণ্ডিতব্যক্তি এবং গবেষণা কর্মীদের ব্যবহারের জন্য বিশেষ গ্রন্থপঞ্জী সহ অন্যান্য গ্রন্থপঞ্জী সংকলন এবং আঞ্চলিক ভাষায় কার্যকর সূচী এবং গ্রন্থপঞ্জী সংকলন।

(ঙ) বিভাগীয় এবং গবেষণা গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী এবং উচ্চমানের পঠন-পাঠন এবং গবেষণায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পুস্তক এবং গ্রন্থপঞ্জী সরবরাহ করা।

(চ) শিশুদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও উন্নয়ন করা।

(ছ) গ্রন্থাগার সম্মেলন এবং পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

(জ) জেলাগ্রন্থাগারিক এবং রাজ্যের অন্যান্য গ্রন্থাগারিকদের কারিগরি সাহায্য দান এবং সংবাদ সরবরাহ করা।

(ঝ) পুস্তক আদান-প্রদান কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা—রাজ্যের মধ্যে এবং রাজ্যের বাইরে (ভারতবর্ষের বাইরে নয়) আন্তঃগ্রন্থাগার পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থা করা।

(ঞ) রাজ্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিশেষতঃ সাধারণ গ্রন্থাগারের বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

(৩) রাজ্য রেফারেন্স গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারের বাইরে ব্যবহারের জন্য কোন পুস্তকাদি ধার দিতে পারবে না।

(৪) রাজ্য লেনদেন গ্রন্থাগারের কার্যবলী :

(ক) বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসীদের পুস্তক ধার দেওয়া।

(খ) রাজধানীর সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধান করা।

(গ) সময়ে সময়ে জেলা গ্রন্থাগারকে পুস্তক দিয়ে সাহায্য করা।

(ঘ) সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক এবং জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুস্তক সরবরাহ করা।

(চ) উপযুক্ত কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

(ছ) নিজ পুস্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে প্রচার করা।

(জ) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিবরণী এবং রচনা প্রকাশ করা।

অনুচ্ছেদ ১৩ : রাজ্য গ্রন্থাগারিক :

(১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজ্য গ্রন্থাগারিক নামে অভিহিত হবেন।

(২) রাজ্য সরকার রাজ্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করবেন।

(৩) রাজ্য গ্রন্থাগারিক—

(ক) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সমস্ত বিভাগের পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন,

(খ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমস্ত অনুমোদিত কার্যবলী পরিচালনা করবেন।

(গ) কারিগরি বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিবেন।

(ঘ) অধিকর্তার নিকট পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরের গ্রন্থাগারের কার্য্যবিবরণী পেশ করবেন। এই বিবরণীতে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার খাতে আয় এবং ব্যয়ের একটা বিশদ হিসাব অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৬) বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের আয়োজন, পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান করবেন।

(৪) রাজ্য গ্রন্থাগারিক, অধিকর্তার অধীনস্থ কর্মচারী হবেন।

(৫) রাজ্য গ্রন্থাগারিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কারিগরি এবং সাধারণ কর্মিদের সাহায্য পাবেন।

অনুচ্ছেদ : ১৪ জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা :—

(১) জেলার বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিদের পুস্তক সরবরাহের জন্য একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা নিয়ে জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গঠিত হবে।

(২) জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত পর্যায়ের গ্রন্থাগার নিয়ে গঠিত হবে।

(ক) জেলা গ্রন্থাগার, মিউনিসিপ্যাল/নগর/শহর গ্রন্থাগার, ব্লক গ্রন্থাগার, অঞ্চল/পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার, পল্লী গ্রন্থাগার, ক্ষুদ্রায়তন পুস্তক-পরিবেশন কেন্দ্র।

অনুচ্ছেদ ১৫ : জেলা গ্রন্থাগারের কার্যাবলী :—

(১) জেলা গ্রন্থাগারের কার্য নিম্নরূপ হবে :

(ক) জেলা মধ্যে রেফারেন্স ও গ্রন্থপঞ্জী সরবরাহ।

(খ) গ্রন্থাগারটি অবস্থিত তথাকার পৌর কমিটি। পৌরসভার সদস্যদের জন্য বিশেষ রেফারেন্স পরিবেশন।

(গ) ছাত্রগোষ্ঠী পাঠচক্র এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক গোষ্ঠীদের বিশেষ সাহায্য।

(ঘ) শাখা গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পরিবেশন কেন্দ্র স্থাপন করে শহর এবং পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন ব্লক অন্যান্য গ্রন্থাগারের মারফৎ অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন।

(ঙ) ব্লক গ্রন্থাগারে উপযুক্ত পুস্তক সরবরাহ।

(চ) অধিকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলির সহযোগিতা এবং সাহায্য দান।

(ছ) জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করবার জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং গোষ্ঠীসমূহ বিশেষতঃ সমাজ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের সাথে সহযোগিতা।

(জ) জেলার গ্রন্থাগারিকগণ এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মেলন, শিবির এবং আলোচনা চক্রের আয়োজন করা।

(ঝ) সংক্ষিপ্ত কোর্স মারফৎ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাদান।

অনুচ্ছেদ ১৬ : জেলা গ্রন্থাগার কমিটি :—

(১) রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য 'কর্তৃপক্ষ' প্রণীত নিয়মাবলী অনুযায়ী একটি করে জেলা গ্রন্থাগার কমিটি স্থাপিত হবে।

(২) জেলা গ্রন্থাগার কমিটি জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পাদন করবার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ নিজ নিজ কর্ম পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন।

(৩) জেলা গ্রন্থাগার কমিটির কাজ নিম্নরূপ হবে :

(ক) জেলা গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির কার্যের তত্ত্বাবধান।

(খ) শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন।

(গ) জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন।

(ঘ) কর্তৃপক্ষ প্রণীত নিয়মাবলী অনুযায়ী জেলা গ্রন্থাগারের জন্য কর্মী নিয়োগ।

(ঙ) জেলা গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক, ফিল্ম, রেকর্ড, আসবাবপত্র এবং ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্য গাড়ী ক্রয়ের বন্দোবস্ত করা।

(চ) জমি অথবা অন্যান্য সম্পত্তি সংগ্রহ, ক্রয় অথবা ভাড়া নেওয়া এবং গৃহ নির্মাণ, পরিবর্তন, মেরামত অথবা সম্প্রসারণ করা এবং এই গৃহকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়ে সজ্জিত করা।

(ছ) এই আইনে বিবেচিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দান গ্রহণ।

(জ) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সম্মেলন এবং প্রদর্শনীর সংগঠন অথবা অংশ গ্রহণ: এই সমস্ত সম্মেলন এবং প্রদর্শনীর জন্য সঙ্গত পরিমাণ অর্থব্যয় এবং এই সম্মেলন ও প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ।

(ঝ) জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার গৃহসমূহে বক্তৃতা এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমের জন্য স্থান প্রদান।

(ঞ) জেলা গ্রন্থাগার তহবিল পরিচালনা।

(ট) গ্রন্থাগার উন্মুক্ত রাখবার সময় নির্ধারণ: এই সময় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ন্যূনতম দৈনিক কার্যকাল অপেক্ষা কম হবে না।

(ঠ) নিজ এলাকায় শাখা গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, পরিবেশন কেন্দ্র স্থাপন এবং ডাক মারফৎ গ্রন্থ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিস্তৃতি সাধন।

(৩) কোন বিষয় জেলা গ্রন্থাগার কমিটি অথবা অন্য কোন গ্রন্থাগার কমিটি এক্তিয়ারভুক্ত কিনা এই প্রশ্নে—এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৪) সভাপতির ইচ্ছা অনুযায়ী জেলা গ্রন্থাগার কমিটির সভা আহূত হবে কিন্তু বৎসরে চারবার সভা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৫) জেলা গ্রন্থাগার কমিটি জেলার নামে একটি যৌথ সংস্থা হিসাবে গঠিত হবে। এই কমিটির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, বিক্রয় এবং অন্যের সাথে চুক্তি সম্পাদন করবার ক্ষমতা থাকবে। এই নামে কমিটি অন্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবেন এবং কমিটির বিরুদ্ধে এই নামেই অন্যকে মামলা দায়ের করতে হবে। এই সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা 'কমনসীল' পরবর্তী কমিটির উপর স্থায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তাবে।

অনুচ্ছেদ ১৭ : নগর এবং গ্রন্থাগার কমিটি :—

(১) এক লক্ষের অধিক অধিবাসী সমন্বিত নগরে নগর গ্রন্থাগার কমিটি এবং এক লক্ষের অনধিক অধিবাসী সমন্বিত শহরে শহর গ্রন্থাগার কমিটি থাকবে। এই কমিটি জেলা গ্রন্থাগার কমিটি প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে গঠিত হবে।

(২) নগর এবং শহর কমিটির কার্যাবলী মোটামুটি নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে জেলা গ্রন্থাগার কমিটির অনুরূপ হবে।

(৩) জেলা গ্রন্থাগার কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নগর এবং শহর কমিটি নিজ নিজ কার্য পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৮ : ব্লক লাইব্রেরী কমিটি :—

(১) প্রত্যেকটি ব্লক গ্রন্থাগারের জন্য একটি করিয়া ব্লক গ্রন্থাগার কমিটি গঠিত হবে এই কমিটিব গঠনতন্ত্র এবং কার্যক্রম জেলা গ্রন্থাগার কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

(২) জেলা গ্রন্থাগার কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ব্লক লাইব্রেরী কমিটি নিজ নিজ কার্য পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৯ : অঞ্চল/পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার কমিটি :—

(১) প্রত্যেক অঞ্চল/পঞ্চায়েত গ্রন্থাগারের জন্য একটি করে অঞ্চল/পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটির গঠনতন্ত্র এবং কার্যক্রম জেলা গ্রন্থাগার কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

(২) জেলা গ্রন্থাগার কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার কমিটি নিজ নিজ কার্য পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন।

অনুচ্ছেদ ২০ : সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মিবৃন্দ :—

(১) রাজ্য সরকার রাজ্য শিক্ষা বিভাগেব কর্মিদের অনুরূপ রাজ্য গ্রন্থাগার কর্মিদের পদ সৃষ্টি করবেন এবং এই সমস্ত কর্মিবৃন্দের যোগ্যতা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি নির্ধারণ করবেন।

(২) 'কর্তৃপক্ষ' গঠিত হবার এক বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মিদের চাকুরীর নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে হবে।

(৩) কোন গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির দায়িত্বভার গ্রহণ করবার জন্য জামানত দিতে হবে না। অবহেলা অথবা অসাধুতা প্রামাণিত না হলে হারানো বা ক্ষতিগ্রস্ত পুস্তকের মূল্যও দিতে হবে না।

অনুচ্ছেদ ২১ : সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—অর্থ :—

(১) রাজ্যে তিন রকমের গ্রন্থাগার তহবিল থাকবে—রাজ্যে গ্রন্থাগার তহবিল, জেলা গ্রন্থাগার তহবিল, নগর, শহর অথবা ব্লক গ্রন্থাগার তহবিল।

(২) রাজ্যে গ্রন্থাগার তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা পড়বে।

(ক) রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজ্য সরকার প্রদত্ত অর্থ।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত অর্থ।

(গ) কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার প্রদত্ত অর্থ।

(ঘ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী অনুসারে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ।

(ঙ) রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতির নিমিত্ত প্রাপ্ত দান।

(৩) জেলা গ্রন্থাগার তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা পড়বে :

(ক) রাজ্য গ্রন্থাগার তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ। এই অর্থ ঐ জেলায় গ্রন্থাগার কর হিসাবে আদায়ীকৃত অর্থ থেকে কোনক্রমে কম হবে না।

(খ) কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জেলা গ্রন্থাগার কমিটি কর্তৃক বিশেষ সাহায্য।

(গ) জেলা গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী অনুসারে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ।

(ঘ) জেলার গ্রন্থাগার সমূহের উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত দান।

(ঙ) জেলা গ্রন্থাগার কমিটি কর্তৃক গৃহীত ঋণ।

(৪) নগর, শহর এবং ব্লক গ্রন্থাগার তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা পড়বে :

(ক) নগর, শহর অথবা ব্লকের এলাকার মধ্যে গ্রন্থাগার কর হিসাবে আদায়ীকৃত সমস্ত অর্থ।

(খ) কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জেলা গ্রন্থাগার কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ।

(গ) নগর অথবা শহর গ্রন্থাগার এর নিয়মাবলী অনুযায়ী আদায়ীকৃত অর্থ।

(ঙ) নগর, শহর অথবা ব্লক গ্রন্থাগার সমূহের উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত দান।

(চ) নগর গ্রন্থাগার কমিটি কর্তৃক গৃহীত ঋণ।

অনুচ্ছেদ ২২ : গ্রন্থাগার কর :—

জেলার প্রতিটি স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ এলাকায় সম্পত্তিকরের উপর টাকা প্রতি অন্যূন ৬ নয়া পয়সা (রাজ্য সরকারের সরকারী গেজেট) বিজ্ঞাপিত, এবং নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত কর গ্রন্থাগার কর ধার্য করবেন এবং সম্পত্তি করের সহিত একত্রে অথবা সম্পত্তির কর হিসাবে আদায় করবেন। আদায়ীকৃত অর্থ কিছু বাদ না দিয়ে এলাকা অনুযায়ী নগর, শহর অথবা ব্লক গ্রন্থগার কমিটিকে অর্পণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ২৩ : কমিটির ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতা :—

(১) ব্লক অথবা শহর গ্রন্থাগার কমিটি জেলা গ্রন্থাগার কমিটির অনুমোদনক্রমে গ্রন্থাগার তহবিল জমানত রেখে গ্রন্থাগারের জন্য জমি, গৃহ এবং আসবাব পত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ করতে পারবেন। জেলা কমিটি অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবেন, এই অর্থের পরিমাণ গ্রন্থাগার কর হিসাবে আদায়ীকৃত এক বৎসরে অর্থের পাঁচ গুণের বেশী হতে পারবেন।

(২) অনুরূপ ভাবে 'কর্তৃপক্ষের' অনুমোদনক্রমে জেলা অথবা নগর গ্রন্থাগার কমিটি ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। 'কর্তৃপক্ষ' অনুরূপ ভাবে ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবেন।

অনুচ্ছেদ ২৪ : সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহার :—

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে অধিকর্তা আদর্শ নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন।

অনুচ্ছেদ ২৫ : রাজ্যগ্রন্থাগার পরিষদ—সহযোগী প্রতিষ্ঠান :—

(১) কর্তৃপক্ষ রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদকে স্বীকৃতি দেবেন। এই পরিষদের গঠনতন্ত্র 'কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(২) অধিকর্তা রাজ্যের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে বিশেষতঃ গ্রন্থাগার আইন, গ্রন্থাগারিকদের চাকুরীর শর্ত, গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষা এবং পুস্তক ব্যবসায় সংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে আলোচনা করবেন।

(৩) গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সম্পর্কিত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ অধিকর্তার নিকট মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন, যদি প্রয়োজন মনে হয় অধিকর্তা এই সমস্ত বিষয়ে যথাযথভাবে বিবেচনা করবেন অথবা তিনি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের অনুরোধ ক্রমে বিবেচনার জন্য 'কর্তৃপক্ষের' নিকট উপস্থাপিত করবেন।

(৪) রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদকে যথাযোগ্য অর্থ সাহায্য করবেন।

(ক) রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং এর সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা।

(খ) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত পুস্তকাদি রচনা।

(গ) গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহায়তার জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা।

(চ) গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনা সভা, সম্মেলন এবং প্রদর্শনী আয়োজন।

অনুচ্ছেদ ২৬ : নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা :—

এই আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য বিশেষতঃ 'কর্তৃপক্ষের' সুপারিশ সমূহ কার্যকরী করবার জন্য রাজ্য সরকার নিয়মাবলী প্রণয়ন করে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপিত করবেন।

ভারতের পাব্লিক লাইব্রেরী আইন ঃ
বিধি, খসড়া ও সুপারিশগুলির তুলনামূলক বিচার

এ. আর. হিউইট

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অর্থ—

মাদ্রাজ আইনে সম্পত্তি কর অথবা গৃহ করের উপর টাকা প্রতি ৬ পাই হারে অতিরিক্ত কর গ্রন্থাগার-কর হিসাবে ধার্য করিবার ব্যবস্থা আছে। পূর্বে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিয়া এই হার বর্ধিত করা যাইবে। প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ একটি করিয়া গ্রন্থাগার তহবিল পরিচালনা করিবেন। এই তহবিলে গ্রন্থাগার কর সরকারী অর্থ সাহায্য এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ জমা পড়িবে। আইনের বিধান অনুসারে সরকার এই গ্রন্থাগার তহবিল সমূহে (মাদ্রাজ সহর ব্যতীত) অর্থ দান করিবেন। ইহার পরিমাণ আদায়ীকৃত কর অপেক্ষা কম হইবে না। পরীক্ষার জন্য হিসাবপত্র উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, হিসাব পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং অধিকর্তার নিকট বাৎসরিক সম্ভাব্য হিসাব পেশ করিতে হইবে। আইনের বিধান ব্যতীত গ্রন্থাগার সমূহে যে সরকারী সাহায্যের বন্দোবস্ত আছে, অধিকর্তা তাহার একটি নিবন্ধগ্রন্থ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এককালীন এবং বই বাঁধাই, কর্মীদের বেতন, দপ্তর পরিচালনা ব্যয় বাবদ পৌনঃপুনিক সাহায্য লাভ করবার যোগ্যতা নির্ধারণ করিবেন। সরকার কর্তৃক এই উভয়বিধ সাহায্যের পরিমাণ প্রকৃত ব্যয়ের অনুপাতে স্থিরীকৃত হবে।

হায়দারাবাদ আইনে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিজ নিজ এলাকায় সম্পত্তিকর অথবা গৃহকরের উপর টাকা প্রতি ৬ পাই হারে অতিরিক্ত কর ধার্য করিবার ক্ষমতা ছিল। সরকারের অনুমতি ক্রমে এই করের হার বৃদ্ধি করা যাইত। এই কর হইতে আদায়ীকৃত অর্থ এবং অন্যান্য রাজস্ব স্থানীয় গ্রন্থাগার তহবিলে জমা পড়িত। আইনের বিধান অনুযায়ী সরকার এই তহবিলে অর্থ সাহায্য করিতেন, ইহার পরিমাণ আদায়ীকৃত অর্থ অপেক্ষা কম হইত না। পরীক্ষা জন্য হিসাবপত্র উন্মুক্ত রাখিতে হইত এবং হিসাব পরীক্ষা করাইতে হইত। গ্রন্থাগারসমূহকে আর্থিক সাহায্য দানের নিমিত্ত বিধান এবং এই সমস্ত গ্রন্থাগারের মান সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ণ করবার ক্ষমতা সরকারের থাকিবে।

অন্ধ্র প্রদেশের আইনে প্রত্যেকটি স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি কর অথবা গৃহকরের উপর টাকা প্রতি ৪ নয়া পয়সা হারে অতিরিক্ত কর গ্রন্থাগার কর হিসাবে ধার্য করিবার ক্ষমতা আছে। এই করের হার ৮ নয়া পয়সা পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে। আদায়ীকৃত অর্থ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের হাতে দিতে হইবে এবং তাহা গ্রন্থাগার তহবিলে জমা পড়িবে। সরকার এই তহবিলে অর্থ সাহায্য করিবেন। ইহার পরিমাণ আদায়ীকৃত অর্থ অপেক্ষা কম হইবে না।

মাদ্রাজ আইনের বিধানের অনুরূপ কয়েক ধরণের গ্রন্থাগারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবার ব্যবস্থাও আছে। অধিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত ব্যয়ের অনুপাতে এককালীন এবং পৌনঃপুনিক ব্যয়ের নিমিত্ত গ্রন্থাগার তহবিল হইতে কয়েক ধরণের গ্রন্থাগারকে আর্থিক সাহায্য দান করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের খসড়া আইনের সঙ্গে উপরোক্ত আইন সমূহের পার্থক্য আছে। সরকার এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করিয়া স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সম্পত্তি এবং গৃহকরের উপর অতিরিক্ত কর গ্রন্থাগার কর হিসাবে ধার্য করিবেন। ইহা সরকার নির্ধারিত হারের কম হইবে। রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া প্রত্যেক বৎসর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পূর্ববর্তী বৎসরে আদায়ীকৃত স্থানীয় গ্রন্থাগার করের অন্যূন তিন গুণ অর্থ সাহায্য করিবেন। জমি এবং গৃহ সংগ্রহ, আসবাবপত্র এবং প্রাথমিক গ্রন্থ সংগ্রহ ক্রয়ের এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে অর্থ সাহায্য করিবেন। বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণের জন্য এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষালয়ের জন্য অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত আছে। গ্রন্থাগার কর, সাহায্য এবং অন্যান্য সূত্র হইতে উপার্জিত অর্থ গ্রন্থগার তহবিলে জমা পড়িবে। এই খসড়ায় প্রথম স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আইনের বিধান অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে 'কর্তৃপক্ষ' হিসাব পত্র রক্ষা করিবেন এবং এই হিসাব পত্রকে পরীক্ষা করা হইবে।

সিন্‌হা কমিটির সুপারিশ অনুসারে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকারের এবং সরকারী তহবিল হইতে গ্রন্থাগার কর ও সাহায্যে এই দুই রকম উপায়ের অর্থের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অনুমোদিত করের হার হইল সম্পত্তির করের উপর টাকা প্রতি ৬ নয়া পয়সা। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ক্রমে এই হারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ আদায়ীকৃত অর্থের সমান হইবে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তিনগুণ হইবে বলিয়া সুপারিশ করা হইয়াছে। কয়েকটি গ্রন্থাগার তহবিল সম্বন্ধে সুপারিশ করা হইয়াছে। শহর অঞ্চলে আদায়ীকৃত অর্থদ্বারা পৌর গ্রন্থাগার তহবিল এবং ব্লক অঞ্চলের অর্থ দ্বারা ব্লক গ্রন্থাগার তহবিল গঠিত হইবে। সরকারী সাহায্য কোথায় যাইবে এ সম্বন্ধে খুব পরিষ্কারভাবে সুপারিশ নাই। যেমন রাজ্য সরকার প্রতিটি পৌর এবং ব্লক তহবিলে করের সমপরিমাণ অর্থ দিবেন কিন্তু অন্যত্র বলা হইয়াছে যে কোন একটি জেলার পৌর এবং ব্লক তহবিলে জমা পড়িবে। এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান এবং পঞ্চায়েত কর্তৃক কর ধার্য্য হইবে বলিয়া সুপারিশ করা হইয়াছে। রাজ্য সরকারের সাহায্য হয় নগদ অর্থে অথবা কর্মচারীদের বেতন মারফৎ অথবা উভয় উপায়ে দিবার একটি অদ্ভুত সুপারিশ আছে। যদি বর্তমান চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলি শতকরা ২৫ ভাগ বিনা চাঁদার সদস্য গ্রহণ করে, তবে সরকার তাহাদের আর্থিক সাহায্য দিবেন।

কেরেলায় প্রত্যেক স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গৃহ এবং ভূ-সম্পত্তির কর সংক্রান্ত আইনানুসারে যথাক্রমে শহরাঞ্চলে গৃহকরের উপর এবং পল্লী অঞ্চলে ভূ-সম্পত্তির উপর

অতিরিক্ত কর ধার্য্য করবেন। এই করের হার উক্ত কর সমূহের শতকরা ৫ ভাগ হইবে অথবা গৃহকরের শতকরা ৫ ভাগ এবং ভূসম্পত্তি করের শতকরা ২ ভাগ হইবে। সরকারের অনুমতিক্রমে ঐ কর বৃদ্ধি করা যাইবে। অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আছে স্থানীয় গ্রন্থাগার তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের নিয়মানুসারে হিসাব পত্র রক্ষা করা এবং পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা। গ্রন্থাগার তহবিলে গ্রন্থাগার কর, সাহায্য এবং অন্যান্য উপার্জন জমা পড়িবে, সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সরকারী সাহায্য সম্বন্ধে খসড়ায় কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে। যদি ভূসম্পত্তি করের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়, তবে কর্মচারীর বেতন বাবদ প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে বার্ষিক সাহায্যের পরিমাণ সমান হইব। অথবা সরকার সমস্ত অর্থ রাজ্য গ্রন্থাগারের তহবিলে জমা রাখিয়া তাহা সমস্ত গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় করিবেন। যদি ভূসম্পত্তি করের উপর শতকরা ২ টাকা হারে অতিরিক্ত কর ধার্য্য হয়, তবে পাঠ্যবস্তু এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য আদায়কৃত করের সমপরিমাণ বার্ষিক সাহায্য এবং কর্মচারীদের বেতন বাবদ করের দ্বিগুণ অর্থ দেওয়া হইবে। আর একটি বিকল্প ব্যবস্থার সুপারিশ করা হইয়াছে যে যদি অতিরিক্ত পরিমাণ শতকরা ২ টাকা হয় তবে কর্মচারীদের বেতন বাবদ প্রদেয় সাহায্য রাজ্য গ্রন্থাগার তহবিলে জমা রাখিয়া তাহা সমস্ত স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সমস্ত কর্মচারীদের বেতন ব্যয় করা হইবে। এই সুপারিশগুলি পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত এবং গ্রন্থাগার শিক্ষণের জন্য অর্থ সাহায্যের সুপারিশও করা হইয়াছে।

দিল্লীর খসড়ায় প্রত্যেক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সম্পত্তি করের উপর টাকা প্রতি অন্যূন ৬ নয়া পয়সা হারে গ্রন্থাগার কর ধার্য করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। গ্রন্থাগার কমিটির সহিত চুক্তি সাপেক্ষ এই করের হার বর্ধিত করা চলিবে। সুপারিশে জেলা গ্রন্থাগার তহবিল সৃষ্টি করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই তহবিলে রাজ্য গ্রন্থাগার তহবিল হইতে সাহায্য এবং অন্যান্য উপার্জন জমা হইবে। এই সাহায্যের পরিমাণ জেলায় অন্যান্য উপার্জন সহ আদায়ীকৃত কর অপেক্ষা কম হইবে না। নগর, শহর এবং ব্লক গ্রন্থাগার তহবিল গঠনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই তহবিলে আদায়ীকৃত কর এবং জেলা গ্রন্থাগার কমিটি প্রদত্ত বিশেষ সাহায্য সহ সমস্ত অর্থ জমা পড়িবে। কিন্তু সরকার কর্তৃক প্রদেয় সমপরিমাণ অর্থ সাহায্যের কথা নাই। মনে হয় এই অর্থ জেলা তহবিলেই থাকিবে। জেলা গ্রন্থাগার কমিটির অনুমোদনক্রমে ব্লক এবং নগর গ্রন্থাগারের কমিটি এবং রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে জেলা এবং নগর গ্রন্থাগার কমিটির সীমাবদ্ধভাবে ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা থাকিবে। এই খসড়ায় হিসাব রক্ষা এবং পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মুদ্রণ-শিল্পের ইতিকথা

ধাতুনির্মিত খুচরা টাইপে ছাপার কাজ আরম্ভ হইবার পর অতি দ্রুত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুদ্রণ-শিল্প ছড়াইয়া পড়ে। নবাবিষ্কৃত আমেরিকার মেক্সিকোয় মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে পুস্তকাদিও ছাপা শুরু হয়। শতাব্দীকালের মধ্যে এই শিল্পটির সুদূর প্রসারী সুফলের বিষয়ও বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে। গ্রন্থ মুদ্রণের মধ্যেই ইহা সার্থকতা লাভ করে বটে, তবে ইহাকে ভিত্তি করিয়া আরও বিবিধ শিল্পের আবির্ভাব ঘটে; আর ইহার দ্বারা মনুষ্য সমাজের খুবই উপকার সাধিত হয়। গ্রন্থের মুদ্রণ-পারিপাট্য, রূপসজ্জা, প্রকাশনা, প্রচার, বিক্রয় প্রভৃতি উপলক্ষে করিয়া ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প ও ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়। মুদ্রণ-শিল্প ইহার কোন কোনটির জনক, আবার কোন কোনটির ধাত্রী এইরূপ বলা যাইতে পারে।

মধ্যযুগে ধর্মক্ষেত্রে যেমন পোপ, ভাষা-সাহিত্য ক্ষেত্রে তেমনি ছিল লাটিনের একাধিপত্য। প্রথম দিকের পোপের আনুকূল্যেই মুদ্রা-শিল্পের প্রসার ঘটে, লাটিন ভাষায় লিখিত ধর্ম বিষয়ক পুঁথি এবং পোপের অনুজ্ঞা, আদেশপত্র প্রভৃতিই ছিল ইহার প্রধান উপজীব্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিদগ্ধ সমাজে ও অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট ছাপা বইয়ের প্রথম প্রথম কদর হয় নাই, তথাপি মুদ্রণ-শিল্পিগণ লাটিন ভাষার পুস্তকাদি মুদ্রণ করিতেই বিশেষ তৎপর ছিলেন, কেন না তখন ইহা ধর্ম বিষয়ে আন্তর্জাতিক ভাষা। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ দেখা যায় মুদ্রিত পুস্তকের তিন-চতুর্থাংশই ছিল লাটিন ভাষায়। বাকি এক-চতুর্থাংশ কোন্ ভাষার পুস্তক ? এই কথাই এখন বলিতেছি।

সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় পুঁথিপত্র লিখিত হইত যুগযুগান্ত ধরিয়া। এইসকল গ্রন্থোক্ত বিষয় বা কাহিনী লোকমুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। কিছু কিছু পুঁথি নকল করা হইত কিন্তু তাহাতে এত খরচ পড়িত যে, ইহা ছিল সাধারণের নাগালের বাহিরে। মুদ্রণ-শিল্পের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পিগণ সাধারণের এই আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। একদিকে ছাপা বইয়ের প্রতি পণ্ডিত সমাজের অনাদর, অপর দিকে সাধারণ মানুষের নিজ নিজ ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠের আগ্রহ— এই দুই কারণে শিল্পীরা দেশ-ভাষার গ্রন্থাদি মুদ্রণে বেশি করিয়া ঝুঁকিয়া পড়েন। তাই দেখি মুদ্রণ-শিল্পের আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে পঙ্গে দেশ-ভাষায় পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। মুদ্রণ-শিল্পের আদি ভূমি জার্মানীতে ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে একখানি জার্মান গ্রন্থ সর্ব প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার ৫ বৎসর পরে জার্মান ভাষার বাইবেলের অনুবাদও প্রকাশিত হইতে দেখি। লাটিন ব্যতীত বিভিন্ন দেশ-ভাষায় প্রকাশিত ' বাইবেলের

অনুবাদের মধ্যে এইখানি প্রথম হইবার গৌরব লাভ করে। আরও কোন কোন বিষয়ে জার্মানী প্রথম গৌরব লাভের অধিকারী। যেমন, ১৪৭৭ খ্রীঃ-এ প্রকাশিত ইটালিয়ান-জার্মান দ্বিভাষিক অভিধান, ১৪৭৬-৭৭ সনে লাটিন-জার্মান ঈশপের গল্প, ১৪৯২ সনে লাটিন-জার্মান কেটোর রচনাবলী ইত্যাদি। ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও নিজ নিজ ভাষায় মৌলিক ও অনুবাদ পুস্তক সত্বর প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মুদ্রণ-শিল্প প্রবর্তনের শুরু হতেই স্প্যানিস ও ইংরেজী ভাষায় অধিকাংশ পুস্তক মুদ্রিত হইতে থাকে ঐ ঐ দেশে। যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে লাটিন ভাষায় প্রতিপত্তি, তখনও ইংল্যাণ্ডে দেশভাষা এ্যাংলোস্যাক্সনে (যাহা পরে ইংরেজী নামে পরিচিত হয়) কবিতা, কাহিনী, রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তকাদি রচিত হয়। কাজেই উইলিয়ম কাক্সটন যখন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলেন তখন বহু বইয়ের পাণ্ডুলিপি তাঁহার হস্তগত হইল। এইরূপ একখানি চসারের 'ক্যান্টরব্যারি টেলস্'। তিনি এখানি ১৪৭৭ খ্রীঃ-এ প্রথম মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। ক্যাক্সটন সম্পর্কে পূর্ব প্রবন্ধে কিছু বলিয়াছি বটে, কিন্তু পরে ভাষার গড়ন প্রসঙ্গে আরও কিছু বিশেষভাবে বলিতে হইবে।

ইউরোপ রেনেসাঁ ও রিফরমেশনের ভাব-বন্যাকে মানুষের হৃদ্গত করিয়া তুলিতে মুদ্রণ-শিল্প যেমন সহায়তা করে এমনটি আর কিছুর দ্বারা সম্ভব হয় নাই। মার্টিন লুথার (১৪৮৩—১৫৪৬) 'রিফর্মেশান'-এর প্রবর্তক। তিনি পোপের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া বিদগ্ধ সমাজের জন্য লাটিন ভাষার আশ্রয় লইলেন—কারণ ইহা তখন আন্তর্জাতিক ভাষাও বটে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তাঁহার আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য সুফল সম্বন্ধে বুঝাইতে গিয়া তাহাদেরই ভাষায় (যেমন, জার্মানীতে জার্মান, ফ্রান্সে ফরাসী, ইংল্যাণ্ডে ইংরেজী প্রভৃতি) পুস্তক পুস্তিকা প্রচার করিতে শুরু করিয়া দেন। এ হেতু দেখা যায় ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে জার্মান পুস্তক প্রকাশিত হয় ৪০ খানি, মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে তাহা দাঁড়ায় ৪৯৮ খানিতে। ইহার মধ্যে ১৮৩ খানিই লুথারেরে লেখা, ২১৫ খানি তাঁহার অনুবর্তীদের এবং মাত্র ২০ খানি তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের রচনা। খ্রীষ্টতত্ত্ব ছাড়া অন্যান্য বই ছিল ৮০ খানি। এই পরিসংখ্যান দৃষ্টে বুঝা যাইবে লুথারের ধর্মান্দোলন জার্মান ভাষা সাহিত্যের মূল্যে কতখানি রসদ যোগাইয়াছে। অপরাপর দেশভাষাগুলিও ইহার দ্বারা কম প্রভাবিত ও উপকৃত হয় নাই।

মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে বাইবেলের কতকগুলি প্রধান প্রধান দেশভাষার অনুবাদ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সাধারণ মানুষের নিকট সহজলভ্য হয়। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হইতে না হইতেই জার্মান ভাষায় বাইবেলের প্রায় কুড়িটি অনুবাদ মুদ্রাঙ্কিত হয়। ইহার পর প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে সব ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হইল তাহা এই: ওলন্দাজ (১৫২৩-২৫); ইংরেজী (১৫২৪-৩৫); ডেনিস (১৫২৪-৫০); সুইডিস (১৫২৬ ও ১৫৪০-৪১); ফরাসী (১৫৩৫); হাঙ্গেরিয়ান (১৩৪১);

স্প্যানিস ও ক্রোটিয়ান (১৫৪৩); ফিনিশ (১৫৪৮-৫২)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে লুথার কর্তৃক জার্মান ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ মুদ্রাঙ্কিত হয় ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কন শেষ করেন ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দী শেষ হইতে না হইতে পোলাণ্ড, স্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলিতেও নিজ নিজ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহার ফলে ঐ ঐ দেশে ভাষার নির্দিষ্ট মান নিরূপিত হয় এবং তাহার আদর্শেই ভাষার গড়ন ও পুষ্টিসাধন হইতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্মান ভাষার কথা এখানে উল্লেখ করি। উচ্চ ও নিম্ন জার্মানীর আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য ছিল খুবই বেশী। প্রথম দিক্‌কার বাইবেলের অনুবাদে আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু লুথারকৃত বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশের পর হইতেই জার্মান ভাষার একীকরণ ও সমীকরণের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট মান অনুসৃত হইতে থাকে। এতাবৎ কাল জার্মানীর আওতায় থাকার দরুন মধ্যে ইউরোপের বাল্টিক তীরবর্তী ও বল্কান রাষ্ট্রগুলির নিজ নিজ ভাষা স্বীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে নাই। বাইবেলের অনুবাদ ঐ সব অঞ্চলের ভাষাগুলিকে একটি স্বতন্ত্র রূপ দিতে সমর্থ হয় এবং ইহার ভিত্তিতেই প্রত্যেকটি ভাষা আপন সত্তা বজায় রাখিয়া উন্নত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে প্রত্যেক ভাষাভাষিদের মধ্যে ঐক্যবোধ উন্মেষ লাভ করে। আর প্রধানতঃ ইহার ফলেই দেখি পরবর্তী কালে এক একটি স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। এই সকলের মূলে কিন্তু আমরা মুদ্রণ-শিল্পের মঙ্গল হস্তই বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

আঞ্চলিক ভাষাগুলির উর্ধ্বে থাকিয়া একটি জাতীয় ভাষার কিরূপে গোড়াপত্তন হয় এবং ক্রমে ইহা পরিপুষ্টি লাভ করে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইংরাজী ভাষা। ইংল্যাণ্ডে মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তক উইলিয়ম ক্যাক্সটন যে বহুভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা আমরা পূর্বে অবগত হইয়াছি। তিনি লণ্ডনে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিবিধ ধরণের পুস্তক অনুবাদে এবং মূলে এখান হইতে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ভাষা হইতে নানা ধরণের বই তিনি নিজে অনুবাদ করিয়াছিলেন,—ইহার সংখ্যাও বিস্তর। ক্যাক্সটন কোন্ ভাষায় লিখিতেন? লণ্ডন ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যাহাকে আমরা 'মিড ইংলণ্ড' বলি সেই অঞ্চলের ভাষাকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনুবর্তীরা এই রীতি মানিয়া লন। উইনকিন নামক তাঁহার জনৈক অনুবর্তী একখানি পুঁথি ছাপিবার কালে ইহাতে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ এবং উচ্চারণ-মাফিক বানান পরিহার করিয়া সুপ্রচলিত শব্দ ও বানান প্রবর্তন দ্বারা ইহার সংস্কার করিয়া লন। অপ্রচলিত আঞ্চলিক শব্দের বদলে বহুল-প্রচলিত এবং অধিকাংশ গ্রাহ্য শব্দগুলিও মুদ্রণ-শিল্পীরা এই পুঁথি মুদ্রণকালে গ্রহণ করেন। যেমন—wend-এর বদলে 'go', twey-এর স্থলে 'too,' pridde-এর পরিবর্তে 'third' ইত্যাদি। অপ্রচলিত শব্দ বর্জন, প্রচলিত শব্দ গ্রহণ, নূতন শব্দ সংযোজন, বানান সমীকরণ প্রভৃতি সহজে মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন করার জন্য অবলম্বিত হয় বটে কিন্তু ইহার দ্বারা এক একটি ভাষা দ্রুত জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করিতে যে সমর্থ হইয়াছে

তাহা ভাষাতাত্ত্বিক মাত্রেই অবগত আছেন। তাই জাতীয় ভাষার গোড়াপত্তনে এবং সাহিত্যের উন্নতিসাধনে মুদ্রণশিল্পের কৃতিত্ব অনন্যতুল্য। মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাস আলোচনাকালে এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। কারণ ইহাও মুদ্রণ শিল্পের একটি বড় দান। যদি সে যুগে ছাপার কার্য আরম্ভ না হইত এবং বহুলপ্রসার লাভ না করিত তাহা হইলে কত ভাষা যে মরিয়া যাইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রথমে লাটিনের আধিপত্য সত্ত্বেও ইউরোপের দেশভাষাগুলি মুক্তি লাভ করে মুদ্রণ-শিল্পের বহুল এবং দ্রুত প্রসার হেতু। সেইরূপ বলা যায় জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট দেশ ও জাতিগুলিও প্রথমে জার্মান ভাষার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় ইহারই দরুণ। আবার দেখুন বইপুঁথি ছাপা হইয়াছিল বলিয়াই উইলিয়ম ক্যাক্সটন এবং তাহার অনুবর্তী প্রভাবশালী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের ইংরেজী ভাষার স্পষ্ট রূপ দান এবং বানানাদি সমীকরণ সত্ত্বেও ওয়েলস্ ভাষা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে মুদ্রণযন্ত্রেরই সহায়তায়। এই ভাষায় প্রথমে প্রার্থনা পুস্তক লণ্ডনেই ছাপা হয় ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে। ওয়েলস ভাষার বাইবেলের অনুবাদ বাহির হইল ১৫৮৮ সনে। এইরূপে স্পেনের অন্তর্গত বাস্ক ও ক্যাটালান ভাষা দুইটিও মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। অপর পক্ষে কেল্টিস্ ভাষায় হস্তলিখিত বইপুঁথি থাকা সত্ত্বেও মুদ্রণের অভাবে উহা সমেত ভাষাটিও লোপ পাইয়াছে। এইরূপ আরও কত ভাষার যে অবলুপ্তি ঘটিয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। আয়ারল্যাণ্ডের কথাও এখন একটু বলি। রাণী এলিজাবেথ সেখানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করাইলেন স্থানীয় ভাষায় খ্রীষ্টীয় প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া আইরিশ জাতি সত্বর স্বীয় গেলিক ভাষায় সাহিত্যের উন্নতিকল্পেই মুদ্রণশিল্পকে পুরাপুরি কাজে লাগাইয়াছেন। ধর্মে কিন্তু তাঁহারা রোমান ক্যাথলিকই থাকিয়া যান।

এখন মুদ্রণ-শিল্পে আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশের কথা কিছু বলা যাক। ইহার আবির্ভাবকাল হইতে বহু বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক মুদ্রণ-শিল্পীকেই একহাতে প্রায় সব কাজই করিতে হইত। যেমন—আদর্শলিপি দৃষ্টে অক্ষরের ডিজাইন তৈরী, ছাঁচ নির্মাণ, টাপাই ঢালাই, পুঁথি সম্পাদন ও সংশোধনান্তে কম্পোজ করা, প্রুফ পরীক্ষণ, ছাপার উপযুক্ত কালি প্রস্তুত করা, পাতার পর পাতা মুদ্রণ, গ্রন্থনের পরে প্রচার ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা। গোড়া হইতে কিন্তু কাগজ তৈরী এবং গ্রন্থন বা বই বাঁধাই অবশ্য অপরের হাতেই ছিল। প্রথম শিল্পীরা মুখ্যতঃ জীবিকার তাগিদেই এই রকম কঠোর শ্রমসাধ্য কার্যে লিপ্ত হইতেন। এতাদৃশ কঠোর পরিশ্রম হেতু গুয়েটেনবার্গ তো শেষ পর্যন্ত অন্ধই হইয়া যান। ছাপা বইয়ের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকায় শিল্পীর যে পরে দু'পয়সা না আসিতেছিল এমন নয়। মুদ্রণ-শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা দেখিয়া বিদ্বান এবং বিদ্যোৎসাহী বিত্তশালী ব্যক্তিরা এই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তাঁহারা এই শিল্পে অর্থ নিয়োগ করিতে থাকায় ইহার উৎকর্ষ এবং পূর্ণ বিকাশের পথও সূচিত হইল ঐ যুগে। ক্রমশঃ মুদ্রণ-শিল্পকে ভিত্তি করিয়া পৃথক পৃথক শিল্প ও ব্যবসায় গড়িয়া

উঠিল। ছাঁচ তৈরী ও টাইপ ঢালাই, পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার প্রভৃতি নানা বিষয়ে পৃথক পৃথক ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিলেন। এমন দিন আসিবার সম্ভাবনা হইল যখন মুদ্রণ-শিল্পীকে শুধু ছাপার কাজেই নিবদ্ধ থাকিতে হয়। ছাপিবার উপযুক্ত বই মনোনয়ন, সংশোধন ও সম্পাদন, প্রুফ পরীক্ষণ, প্রকাশ ও বিক্রয়—এ ধরণের সমুদয় ব্যবস্থাই নবসৃষ্ট প্রকাশকের হাতে গিয়া পড়ে। এই সকল ব্যাপার ঘটিতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু মুদ্রণ-শিল্পারম্ভের শতবর্ষের মধ্যেই এই সমুদয় দিকের সূচনা লক্ষ্য করি। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা গেল এমন ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে যিনি শত শত পুস্তক অপরের ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ ও বিক্রয়ে লিপ্ত হইতেছেন। প্রচারের সুবিধা হেতু প্রকাশকেরা ক্যানভাসার বা ভ্রাম্যমাণ প্রচারক নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করেন।

গ্রন্থের নব রূপায়ণ ও রূপসজ্জার দিকে মুদ্রণশিল্পীরা ক্রমে নজর দিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে পুঁথির আকারে ও আদর্শে বইপত্র মুদ্রাঙ্কিত হইত। পুঁথিতে আখ্যাপত্র ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা থাকিত না। ছাপা বইয়ে এ-সবেরও তখন বালাই ছিল না। পুঁথির শেষে 'কলোফোন' বা পরিচয়পত্র থাকিত। ছাপা বইয়ের শেষেও এইরূপ পরিচয়পত্র দেওয়া হইতে লাগিল। পরিচয়পত্রে বইয়ের বিষয়বস্তু, রচনাকাল, মুদ্রণ-শিল্পী, মুদ্রণ-স্থান এবং কচিৎ গ্রন্থকারের নাম থাকিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই কলোফোন বইয়ের অংশ নহে, অপরকে দিয়া লিখাইয়া সংযোজন করা হইত। কখন কখন দেখা যাইত লিপিকার ইহাতে নিজের নামটি ঢুকাইয়া দিয়াছেন! গ্রন্থকারের নামের কিন্তু খোঁজখবর নাই। কলোফোনের শেষ দিকে দেখি লোকের আকর্ষণ বাড়াইবার জন্য বর্ম-পরিহিত অসিধারী বীর পুরুষ, নানারকমের ফুল ও পক্ষীর চিত্র জুড়িয়া দেওয়া হইত। এই ধরণের চিত্র হইতে গ্রাফিক আর্ট বা চিত্রাঙ্কন খোদাই চারুকলার উৎপত্তি হয়। ইহাও পরবর্তী কালে একটি বিশেষ শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

এই কলোফোন বা পরিচয়পত্র হইতে কিরূপে আধুনিক কালে আখ্যাপত্র, ভূমিকা, সম্পাদক বা প্রকাশকের নিবেদন, পৃষ্ঠাসংখ্যা সংযোজন প্রভৃতি বিকাশলাভ করিল—সে এক বিচিত্র কাহিনী। ছাপা বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এ-ধরণের সংস্কার সাধিত হইতে থাকে। পৃষ্ঠসংখ্যার কথাই ধরুন, পাতার পর পাতা ঠিক আছে কিনা তাহা বুঝা দরকার এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রতিটি পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তির নিম্নে পর পৃষ্ঠার প্রথম শব্দটি আলাদা করিয়া ছাপা হইত। ইহা হইতেই বইয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়ার রীতি ক্রমে চালু হয়। আখ্যাপত্রের ক্রমিক স্তরে দেখি, প্রথমে এই পাতাটি কাঠ-খোদাই ব্লকে ছাপা হইত। গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম, পুস্তকের বিষয়বস্তু সংকেত স্বরূপ পনর-বিশ লাইন লেখা, কলোফোনের শেষে প্রদত্ত চিত্রাদির অনুরূপ চিত্র নিম্নে সংযোজন প্রভৃতি থাকিত। ইহারও সংস্কার হইতে হইতে ইহা ক্রমান্বয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করে। আমরা আজকাল দেখি বইয়ের আখ্যাপত্রে গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নামই শুধু থাকে, মুদ্রকের নাম পরপৃষ্ঠার শেষে 'প্রিনটারস্‌ লাইন'-এ ছোট অক্ষরে জুড়িয়া দেওয়া হয়। পাঠক এখন আর ইহার

দিকে তাকাইয়াও দেখেন না। আদি যুগের মুদ্রণ-শিল্পের সমস্ত দায়দায়িত্ব প্রকাশকই আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন।

বিদ্বান এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা এই শিল্পটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পুস্তক প্রকাশে উদ্‌যোগী হন বলিয়াছি। বহুজনে একটি শিল্পে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে স্বভাবতই প্রতিযোগিতা বাড়ে এবং শিল্প ব্যবসায়েরও উন্নতি হয়। মুদ্রণশিল্পের বেলায়ও এই রীতির ব্যত্যয় হয় নাই। এই শিল্পটির প্রাণ গ্রন্থে। কাজেই গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির দিকে শিল্প-ব্যবসায়ীরা অতি দ্রুত অবহিত হইলেন। বইয়ের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা যায় কিরূপে? এখনও দেখা যায় কোন কোন বইয়ের কত ভ্রম-প্রমাদ। ঐ যুগেই বইয়ে ভ্রম-প্রমাদ যাহাতে না থাকে সে দিকে শিল্পীদের নজর পড়ে। জার্মান শিল্পিগণ জার্মানীতে বা অন্যত্র যখনই যেখানে গিয়াছেন সম্ভব হইলে প্রুফ সংশোধকও সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন; অথবা স্থানীয় লোকদের মধ্য হইতে এইরূপ সংশোধক সংগ্রহ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমেই দেখি এই প্রুফ পরীক্ষকের কদর বাড়িতেছে। প্রকাশকেরা নিজ নিজ বই নির্ভুল ছাপিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নপর একজন বইয়ের বিজ্ঞাপনে এরূপ লেখেন যে, ভ্রমপ্রমাদ-পূর্ণ বই জঞ্জাল; কেহ যেন গৃহে স্থান না দেন! শত চেষ্টা সত্ত্বেও বইয়ে যে কিছু না কিছু ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বলিতে পারি। ঐ যুগেই দেখি এই সকল ভ্রমপ্রমাদের একটি সংশোধনী তালিকা পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে; এবং পাঠকবর্গকে অনুরোধ করা হইয়াছে তাঁহারা যেন যথানির্দিষ্ট স্থানে সংশোধন করিয়া লন। এই বইখানি ইরাসমাসের বিখ্যাত সলিসিটিড গ্রন্থ। ১৮০টি ভ্রমের উল্লেখ ২৬ পৃষ্ঠার একটি ফর্দে দেওয়া হয়।

গ্রন্থের রূপসজ্জার একটি প্রধান অঙ্গ—ইহাকে চিত্রিত করণ। গুয়েটেনবার্গের পূর্বেই চিত্রপুস্তকের আবির্ভাব হয়। চিত্রের নেগেটিভ কাঠ-খোদাই ব্লকে তুলিয়া তাহা হইতে ছবি ছাপা হইত। প্রত্যেকখানি ছবির নীচে কোন কোন আপ্তবাক্য বা সাধুসন্তের উক্তিও কাঠ-খোদাই হরপে সংযোজিত হইত। এইরূপ এক-একখানি পৃথকভাবে মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে গ্রথিত হয়। ইহাকে এমব্লেম বুক বা চিত্রপুস্তকও যে বলা হইত তাহা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। এইরূপ একখানি চিত্রপুস্তকের নিম্নে লিখিত লাটিন আপ্তবাক্যগুলি জার্মান, ইটালিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিস প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়া ঐ ঐ ভাষাভাষীদের মধ্যে ভূরি ভূরি প্রচারিত হয় এবং ইহা খুবই জনাদরলাভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে নবাবিষ্কৃত ধাতুর টাইপে ছাপা বইকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য এইরূপ ছবি সংযোজিত হইতে দেখি। তাহাতে অবশ্য আপ্তবাক্যাদি দেওয়া থাকিত না।

জার্মানীর অসবার্গ ও ন্যুর্নবার্গ শহরের মুদ্রণশিল্পে ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে মুদ্রণ শিল্পের একটি প্রধান অনুসঙ্গরূপে কাঠ-খোদাই ও পরে ধাতু খোদাই শিল্প—

যাহাকে আমরা সংক্ষেপে তক্ষণ শিল্প বলিতে পারি, গড়িয়া উঠে। পঞ্চদশ শতকের পূর্বেই দেখি অস্‌বার্গে মুদ্রিত একখানি বই আঠার শতের উপর চিত্রদ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছে। এইরূপ চিত্রিত অথবা চিত্রসংযুক্ত আরও অনেক বইয়ের উল্লেখ পূর্ব প্রবন্ধে করা হইয়াছে। এই আঠার শত চিত্র কিন্তু ঐ সংখ্যক ব্লক হইতে ছাপা হয় নাই। ব্লকের সংখ্যা ছিল মোট ৬৪৫ খানি। মাত্র ৭২খানি কাঠ-খোদাই ব্লক হইতে ৫৯৬ জন পৃথক পৃথক সময়ের রাজরাজরা, পোপ প্রভৃতির ছবি বিভিন্ন নামে মুদ্রিত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ১৫০০ খ্রীঃ নাগাদ মুদ্রিত বইয়ের এক-তৃতীয়াংশই চিত্রদ্বারা সুশোভিত করা হইত। সচিত্র গ্রন্থের জনপ্রিয়তা যে দ্রুত বাড়িয়া যায় ইহা তাহার একটি নিদর্শন। আরও দেখা যায় কোন কোন অত্যুৎসাহী প্রকাশক বিষয়বস্তু বহির্ভূত চিত্রাদিও পুস্তকে জুড়িয়া দিতেছেন!

পুস্তকে প্রথম ধাতু-খোদাই ব্লক হইতে ছাপা ছবি প্রদত্ত হয় ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ইহার প্রচলন হইতে বেশ খানিকটা সময় লাগিয়া যায়। ইটালির শিল্পিগণ পুস্তকের এইপ্রকার রূপসজ্জায় বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। আমরা দেখিতেছি ১৫৪৮-৬৮ এই সময়ের মধ্যে সেখানে ধাতু-খোদাই ব্লক হইতে ছবি ছাপার কাজ বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়। এই সময়ে রোম নগরীতে একখানা পুস্তকে একশত বত্রিশখানি ধাতু-খোদাই ব্লক হইতে ছাপা প্রাচীন রোমের মনুমেণ্টগুলির চিত্র সংযোজিত করা হয়। স্থায়িত্ব ও উৎকর্ষ বিবেচনায় ধাতু-খোদাই ব্লকই কাঠ-খোদাই ব্লকের স্থান ক্রমে পুরাপুরি গ্রহণ করে। তক্ষণ শিল্পের ইতিহাসে প্রথম যুগের কাঠ-খোদাই ব্লক হইতে ধাতু-খোদাই ব্লকের বিবর্তনের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখ করিবার মত—সুদূর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা শহরে ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনিস ও স্থানীয় টেগালন এই দুইটি ভাষায় একখানি চিত্র সংযুক্ত পুস্তক প্রথম মুদ্রিত হয়। একজন ডোমিনিকান মিশনারি টাইপের নকশা অঙ্কন করিয়া দেন। ইহার পর এই আদর্শে চীনা কারিগরদের দ্বারা টাইপ প্রস্তুত করাইয়া লওয়া হয়। গুয়েটনবার্গ কর্তৃক নবাবিষ্কৃত মুদ্রণ-শিল্পের দেড়শত বৎসর পরে এই প্রথম প্রাচ্যের একটি দেশে খুচরা ধাতুর টাইপে গ্রন্থ ছাপা হইতে দেখি। এই খানেই আধুনিক মুদ্রণশিল্পে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রথম মিলন সাধিত হইল।

গ্রন্থের রূপসজ্জার দিকে নজর রাখলেই তো শুধু চলিবে না ইহা তো বাজারে প্রচুর পরিমাণে বিকাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদেই নানা উপায় অবলম্বিত হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ পত্রী, প্রাচীরপত্র, পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বলিত পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রিকা, যাহাকে আমরা আধুনিক কালে 'প্রসপেকটাস্' আখ্যা দিয়া থাকি এ-সমুদয়ের চলন হয়। গীর্জা, সরাইখানা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের প্রকাশ্য স্থলে এগুলি লটকাইয়া দেওয়া হইত। ইটালি ও জার্মানীর শিল্পী-প্রকাশকদের এইরূপ প্রচারপত্রের নমুনা কিছু কিছু এখনও পাওয়া যায়। দেখা যাইতেছে কোন কোন পত্রীতে প্রকাশিত পুস্তক, যন্ত্রস্থ পুস্তক,

প্রকাশের অপেক্ষায় সম্পাদিত পুস্তক প্রভৃতির নাম দেওয়া হইয়াছে। আবার কোন কোন পত্রীতে মুদ্রিত পুস্তকের সংস্করণ, সংখ্যা, মূল্য প্রভৃতি দিতেও শিল্পী ভুলেন নাই। এই মাত্র যে 'প্রসপেকটাসে'র কথা উল্লেখ করিলাম তাহার প্রবর্তক যতদূর জানা যায় ইংল্যাণ্ডের উইলিয়ম ক্যাক্সটন। সাহিত্যের আদর্শের উল্লেখপূর্বক গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আনুসঙ্গিক পরিচয়াদি সহ ইহাতে তিনি প্রদান করিতেন। বর্তমান যুগের ইংরেজ প্রকাশকগণ বিজ্ঞাপনের এই পদ্ধতি নানাভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের দেশে সিগনেট প্রেসের বিজ্ঞাপন পত্রীতে এই রীতি কয়েক বৎসর পূর্বে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইয়াছিল। ক্যাক্সটন যে সব পত্রী বা প্রচারপত্র বাহির করিতেন তাহার উপরে কখন কখন লিখিয়া দিতেন 'Don't tear it off.'—ইহা ছিড়িয়া ফেলিও না। প্রচারের নানা উপায় অবলম্বনের ফলে পুস্তকের বিক্রয়ও বাড়িয়া যায়। পূর্বে দুইশত কি আড়াইশত বই মাত্র এক একটি সংস্করণে ছাপা হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পণ্ডিত ব্যবসায়ী অ্যালডাস ম্যানুটিয়াস এক একটি সংস্করণে হাজার বই ছাপিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে বই সস্তা দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয় এবং সাধারণ লোকে বেশী করিয়া বই কিনিতে আরম্ভ করে। পাঠ্য বই, পোপের আদেশপত্র, রাজকীয় অনুজ্ঞা প্রভৃতি বিস্তর ছাপা হইত বটে, কিন্তু তাহার কাটতি দেখিয়া বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থের প্রচার বাহুল্য আঁচ করা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পদে সুপণ্ডিত ইরাসমাস লিখিত গ্রন্থসমূহের বিক্রয় আশাতিরিক্ত বাড়িয়া যায়। ইহার পরে উল্লেখযোগ্য বাইবেলের অনুবাদগ্রন্থ। লুথারকৃত বাইবেলের অনুবাদ এতই জনপ্রিয় হয় যে জার্মানীতে ইহার প্রচার অপর সকলকে ছাড়াইয়া যায়। তাঁহার জীবিত-কালেই বাইবেলের সমগ্র ও আংশিক সংস্করণ বাহির হয় ৪৩০টি। ইটালীয় ভাষায় প্রকাশিত একখানি রোমান্টিক কাব্য এতই সমাদার লাভ করিল যে, প্রথম প্রকাশের (১৫৩২) দশ বৎসরের মধ্যে ইহার ৩৬টি সংস্করণ বাহির হইল। মুদ্রণশিল্পের উৎকর্ষ লাভের ফলে অল্পকালের মধ্যে জনসাধারণের নিকট সুলভে বিবিধ বিদ্যার পুস্তক পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়। গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া মুদ্রণশিল্পের বিকাশ। মুদ্রণশিল্পের দৌলতে আরও বহু প্রধান শিল্প-ব্যবসায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। একশত বৎসরের মধ্যেই তাহার সূচনা পরিলক্ষিত হয়। *

---

* প্রবন্ধ রচনা Five hundred years of Printing (S. H. Steinberg) গ্রন্থ হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

এই প্রবন্ধটি 'শ্রীসরস্বতী' প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা হইতে পুনঃ মুদ্রিত হইল।

গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য পুস্তক

International Conference on Cataloguing Principles, paris, 9th—18th October, 1961. **Report**, ed, by A. H. Chaplin and Dorothy Anderson. Viii, 293 P. (Organizing committee, I. C. C. P., C/o National Central Library, Malet Place, London, W. C. I) 63s.

১৯৬১ অনুষ্ঠিত সূচীকরণ নীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল। এই সম্মেলন বিশ্বের সমস্ত গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল, এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অবহিত হ'বার জন্য সকলেই ব্যগ্র হয়েছিলেন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই সম্মেলনের বিষয়ে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠেই সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই পুস্তকে সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধগুলি আলোচনার সারাংশ এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তাবাবলী এবং সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী গ্রন্থাগারিকদের পূর্ণ তালিকাও এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে এই সম্মেলনে জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত, এবং বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডাঃ সি, পি, শুক্ল যোগ দিয়েছিলেন। ডাঃ রঙ্গনাথন বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ভবিষ্যৎ একটি সংখ্যায় এই সম্মেলনে নীতি সম্পর্কিত গৃহীত বক্তব্যের পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হবে।

Corbett (E. V). An introduction to Public Librarianship. London, James Clarke, 1963. 398 p. 45s.

Corbett রচিত **An introduction to Public librarianship** ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের ছাত্রদের অতিপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। বর্তমান পুস্তকখানিতে সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে আলোচ্য বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি—সমস্ত গ্রন্থাগারের উপযোগী করে রচিত হয়েছে। পুস্তকখানি গ্রন্থাগার সংগঠন এবং পরিচালনা, বর্গীকরণ, সূচীকরণ, এবং রেফারেন্স বই এই চারিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত সমগ্র পুস্তকের অর্ধেক হল গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্কিত আলোচনা। বর্গীকরণ পরিচ্ছেদে তাত্ত্বিক আলোচনা ব্যতীত কেবলমাত্র ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতির বিবরণ ও ব্যবহারিক প্রয়োগ দেওয়া হয়েছে। রেফারেন্স পরিচ্ছেদে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী উল্লেখযোগ্য রেফারেন্স বইয়ের বিবরণ আছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের এটি অপরিহার্য্য গ্রন্থ।

Swain (Olive), **comp.** Notes used on Catalog cards : a list of examples. 2nd ed. Chicago, American Library Association, 1963. ix, 82 P. S 1·75

মুখত: Library of Congress কার্ডে ব্যবহৃত টীকার সংকলন। টীকাগুলি কয়েকটি নির্বাচিত বিষয় (যথা, লেখক সম্পর্কিত, বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় ইত্যাদি) অনুযায়ী বিন্যস্ত।

বাংলা বইয়ের যৌথ সূচী

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশের নানা অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার আছে। এই সব গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-ভাণ্ডারে বহু অমূল্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সংগৃহীত আছে। আমাদের প্রাচীন পত্র-পত্রিকা-গুলোর সবিস্তার সংবাদের অভাবে পাঠকদের পড়াশুনো ও গবেষণার যে অসুবিধা হয় তা সর্বজন বিদিত। কিন্তু দূর মফঃস্বলের অব্যবহৃত গ্রন্থাগারগুলোর কোন কোনটাতে এই সব দুর্লভ সম্পদ্ সঞ্চিত রয়েছে। আমাদের প্রশ্ন ঐ সব কৃপণের ধনগুলোকে প্রয়োজনে লাগাবার উপায় কি ? যারা গ্রন্থগুলোকে দরকারের সময় পায় না তাদের হাতে ওগুলোকে পৌঁছে দেবার উপায় কী ?

সাধারণতঃ যৌথ সূচী (Union Catalogue) মারফৎ আমরা জানতে পারি কোন্ কোন্ গ্রন্থাগারে আমাদের প্রয়োজনীয় বইখানি সংগৃহীত আছে। কিন্তু বাংলাদেশে যৌথ সূচী নির্মাণ সহজ কথা নয়। যদি কোন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বাংলা দেশের সব গ্রন্থ সম্পদ্ সংরক্ষিত থাকৃত তা'হ'লে সেই গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকার এক একখানি প্রতিলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাঠিয়ে দিয়ে বলা যেতে পারত এই সব গ্রন্থের যে যেগুলো তোমাদের আছে তাতে টিক দিয়ে দাও। তারপর সেই সব চিহ্নিত প্রতিলিপিগুলোর সাহায্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কাজ চালানর মত একখানা যৌথ সূচী তৈরী করার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নেই। তার ফলে প্রধান প্রধান সমস্ত বইয়ের প্রাথমিক তালিকা তৈরী করাই আমাদের দেশে একটা সমস্যা হ'য়ে রয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের দেশে এখনই যৌথ সূচী তৈরী করা সম্ভব ব'লে মনে হয় না।

আধুনিক যুগে বই অনেক বেরোচ্ছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্তও আমাদের দেশে এত বই বেরাত না। Bengal Library-তে নিয়ম অনুযায়ী তখনকার প্রকাশিত সব বইয়েরই একখানা করে প্রতিলিপি থাকার কথা। Bengal Library যদি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অনুযায়ী পরিচালিত হ'ত তা'হ'লে ঐ গ্রন্থাগারের সূচীই আমাদের সাহিত্যিক কৃতির পরিপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করতে পারত। কিন্তু পরিতাপের কথা তা হয়নি, আজও আমরা Registrar of Publication এর পদ রেখে চ'লেছি। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে সংগৃহীত বইয়ের যথাযোগ্য সূচী রাখার ব্যবস্থা করছি না। অথচ State Library-র একজন Deputy Librarian-কে এই কাজের ভার দিলে অনায়াসেই এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা যেতে পারে। যাই হোক্ আমাদের যৌথ সূচীর মূল কাঠামো আজও তৈরী হয় নি' এবং করার জন্য আমরা যে চেষ্টিত তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

তবুও আমাদের দরকারী পুরানো বইগুলি অকেজো প'ড়ে থাকা কখনই সমর্থন করা যায় না। আমার মনে হয় জেলা গ্রন্থাগারগুলো এবিষয়ে নেতৃত্ব নিলে কিছু ফল হ'তে পারে। নিজ নিজ জেলায় ১৮৫০ সাল পর্যন্ত কোন্ কোন্ বই আছে তার একটা পরিপূর্ণ যৌথ সূচী তৈরী করা খুব কঠিন হবে ব'লে মনে হয় না। অথচ এটা তৈরী ক'রতে পারলে যৌথ সূচী তৈরীর কাজে প্রথম পদক্ষেপ করা হবে। এর পর পাঁচ বছর পর পরের গ্রন্থের সূচী তৈরী ক'রে এ সূচীকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণ করা যেতে পারে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী বইগুলোর সূচী তৈরীর সমস্যা নিশ্চয়ই অনেক কঠিন হবে। কিন্তু ১৮৫০ পর্যন্ত বাংলা বইয়ের যৌথ সূচী এভাবে তৈরী করা অসম্ভব হবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস।

প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য

(পুঁথি-সংগ্রাহক, গর্ভঃ সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা)

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর পাণ্ডুলিপি বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই আজ অব্যবহৃত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন শিক্ষিত পরিবারের অনেকেই আজ স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সহর আশ্রয় করিয়াছেন ও চাকুরীজীবী হইয়াছেন। ফলে পূর্ব পুরুষের বাস্তুভিটায় দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা-পার্বণ যেমন বন্ধ হইয়াছে সেই সাথে বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান টোলগুলিও বন্ধ হইয়াছে। ঐ সমস্ত টোলে প্রাচীন কাল হইতেই হস্তলিখিত পুঁথির মাধ্যমে পঠন পাঠন প্রচলিত ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মুদ্রিত পুঁথি ঐ সমস্ত পাণ্ডুলপির স্থান অধিকার করায় ঐগুলি ক্রমশঃ অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এতৎ সত্ত্বেও এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পূর্বাপর যে ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে সেই তুলনায় আমরা প্রায় কিছুই করি নাই। ইহার ফলে জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, প্রভৃতি দেশের গ্রন্থাগারে ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন ঐ পুঁথিগুলি যে ভাবে রক্ষিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জ্ঞান পিপাসুদের জিজ্ঞাসানিবৃত্তি করিতেছে তাহা আমাদের অনুসরণযোগ্য।

বাংলাদেশের পুঁথি সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অবদান অনস্বীকার্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, সংস্কৃতসাহিত্য পরিষদ্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পুঁথি সংগ্রহের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছে। ইহাদের প্রচেষ্টার পর দীর্ঘকাল পুঁথি সংগ্রহের জন্য সরকারী বা বেসরকারী পরিকল্পিত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ আপন আপন গবেষণার জন্য বাংলাদেশের বহুত্র পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত ৺দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত 'বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা' অজ্ঞাত বহু পুঁথির সন্ধান দিয়াছে এবং পুঁথি সংগ্রহ কার্যে ব্যাপকতর প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করিয়াছে।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বর্তমানে সুপরিকল্পিতভাবে পুঁথি সংগ্রহের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়েই কিছু পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাকৃতদানে এই সংগ্রহ বর্ধিত হইয়াছিল। বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহোদয় সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবহিত করেন। তদনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

এই পাণ্ডুলিপিগুলি আজ অনেক স্থলে ব্যবহৃত না হইলেও, ইহাদের মধ্যে যে মূল্যবান্ সংস্কৃতিক সম্পদ্ নিহিত আছে তাহা আমাদের প্রণিধান করিতে হইবে। অনেক মুদ্রিত পুঁথিরই পাঠের শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিষয়ে সংশয় আছে। এই পাণ্ডুলিপিগুলি শুদ্ধপাঠনির্ণয়ে সাহায্য করিতে পারে। যে সমস্ত পুস্তক আজ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, তাহাদের

পাণ্ডুলিপি যে বিশেষ মূল্যবান্ ইহা প্রমাণ করিবার অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন পুঁথিগুলির ভিতরে অনেক সময় দৈনন্দিন আয়-ব্যয়, নিমন্ত্রণ-পত্র, দলিলাদি পাওয়া যায়। ইহা অনেক সময় তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা ও ইতিহাস বুঝিতে সাহায্য করে। ফল কথা এই পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করা, ইহাদের ভিতরে কি আছে দেখা এবং ইহাদের সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

সুখের বিষয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহকার্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া আমি অধিকাংশ স্থলেই সহযোগিতার মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছি। অনেক স্থলেই যেরূপ সহৃদয়তা ও সৌজন্যের পরিচয় পাইয়াছি তাহা বিস্তৃত লিপিবদ্ধ করিলে পুস্তকের আকারে পরিণত হইবে। অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব-পুরুষদিগের পুঁথিগুলিকে পুরাকীর্তি হিসাবে সংস্কৃত-কলেজে রক্ষা করিবার আগ্রহে অধিকারিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুঁথিগুলি দান করিয়াছেন।

এই পুঁথিগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমরা যথোচিত যত্নসহকারে ঐগুলি ব্যবহারো-পযোগী ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুঁথির একটি পুঁটুলির মধ্যে একাধিক পুঁথি থাকে। সর্বপ্রথমে আবর্জনামুক্ত করা হয়। পাতাগুলি সিক্ত অবস্থায় জুড়িয়া থাকে। পুঁথিগুলিকে আবর্জনামুক্ত করিয়া তাই Thymol chamber-এ রাখা হয়। ইহাতে একত্র সংবদ্ধপত্রগুলি পৃথক হইয়া যায় ও কথঞ্চিৎ বীজাণুমুক্ত হয়। অতঃপর পুঁথিগুলিকে আরও বীজাণু মুক্ত করিবার জন্য Pradichlorobenzene chamberএ রাখা হয়। সেখান হইতে পুঁথিগুলিকে আনিয়া বইগুলির নাম প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া তালিকবদ্ধ করা হয়। তালিকাভুক্তির পর পুঁথিগুলির সূচী নির্মিত হয়। তাহার পর পুঁথিগুলির জীর্ণ অংশের যথোচিত সংস্কার করিয়া দুই দিকে মলাট লাগান হয়। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ তাহার পর পুঁথির বিবরণাত্মক সূচী নির্মাণ করেন। ঐ সূচী গুরুত্ব অনুসারে কলেজ হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা "Our Heritage"-এ প্রকাশিত হয়। পরে সমস্ত সূচীগুলিই একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এইরূপে অব্যবহৃত বিশাল পুঁথিগুলিকে প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুদের সম্মুখে উপস্থিত করার গুরুত্ব কম নহে। ইহা ব্যতীত নষ্টপ্রায় পুঁথিগুলিকে microfilm করিয়া রাখা হয়। যে সমস্ত পুঁথির অক্ষরগুলি প্রাচীন ও দুষ্পাঠ্য সেইগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া আধুনিকলিপিতে বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা লিখাইয়া গবেষকদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের অপরিজ্ঞাত পুঁথিগুলি সংগ্রহ করিয়া এইরূপে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারিলে আমাদের দেশের দ্রুত ক্ষীয়মাণ এক বিশাল সংস্কৃতির নিদর্শন চির বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

এই বিষয়ে কেবলমাত্র সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। জাতীয় সম্পদ্ রক্ষা করিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই সচেষ্ট হইতে হইবে। কোথায় কোথায় পুঁথি পাওয়া যায় এই সংবাদ সংগ্রহ করাই সর্বাপেক্ষা কঠিন কার্য। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃতস্থল অপরিজ্ঞাত থাকা অসম্ভব নহে। ফলে আমাদের প্রচেষ্টার অভাবে সেই সমস্ত স্থলের পুঁথি লোকচক্ষুর অগোচরে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে। বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় সচেষ্ট হইয়া এই বিষয়ে মনোযোগ দিবেন ইহাই আমাদের আশা।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার অধিকার

পশ্চিমবঙ্গে সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা আজ নগণ্য নহে। মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও কলেজ, স্কুল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার-গুলির সংখ্যা ও গুরুত্বও আজ লক্ষণীয়। তথাপি গ্রন্থাগার-গুলির কার্যব্যবস্থা সর্বত্র ঠিক্ সন্তোষজনক মনে হয় না। সমাজশিক্ষা দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলি আজ অনেকটা ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় রহিয়াছে। সরকার এই গুলিকে পুরাপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার করিতেছেন না। অথচ জনসাধারণও এই গুলির পরিচালনার যথোচিত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন না। ফলে জনসাধারণ ও সরকারের উভয়েরই নিয়ন্ত্রণাধীন অথচ কাহারও সম্পূর্ণ আশ্রয় হইতে বঞ্চিত এই গ্রন্থাগারগুলির কর্মীরা আজ নানাভাবে অসুবিধাগ্রস্ত। স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে গ্রন্থাগারের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষেরা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার সহিত জড়িত। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার সহিত জড়িত নহেন এইরূপ গ্রন্থাগার কর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্য বিবেচনা ও সম্মান পান না। শিক্ষকেরা ইঁহাদের সমগোত্রীয় মনে করেন না। করণিকেরাও ইঁহাদের আপন ভাবেন না। ফলতঃ এই গ্রন্থাগারিক সম্প্রদায় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রাপ্য সুযোগ ও যথোচিত মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত পে-কমিশনে গ্রন্থাগারিকতাকে পৃথক্ বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃতিই দেওয়া হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পে-কমিটি গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে যদিও পৃথক্ ভাবে বিবেচনা করিয়াছেন, তবুও তাঁহাদের সুপারিশ সমূহের মধ্যে এত অসামঞ্জস্য রহিয়াছে এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার নীতি সম্বন্ধে সারা পৃথিবীতে গৃহীত নীতিগুলির এত বৈপরীত্য প্রকাশ পাইয়াছে যে মনে হয় এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মহল হইতে ব্যাপারগুলি ঠিক্ ঠিক্ বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই।

বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন অনেকটা নূতন জিনিষ। আমাদের প্রাচীন শিক্ষককুল তথা শাসক গোষ্ঠী এই আন্দোলনের সহিত হয়ত এখনও তাদৃশ পরিচিত নন। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই উন্মেষের অবস্থায় প্রকৃত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিবেচনাশীল পরিচালক না থাকিলে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া দুরূহ। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা যাইতে পারে। উচ্চ বিদ্যালয়-গুলিকে যখন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়, তখন অধিকতর কুশল

শিক্ষক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একদিকে শিক্ষকদিগের বেতন বর্ধিত করিয়া দেওয়া হয় এবং অন্য দিকে তাঁদের অধিকতর যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ যুগপৎ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়ার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনায় উন্নততর অবস্থা সৃষ্টি করিতে চাহিলে আজ আমাদেরও অনুরূপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে গ্রন্থাগার পরিচালনায় পুস্তক লেনদেনই প্রধান কথা নহে। উন্নততর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইলে আমাদিগকে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক প্রস্তুত করিতে হইবে। আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অধিকতর দায়িত্ব, সুযোগ ও স্বাধীনতা না দিলে এবং উপযুক্ত বেতন না দিলে ভাল গ্রন্থাগারিক পাওয়া যাইবে না। ভাল গ্রন্থাগারিক না আসা পর্যন্ত গ্রন্থাগারিকের বেতন ও মর্যাদা বাড়িবে না এই সিদ্ধান্ত করিলে ভাল গ্রন্থাগারিক পাইবার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে। ইহা অনেকটা দুষ্টচক্রের মত। খারাপ অবস্থা এক জায়গায় রাখিতে চাহিলে ঐ খারাপ অবস্থায় সমস্ত চক্রটিকে খারাপ করিয়া দিবে।

যাহা হউক সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার সূত্রই প্রায়শঃ এক। সমস্ত গ্রন্থাগার-গুলির নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যদি এই বিষয়ে অভিজ্ঞ এক বিশেষ আধিকারিকের উপর ন্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে সরকার অন্ততঃ প্রকৃত অবস্থা জানিতে ও বুঝিতে পারেন। ইহাতে গ্রন্থাগারিকের বক্তব্য প্রকাশ করিবারও সুবিধা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষেরাও গ্রন্থাগার পরিচালনার ত্রুটিগুলি কেমন করিয়া দূর করা যায় সে বিষয়ে সম্যক্ উপদেশ পাইতে পারেন।

শিক্ষাধিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে শারীর-শিক্ষণ বিভাগের জন্য পৃথক্ অধিকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্কুল, কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শারীর-শিক্ষার শিক্ষক প্রত্যক্ষতঃ আপন আপন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়াও শারীর শিক্ষার সমুন্নতির জন্য শারীর-শিক্ষণ বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট দায়াবদ্ধ থাকিতেন। ইহাতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানেরও উপকার হইত—তাঁহাদের কার্যের যথোচিত যোগ্যতা প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি রাখা যাইত।

পশ্চিমবঙ্গে একজন গ্রন্থাগার-অধিকর্তার পদ সৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ পদে আজিও কেহ নিযুক্ত হন নাই এবং উহার অধিকার ও কার্যসীমাও কিরূপ তাহাও সঠিক জানা যায় নাই। মনে হয় ঐ পদে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে, এবং তাঁহার পরামর্শমত চলিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতি হইতে পারে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

ত্রয়োদশ বর্ষ | সপ্তম সংখ্যা | কার্ত্তিক ১৩৭০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৩শ বর্ষ] কার্তিক : ১৩৭০ [৭ম সংখ্যা

বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : মালয় ও সিঙ্গাপুরের

মালয়েশিয়া। সংবাদপত্র পাঠকের কাছে আজ আর এই শব্দটি অপরিচিত নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে কটি দ্বীপ নিয়ে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠিত হয়েছে তার মধ্যে মালয় ও সিঙ্গাপুর অন্যতম। পৃথিবীর এই দুটি ক্ষুদ্র অংশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা আলোচনা করার আগে এই অঞ্চলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্যের সঙ্গেও আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

মালয় আর সিঙ্গাপুরের প্রকৃতি রবারের বন এবং টিনের খনিতে অকৃপণ। জীবিকার অনেকটা অংশই পূর্ণ হয় এখান থেকে। স্বভাবতই বিদেশী ইংরেজের দৃষ্টি এখানে আকর্ষিত হওয়ার মূল কারণ ঐ দুইটি প্রাকৃতিক সম্পদ। সেইজন্যে প্রথমে ইংরেজ সরকারের অধীনেই গড়ে ওঠে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা—গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তারই সঙ্গে যুক্ত।

মালয় ৫০, ৬৯০ বর্গ মাইলের একটি উপদ্বীপ। আয়তনে ইংলণ্ডের তুলনায় সামান্য বড় কিন্তু সিঙ্গাপুরের তুলনায় ২২৭ গুণ। অথচ মালয়ের জনসংখ্যা সিঙ্গাপুরের তুলনায় মাত্র চার গুণ বেশী। মালয়ের বর্তমান জনসংখ্যা ৬২ লক্ষের কিছু বেশী। মালয়ের অধিবাসীদের অধিকাংশই স্থানীয় লোক কিন্তু সিঙ্গাপুরের বেশীর ভাগ চীনা। স্বাভাবিকভাবেই এই সমগ্র অঞ্চলে ইংরাজী ছাড়াও চীনা ও স্থানীয় ভাষার প্রচলন আছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চল আজ আর শুধুমাত্র হলিউডের চলচ্চিত্র পরিচালকের কাছে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিচিত্র জীবনের জন্য আকর্ষণীয় নয়, গ্রন্থাগার উৎসাহী জনসাধারণেরও অন্বেষণস্থল।

বিগত কয়েক বৎসরে মালয় ও সিঙ্গাপুরের ব্যবস্থার কিছু সমীক্ষা হয়েছে। ১৯৫০ সালে British Council-এর প্রধান আঞ্চলিক গ্রন্থাগার উপদেষ্টা Kate D. Ferguson মালয় ফেডারেশন প্রাপ্ত পাঠ্য সামগ্রীর সমীক্ষা সমাধা করেন। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি

Federation of Malaya Adult Education Association-এর অনুরোধে Malayan Library Group মালয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট মালয়ের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্বন্ধে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। ১৯৫৭ সালে Ilse Tay "Notes on special and research Libraries in Malaya" এই শিরোনামায় একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন Malayan Library Group News letter নামক পত্রিকায়। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে UNESCO Seminar-এ Wilfred J. Plumbe "Scintific information facilities in Malaya" এই শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সিঙ্গাপুরের সম্বন্ধে ঐ একই বিষয়ের উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন Hedwig Anuare। এ ছাড়াও ছোট-খাট সমীক্ষার কাজ কিছু কিছু হয়েছে। তবে এই সমগ্র অঞ্চলের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন মালয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একজন কর্মী Edward Lim Huck Tee তাঁর History of Libraries in Malaya গ্রন্থে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার

সিঙ্গাপুর : সিঙ্গাপুরে বর্তমানে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি Polytechnic ও একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার বলতে বোঝায় এখানকার এই ক'টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলিকেই।

সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯০৫ সালে। কিন্তু সেই সময়ে মালয়ে কোন পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। এই বিশ্ববিদ্যালয়কেই মালয় ও সিঙ্গাপুরের বিশ্ববিদ্যালয় বোঝাত। কিন্তু ১৯৬২ সাল থেকে মালয়ের রাজধানী Kuala Lampur-এ একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয় সিঙ্গাপুর শহরেই থেকে যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মোট ২৯৪,০০০ গ্রন্থ তিনটি বিভাগে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ১২৯,০০০ ; চীনা বিভাগে ১১৭,০০০ এবং চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগে ৪৮,০০০ গ্রন্থ রয়েছে। ৩০০০ সাময়িকপত্র বর্তমানে এখানে নিয়মিত রাখা হচ্ছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে রয়েছে একজন গ্রন্থাগারিক, তিনজন সহঃ গ্রন্থাগারিক, বার জন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক সহকারী এবং অন্যান্য ৩৬ জন কর্মী। ১৯৫৩ সালে নির্মিত একটি ভবনে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও চীনা বিভাগ অবস্থিত চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগ বর্তমানে সহর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে।

অপর বিশ্ববিদ্যালয়টি হচ্ছে Nanyang University। চীনা ব্যবসায়ীরা প্রায় ছ'বছর আগেই সিঙ্গাপুর সহরেই এই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে চীনা ভাষার পুস্তক সংখ্যা ৭০,০০০ এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষায়। প্রধানতঃ ইংরাজী ৩৭,০০০ বই রয়েছে। ২৭৬ খানা সাময়িকপত্র নিয়মিত রাখা হয়েছে। একজন গ্রন্থাগারিক ও ২১ জন সহকারী নিয়েই এখানকার কর্মীদল গঠিত। প্রাচীন চীনা প্রাসাদের ধরণে নির্মিত একটি মনোরম অট্টালিকায় গ্রন্থাগারটি অবস্থিত।

সিঙ্গাপুর পলেটেনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৪, ৫২০ খানা বই ও ৩২০ খানা সাময়িকপত্র এখানে রয়েছে। গ্রন্থাগারিক ও তাঁর আটজন সহকর্মী একটি বৃহৎ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে (প্রায় ৫,৫০০ বর্গফুট) বসে এখানকার কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন।

সিঙ্গাপুরের শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারে কর্তৃপক্ষ তাঁদের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত Statistics গোপনীয় বলে গণ্য করেন। তবে মনে হয় এখানে ১২০০ বই আছে। একজন ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত উৎসাহী Chartered গ্রন্থাগারিক এখানকার কাজ-কর্ম খুবই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে থাকেন।

মালয়—মালয়ে বর্তমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, সাতটি কলেজ, একটি করে ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র ও বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও সরকার পরিচালিত একটি Commercial Institute রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় আরও কতগুলি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে।

সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথক হয়ে এসে মালয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে। এখানকার গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ১১৭,০০০। এর মধ্যে ২৪,০০০ গ্রন্থই তামিল ও চীনা ভাষায় এবং সবগুলিই প্রায় সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া গেছে। ৩,০০০ সাময়িকপত্র ও প্রায় ২২,০০০ Microfilm, Microfiche ও Microcard এখানে রয়েছে। একজন গ্রন্থাগারিক, দুইজন সহঃ গ্রন্থাগারিক, ন'জন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক সহকারী ও অন্যান্য ৩২ জন কর্মী নিয়ে এখানকার কাজকর্ম চলছে। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে স্থানসঙ্কুলান মোটেই হচ্ছে না। শীঘ্রই বর্তমান গ্রন্থাগার ভবনের থেকে পাঁচ গুণ বড় একটি নব নির্মিত ভবনে মালয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হবে।

সাতটি কলেজের মধ্যে Kuala Lampur এর Tachnical College-এ সব থেকে বড় গ্রন্থাগার রয়েছে। প্রায়। ১৫,০০০ গ্রন্থ নিয়ে চারজন কর্মী এখানকার কাজ চালাচ্ছেন। এছাড়া Muslim College, College of Agriculture, তিনটি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে এবং Military College-এর সঙ্গেও ভাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে।

Kuala Lampur এর Language Institute-এর গ্রন্থাগারটিও দ্রুত উন্নতির পথে চলেছে। এখানকার কর্তৃপক্ষ একজন অধ্যাপককে Colombo Plan-এর বৃত্তি দিয়ে London-এ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছেন। সরকার Comercial Institute-এ একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার রয়েছে। Kuala Lampur-এ specialist Teachers' Training Institute-এও একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই Institute কর্তৃপক্ষ এখানে সর্ব সময়ের জন্য গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার একটি পরিকল্পনা করেছেন।

গবেষণা মূলক ও বিশেষ গ্রন্থাগার (Research and special Library)

সিঙ্গাপুর: এখানকার বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে Botanic Garden, National Museum, Supreme Court, Legislative Assembly এবং সরকারী বিভাগের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি গ্রন্থাগারকেই ধরা যেতে পারে। এর মধ্যে খুব বড় না হলেও Botanic Gardens Library-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মালয়: সিঙ্গাপুরের তুলনায় মালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (Special Library system) অনেকাংশে ভাল। সরকারী বিভাগের সংগে যুক্ত ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও যে কটি বিশেষ গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করা চলে—সেগুলি হ'ল:

(ক) **কৃষি মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগার**—১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। ৪৩,০০০ বই এবং ৫২০ খানা সাময়িক পত্র ছাড়াও কিন্তু মূল্যবান সাময়িক পত্রের পুরনো সংখ্যা এখানে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থাগারে মালয়ের কৃষি বিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্র সমূহের ছোট ছোট গ্রন্থাগার গুলির Union Catalogue রয়েছে।

(খ) **Rubber Research Institute:** এখানকার গ্রন্থাগারে ১৫,০০০ বই রয়েছে। একটি মাত্র কৃষি দ্রব্যে নিয়োজিত গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে এইটিকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ বলে ধরা হয়। এখানকার পরিচালন ব্যবস্থা অত্যন্ত আধুনিক। গ্রন্থাগারিক সাধারণ বিজ্ঞানে ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

(গ) **Institute of Medical Research:** ৮,০০০ গ্রন্থের এই বিশেষ গ্রন্থাগারটি অদূর ভবিষ্যতে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Medicine-এর গ্রন্থাগারে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

(ঘ) **Geological Survey Department:** মালয়ের খনিজ সম্পদের মধ্যে টিনের কথা আগেই বলা হয়েছে। মূলতঃ এই শিল্পের ভবিষ্যতের জন্য গবেষণা কর্মে সাহায্য করতে এখানকার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে Ipoh-তে।

(ঙ) **Forest Research Institute:** Kuala Lampur-এর কাছে Kepong-এ এই বিশেষ গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(চ) **Dewan Bahasa dan Pustaka (ভাষা ও সাহিত্য সংস্থা):** মালয়ী ভাষায় প্রকাশিত প্রায় ৮,০০০ গ্রন্থ এখানে রয়েছে। এই গ্রন্থাগারটিকে একদিক থেকে মালয়ের জাতীয় গ্রন্থাগার বলা চলে। এখানকার গ্রন্থাগারিক বর্তমানে ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেছেন।

(The Library world পত্রিকার ১৯৬৩ সালের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত Wilfred J. Plamble লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে অরুণ ঘোষ কর্তৃক লিখিত)

মণিশংকর |

ডিসপ্লে ওয়ার্ক

Display Work গ্রন্থাগারে পাঠক আকৃষ্ট করার একটী প্রধান উপায়। বিশেষ করে শিশুগ্রন্থাগার বা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এর একটী প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে। বর্ত্তমান যুগে নিত্য নতুন জ্ঞান আহরণ করছে মানুষ। ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়ে অজানাকে জানছে নির্ভয়ে। আর গ্রন্থাগার সে জ্ঞানসম্ভারকে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্রত নিয়েছে। তাই পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য Display Work গ্রন্থাগারের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সহজেই এতে আকৃষ্ট হয় এবং কি করে প্রদর্শিত বিষয়ের সম্বন্ধে জানতে বা শিক্ষা পেতে পারবে তার জন্য ব্যগ্র হয়। শুধু ছোটদের বেলায় নয়, বড়দের গ্রন্থাগারেও সময়োপযোগী বা কোন বিশেষ বিষয়ের দিকে পাঠককে আকৃষ্ট করতে Display Work যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

আমাদের দেশেও অধিকাংশ গ্রন্থাগারে গেলেই দেখা যাবে—একখানা বোর্ডের উপরে প্রায় দুবছর আগে প্রকাশিত কয়েকখানা বইয়ের মলাটের আবরণ (Jacket) ঝুলছে। হয়ত ছমাস বা আটমাস আগে বোর্ডে সেগুলি স্থান পেয়েছিল। কিন্তু আজও তা অপরিবর্তিত। ধুলোভরা বোর্ডখানার কাছেও কোন পাঠক ঘেঁষেন না। কিংবা হয়তো Display board খানা এমন এক স্থানে রয়েছে যেখানে পাঠকবর্গের দৃষ্টি চলে না। এ ঘটনা অনেক গ্রন্থাগারেই ঘটে চলেছে বা চলে আসছে। সাধারণতঃ কোন গ্রন্থাগারেই কোন Display window বা boardএর ব্যবস্থা নেই, কিংবা থাকলেও তার কোন ব্যবহার নেই। কারণ আমাদের ধারণা এসব করতে গেলে একটী বিরাট খরচ—। প্রশ্ন হবে—বই কেনার টাকা নেই, Display করার খরচ কোথায় পাব? এমনি আরও কত সমস্যার কচ্‌কচি চলবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা একবারও ভেবে দেখি না যে কেবল প্রচুর খরচ করেই ভাল Display হয় না; বা ভাল Display করতে হলে অজস্র অর্থের প্রয়োজন হয় না। বিনে খরচায় না হলেও অতি সামান্য খরচেই সুন্দর ও আকর্ষণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সুষ্ঠু এবং সুন্দর Display work এর জন্য প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়—প্রথমতঃ দেখতে হবে যেন প্রদর্শনীটি চমকপ্রদ হয় অর্থাৎ পাঠক বা দর্শক যেন প্রথম দর্শনেই আশ্চর্য্যান্বিত হন। প্রদর্শিত নক্সা বা বস্তুর বিন্যাস যেন একটা নূতন ভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হয়। সাধারণতঃ ব্যঙ্গ চিত্র, কৌতুকপ্রদ পুতুল বা সজ্জা এক্ষেত্রে উপযোগী। দড়ি, ফিতে বা এই শ্রেণীর কোন জিনিষের সাহায্যে বোর্ডের উপরে বক্তব্যটি লিখে দিলে তার আকর্ষণ অনেকগুণ বেড়ে

যাবে সন্দেহ নেই। কিংবা নানা প্রকার বক্ররেখার সাহায্যে অক্ষর চিত্রণও বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় হয়। গতানুগতিক ভাবে গ্রন্থাগারের প্রবেশ দ্বারের সামনে একখানা Display board না রেখে যদি তাকে একটু অসাধারণ স্থানে মাঝে মাঝে সরিয়ে দেওয়া যায়, তবে তা অনেক বেশী কার্য্যকরী হয়। অসাধারণ স্থান বলতে এমন স্থান যেখানে এ জাতীয় কিছু, দেখার জন্যে পাঠক প্রস্তুত ছিল না—এমন স্থানকেই বোঝান হয়েছে। যেমন Catalogue cabinetএর কাছে, কোন Alcoveএর পাশে, অথবা Charging counterএর সামনের দেয়ালে ইত্যাদি। মোটামুটি জিনিষটা এমন হওয়া দরকার যাতে পাঠক একটু অবাক, একটু বিস্মিত হয়ে এবং একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ যেন তাকে বইয়ের বিষয় বস্তুর দিকে আকৃষ্ট করে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন একটি ছবি বা একই Jacket বা একই ধরণের সজ্জা যেন পাঠকের মনে, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে বিতৃষ্ণা বা বিরক্তির সৃষ্টি না করে। তা যেন কখনও পুরোনো না হয়—তাকে নিত্য নতুন ভাবে সাজাতে হবে, নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে হবে। সুতরাং ঘন ঘন দৃশ্যপট পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রত্যেকদিন তাকে নতুন করে সাজাতে হবে না এবং তা সম্ভবও নয়। কিন্তু দেখতে হবে যেন তা মাসের পর মাস ধরে একঘেয়ে পরিবেশ সৃষ্টি না করে। সাধারণভাবে মাসে দুবার দৃশ্যপটের পরিবর্তন প্রয়োজন। এতে পরিশ্রম এবং খরচও লাগবে কম, আবার আকর্ষণীয় পরিবেশও স্থায়ী থাকবে। Display work এ অংশ গ্রহণের জন্য শিশু গ্রন্থাগারে বা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে শিশুদের বা ছাত্রদের উৎসাহিত করা উচিত যাতে তারা নিজেরাই আকর্ষণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারবে। স্কুলে সাধারণতঃ ক্লাসের পড়ার সঙ্গে তাল রেখে Display board বা Window সাজান উচিত।

তৃতীয়তঃ, মনে রাখতে হবে Display work এর মাধ্যমে যেন বক্তব্যটুকু আকর্ষণীয় ভাবে ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হয়। এই সাধারণ কথাটা আমরা অনেক সময়েই ভুলে যাই যে অল্পের মধ্যে বিরাট কিছু বলতে পারলেই তাকে ভাল Display বলে গণ্য করা হয় না। তার ভাব এবং ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য এবং সহজ ভাবও থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রদর্শনীর বক্তব্য যেন নিজের থেকেই পাঠকের কাছে ধরা দেয়, কারণ পাঠক তাকে খুঁজে বেড়াবে না। তা'হলে Display work এর প্রয়োজনই থাকত না। এ বিষয়ে শিশু বা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ সেখানে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যটি বা তার বক্তব্য তখন সহজেই শিশুর অন্তরে প্রবেশ করতে পারে; এবং প্রবেশ করতে পারলেই শিশু, গ্রন্থাগার প্রদর্শনী থেকে গ্রন্থের দিকে আকর্ষণ অনুভব করবে, তাকে পুরোপুরি জানতে চাইবে এবং না জেনে হয়তো ক্ষান্ত হবে না।

এবারে প্রশ্ন হল :—এই Display work-কে কেমন করে আকর্ষণীয় করে তোলা যাবে? আমেরিকা বা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এর জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। সেখানে কেবল মাত্র Display-র জন্য ব্যবহারের নানা জিনিষ কিনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া

তাদের পক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করাও সম্ভব। কিন্তু আমাদের অপর্যাপ্ত অর্থ ভাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করা প্রয়োজন বইকি ?

Display করার এমন কোন বাঁধাধরা আইন বা পথ নেই যার মধ্যে এর গতিবিধিকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যে কোন জিনিষ দিয়েই সুন্দর Display window সাজান যেতে পারে। যেমন রঙিন বা সাদা কাগজ, কাগজের বোর্ড, মাদুর, কাপড়, সুন্দর দড়ি (অক্ষর লেখার জন্য), ফিতে, ছবি, সুন্দর সোলার কাজ, পট, পুতুল ও অন্যান্য শিল্প দ্রব্য যা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর Display window সাজান যেতে পারে। অনেক সময়ে ফুলের টব, গাছের শুকনো ডাল, পাতা প্রভৃতি প্রত্যেকটিকেই উপযুক্ত স্থানে এবং উপযুক্ত ভাবে বসাতে পারলে এবং তার সঙ্গে বক্তব্যটি সুন্দর ভাবে জানাতে বা বোঝাতে পারলেই Display work-এর উদ্দেশ্য সফল হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বক্তব্য প্রকাশ করতে পারবে এমন যে কোন জিনিষ দিয়েই সাজান যেতে পারে অর্থাৎ বক্তব্য বা Display-র বিষয়বস্তু কি জিনিষ দিয়ে সাজালে ভাল হবে তা ঠিক করে দেবে।

লেখা বা আঁকার রংগুলির দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। ছোটদের ক্ষেত্রে একটু উজ্জ্বল ধরণের রং বা কাগজ বা কাপড় ব্যবহার করতে পারলেই ভাল হয়। এছাড়া Jacket Display বোর্ডটিকে মাঝে মাঝে নতুন ভাবে সাজাতে পারলে ভাল হয়। কখনও কোণ করে, কখনও বা সোজা ভাবে আবার কখনও বা মাঝখানে একটা উজ্জ্বল রংয়ের Jacket দিয়ে অন্যগুলি তার চারদিকে গোল করে সাজান যেতে পারে। আবার Jacket-এর মধ্যে পেজবোর্ড দিয়ে তাকে একখানা বই-এর মত করে সাজালে বা Third dimension এ সাজালে তা সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হবে।

কালবৈশাখী

পত্রপত্রিকা বিভাগের সমস্যা ও তার সমাধান

আজকের দিনে বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলা সত্যিই কষ্টকর। কিন্তু কষ্টকর বলে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র তো মানুষ নয়; সে চায় আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে নতুন নতুন আবিষ্কারের পথে। এই দ্রুত অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য বিজ্ঞানীদের যে সব বিষয়ের দিকে নজর রাখতেই হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর নিজের গবেষণা ক্ষেত্রে এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে দেশে বিদেশে কি কি গবেষণা হচ্ছে আর আজ পর্যন্ত সেগুলোতে কতদূর ফল পাওয়া

গেছে সে সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব ওয়াকিবহাল থাকা। যতদূর সম্ভব বললাম কারণ আজকের বিজ্ঞান এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে যে একজনের পক্ষে কোন বিষয়েরই সব খবর রেখে তারপর নিজস্ব গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তবু নিজের গবেষণার সুবিধার জন্যই তাঁদের এই প্রায় অসম্ভব চেষ্টা করতে হয়। গবেষণা ছাড়াও অধ্যাপনা, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি অনেক কারণেই আজকাল এই 'সবচেয়ে নতুন খবর' গুলো জানার দরকার দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই দরকারের সমাধান কোথায় ?

কোন একটা বিষয়ে নতুন কোন মতবাদ বের হলে বা কোন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হলে সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ একটা বই প্রকাশিত হয় না। অন্তত কয়েকমাস দেরী হয়। একটা সাধারণ উদাহরণ ধরা যাক। মহাকাশ বিজ্ঞান বোধ হয় আজকের দিনের সবচেয়ে দ্রুত প্রগতিশীল বিজ্ঞানের শাখা। কিন্তু সংখ্যাতাত্ত্বিক বা তত্ত্বভিত্তিক পর্য্যালোচনায় দেখা যাবে যে এই বিশেষ শাখায় মানুষের পূর্ণজ্ঞান পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। যা আজ পর্যন্ত বইয়ের আকারে পাওয়া যাচ্ছে তার পরিমাণ খুব বেশী করে ধরলেও শতকরা পচাত্তর ভাগ। অতএব শুধু বই আমাদের এই "সবচেয়ে নতুন খবর" জানার সমস্যার কোন সমাধানই করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা হচ্ছে পত্রপত্রিকার। পত্রিকায় ছোটখাট প্রবন্ধের আকারে গবেষণার ফলাফল বা সে সম্বন্ধে নানা মতামতগুলি প্রায় সাথে সাথেই প্রকাশিত হয়। প্রধানতঃ এই কারণে গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ করে 'বিশেষ গ্রন্থাগার' গুলিতে (special Libraryতে) পত্রিকার প্রয়োজন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সাধারণতঃ 'বিশেষ গ্রন্থাগার'গুলো কোন না কোনভাবে এক বা একাধিক গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় এখানে পত্রিকার প্রয়োজন সাধারণ গ্রন্থাগারের চেয়ে বেশী। ক্রমবর্দ্ধমান এই পত্রিকার সংখ্যা নিত্য নতুন সমস্যা নিয়ে হাজির হচ্ছে গ্রন্থাগারকর্মীর সামনে।

আমাদের দেশে কোন একটা বিশেষ গ্রন্থাগারে যেখানে পত্র-পত্রিকার বিভাগকে তিনশ' বা আরও বেশী পত্র-পত্রিকা নিয়ে কাজ করতে হয় সেখানে কি কি সমস্যা দেখা দেয় বা দেখা দিতে পারে সেটা দেখা যাক। সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে পত্রিকাগুলো সরাসরি প্রকাশকদের কাছ থেকে না নিয়ে কোন এজেন্টের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কয়েকটা ব্যাপারে সুবিধার জন্যেই এ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কি কি সুবিধা হয় সেগুলো সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা দরকার। প্রথমতঃ যে-সব পত্রিকা সম্বন্ধে যথা সময়ে না পাওয়া বা ঐ ধরণের কোন অভিযোগ আছে আমরা সে সব পত্রিকার সরবরাহকারী এজেন্টের কাছে একটা চিঠি দিয়েই তাঁকে ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ করতে অনুরোধ করতে পারি। কিন্তু যদি প্রত্যেকটা পত্রিকাই আলাদা-ভাবে সরাসরি প্রকাশকদের কাছ থেকে নেওয়া হ'ত তবে তাদের প্রত্যেককেই চিঠি দিয়ে জানাতে হত। এজেন্টের মাধ্যমে পত্রিকা গ্রহণ করলে তাই চিঠিপত্রের অযথা ঝামেলা থেকে খানিকটা রেহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ কবে কোন পত্রিকার চাঁদার মেয়াদ শেষ হবে, কবে নতুন বছরের চাঁদা পাঠালে নতুন বছরের পত্রিকার প্রথম

সংখ্যাগুলো না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না ইত্যাদি খবর সরবরাহ করে এই এজেন্টেরা গ্রন্থাগার-কর্মীদের সাহায্য করে থাকেন।

স্থানীয় কিছু পত্র-পত্রিকা বিক্রেতা এই ধরণের এজেন্টদের কাজ করে থাকেন। তবে সব দিক বিচার করলে মনে হয় যে, এজেন্টের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। যাঁরাও বা আছেন তাঁদের মধ্যে কাকেও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলা যায় বলে মনে হয় না। কোন না কোন বিষয়ে মনোযোগের বা যত্নের অভাব প্রায়ই এদের মধ্যে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বার বার তাগাদা দেওয়া সত্বেও প্রায়ই এই এজেন্টেরা প্রকাশকদের কাছে পত্রিকা না পাওয়া সম্বন্ধীয় চিঠি দিতে এত দেরী করে ফেলেন যে চিঠি পাবার আগেই প্রকাশকের সেই সংখ্যার সব ক'খানি হয়ত শেষ হয়ে যায়। যাই হোক এ-সব ত্রুটি সত্বেও এই এজেন্টের মাধ্যমেই আমাদের কাজ চালানো ছাড়া উপায় নেই। যতটা সম্ভব ভাল কাজ এঁদের কাছ থেকেই আদায় করতে হয়। এই হল গ্রন্থাগারের প'ত্রিকা বিভাগের প্রথম অসুবিধা।

গ্রন্থাগারের পত্রিকা বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে পত্রিকাগুলো যথাসময়ে আসছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ রাখা আর যদি না আসে তবে সে বিষয়ে তদারক করা (সাধারণতঃ চিঠি দিয়ে) যাতে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থেকে কোন সংখ্যা বাদ না পড়ে। শুনতে বা বলতে গেলে কাজটা মনে হয় খুবই ছোট আর সহজ, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তত সহজ নয়। পত্রিকার সংখ্যা বাড়ায় সমস্যাটা জটিলতর হয়ে পড়েছে, তাই তার সমাধানের জন্য এদের প্রাপ্তির হিসাব রাখার জন্য কোন না কোন ধরণের কৃত্রিম কারিগরী ব্যবস্থার (technical process) আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। এ ব্যবস্থাগুলো সাধারণতঃ সওদাগরী অফিসের নানা ধরণের হিসাব রাখার পদ্ধতির গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত রূপ। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যেটা আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় তার নাম ভিসিবিল পিরিওডিক্যাল রেকর্ড (Visible periodical record)। বিভিন্ন দেশের সংখ্যাতত্ত্বিক হিসাবে দেখা যাবে যে বর্তমানে এই ব্যবস্থাই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় ষ্টীল ফ্রেমের মধ্যে পাঁচটা বা তার বেশী ষ্টীলের ট্রে থাকে। এই রকম প্রত্যেক ট্রেতে ৪৫।৬৫ টার মত পরস্পর সংযুক্ত (interlocked) একটু মোটা ধরণের কাগজ লাগানো থাকে। এগুলোকে কার্ড হোল্ডার বলা হয়। কার্ড হোল্ডারগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে প্রত্যেক হোল্ডারের একদিকের প্রায় সিকি ইঞ্চি দেখা যায়। সে অংশটা সাধারণতঃ প্লাষ্টিকে মোড়া থাকে যার ফলে যখন কোন কার্ড এই হোল্ডারে লাগানো হয়, তখন তার নীচের দিকের সিকি ইঞ্চির মত জায়গায় লেখাটা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ট্রে থেকে আবার কার্ড হোল্ডারগুলো সহজেই আলাদা করা যায়: এই হোল্ডারগুলোকে দুরকমের কার্ড ব্যবহার করা হয়। একটাতে থাকে পত্রিকার নাম, প্রকাশের সময়, প্রকাশকের নাম, সরবরাহকারীর নাম-ঠিকানা, চাঁদার হার, বিল নম্বর, জমা দেবার তারিখ ইত্যাদি। এই কার্ডটা কার্ড হোল্ডারের উল্টোদিকে লাগানো থাকে। সেজন্য হোল্ডারটা না তুললে এটা দেখা যায় না। এ কার্ডকে টপ কার্ড (top card) বলা হয়। অন্য কার্ডে অর্থাৎ রেজিষ্ট্রী

কার্ডে পত্রিকার নাম, প্রকাশকাল (Frequency) সন, তারিখ বা মাস দেওয়া থাকে। এ কার্ডের একটা অংশ সহজেই দেখা যায় ট্রেটা খুললেই ; সে অংশে পত্রিকার নাম লেখা থাকে। কাজের সুবিধার জন্য দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলোর জন্য বিভিন্ন রংএর কার্ড ব্যবহার করা হয়—যেমন দৈনিক পত্রিকাগুলো সাদা কার্ডে, ত্রৈমাসিক গোলাপী কার্ডে ইত্যাদি। রেজিষ্ট্রি কার্ডে চৌকো চৌকো ঘর কাটা থাকে, কোন একটা সংখ্যা গ্রন্থাগারে পৌঁছালে সেটার হিসাব রাখার জন্যে। ঐ চৌকে ঘরে (✓) চিহ্ন দিয়ে অনেকে এই হিসাব রাখার কাজ চালান, কিন্তু দৈনিক পত্রিকা ছাড়া অন্যগুলোর ব্যাপারে ঐ চৌকো ঘরে সে সংখ্যার প্রাপ্তি তারিখটা লিখে রাখতে পারলে সবচেয়ে সুবিধা ; কারণ তাহলে শুধু কার্ডটা দেখেই বলে দেওয়া যায় যে কোন একটা বিশেষ সংখ্যা গ্রন্থাগারে কবে পৌঁছেছে। এই সব ট্রেতে কার্ডগুলো সাজানো থাকে বর্ণানুক্রমিক ভাবে। এ ব্যবস্থা ব্যবহারে সবচেয়ে বড় সুবিধা হল কোন পত্রিকা কোন একটা সংখ্যা গ্রন্থাগারে এসেছে কিনা জানতে হলে চট্ করে কার্ড থেকে সেটা দেখে নেওয়া যায়। স্তূপাকার পত্রিকার মধ্যে হাতড়ে খুঁজতে হয় না। এই হল মোটামুটি ভিসিবল পিরিওডিক্যাল রেকর্ডের হিসাব কিভাবে রাখা হয় তার বর্ণনা।

যদি সব পত্রিকা ঠিকমত যথাসময়ে গ্রন্থাগারে পৌঁছায় তবে আর কোন সমস্যাই থাকে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা ঘটে না। তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের নির্দ্ধারণ করতে হয় কোন পত্রিকার কোন একটা সংখ্যা কত তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে প্রকাশকের বা এজেন্টের কাছে এ বিষয়ে জানাতে হবে। এই কাজটা খুবই গোলমেলে—কারণ ঐ তারিখ নির্দ্ধারণের জন্য পত্রপত্রিকার নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

(১) প্রকাশ-কাল অর্থাৎ সেটা পাক্ষিক মাসিক বা অন্য কিছু।

(২) প্রকাশ-স্থান অর্থাৎ কোন দেশ থেকে সেটা প্রকাশিত।

(৩) প্রকাশকের মোটামুটি সময় অর্থাৎ মাসিকের ক্ষেত্রে মাসের প্রথমে বা শেষে কখন এটা প্রকাশিত হয়।

(৪) বিবিধ—যথা পত্রিকাটি প্রকাশকের কাছ থেকে সরাসরি আসে, না অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আসে, পত্রিকাটি কি চাঁদার পরিবর্তে পাওয়া যাচ্ছে—না বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে প্রকাশকের সহযোগিতার স্মারক হিসাবে ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি বিষয়ে একে একে আলোচনা করা দরকার। পত্রিকাটি যদি মাসিক হয় তবে সপ্তাহে সপ্তাহে কেউই এর একটা করে সংখ্যা আশা করবেন না—এই কারণে প্রত্যেক পত্রিকার প্রকাশ-কাল ভাল করে মনে রাখা দরকার। ভিসিবিল পিরিওডিক্যাল রেকর্ডারের টপ কার্ড আর রেজিষ্ট্রি কার্ড দুটোতেই এর উল্লেখ করবার জন্য জায়গা থাকে তাই কার্ডটা ভালভাবে পূর্ণ করা থাকলে এ বিষয়ে কোন ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না।

যদিও পত্রিকার প্রকাশ-স্থান প্রত্যক্ষভাবে পত্রিকা বিভাগের কোন সমস্যার কারণ হবার কথা নয়, তবু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে এটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে সব গ্রন্থাগারে উচ্চতর গবেষণারত গবেষকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়

তাদের পত্রিকা বিভাগকে বিদেশী পত্রপত্রিকা নিয়ে কাজ করতেই হয়। তার ওপর যদি গবেষণার ক্ষেত্র বিজ্ঞান বা কারিগরী বিদ্যা হয়ে তাকে তবে তো কথাই নেই। কারণ ঐ সব বিদেশী পত্রিকার মাধ্যম ছাড়া সে সব দেশের গবেষণার খবরাখবর পাবার আর কোন নির্ভরযোগ্য পথ নেই। বিদে পত্রিকাগুলো সরাসরি অথবা এজেন্টের মাধ্যমে যে কোনভাবেই নেওয়া হোক না কেন সমস্যা একই থাকে। সমস্যাটা হচ্ছে এই যে একটা পত্রিকা বিদেশে প্রকাশিত হওয়ার কতদিনের মধ্যে আমাদের হাতে এসে পৌছানো উচিত সেটা স্থির করা। দেশভেদে এই সময়ের পরিমাণেরও তারতম্য হয়। প্রত্যেক পত্রিকার আনুমানিক প্রাপ্তি তারিখ স্থির করা না গেলেও প্রাপ্তি সপ্তাহ নির্দ্ধারণ করা চলে। দেশীয় পত্রিকাগুলো প্রকাশের তিন-চারদিনের মধ্যে গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ পৌছে থাকে। বিদেশী পত্রিকার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে সেখান থেকে এসে পৌছাতে। সেজন্য আনুমানিক প্রাপ্তি সপ্তাহ নির্দ্ধারণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কোথা থেকে আর কি ভাবে পত্রিকাটি আসছে অর্থাৎ 'জাহাজ' কিম্বা বিমানে আমেরিকার পত্রিকা বিমানে এলে প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে এসে পৌছোয়। পত্রিকাটি জাহাজে এলে সময় লাগে দুই থেকে আড়াই মাস। প্রত্যেক পত্রিকার দুই বা তিনটা সংখ্যা কবে প্রকাশিত হয়েছে আর কবে এসে পৌছেছে সেটা লক্ষ্য করে একটা মোটামুটি প্রাপ্তি সপ্তাহ স্থির করাই সবচেয়ে ভাল। সুরুতে এর জন্য যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে প্রাপ্তি তারিখ লক্ষ্য করতে হয়। অনেকের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যায় যে দেশ অনুসারে একটা নির্দিষ্ট সময়কাল স্থির করার। প্রকাশ তারিখের সাথে এই সময়কালটা যোগ করে আনুমাণিক প্রাপ্তির তারিখ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আমেরিকান পত্রিকার ক্ষেত্রে এই সময় নয় সপ্তাহ, বৃটেনের পত্রিকার জন্য সাত সপ্তাহ ইত্যাদি (দুটোর ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হয়েছে পত্রিকাগুলো জাহাজে আসবে) এতে সব পত্রিকা সম্বন্ধে দীর্ঘ ও সতর্ক লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন থাকে না—কিন্তু একটা অসুবিধা দেখা দেয়। সেটা হচ্ছে যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পত্রিকার ক্ষেত্রে এই ধরণের বাঁধা নিয়ম খাটিয়ে ঠিকমত প্রাপ্তি সপ্তাহ নির্দ্ধারণের চেষ্টা না করে যদি আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকটা পত্রিকার জন্য এই সময়টার বিষয় বিবেচনা করা যায়—তবে অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রকাশ তারিখ আর পাঠানোর তারিখের মধ্যে বেশীর ভাগ পত্রিকায় যে তারতম্য ঘটে সেটাই হয়ত একই সময়ে প্রকাশিত পত্রিকার প্রাপ্তি তারিখের পার্থক্যের কারণ। কোন কোন পত্রিকার বিদেশীগ্রাহকদের জন্য যে কপিগুলি ছাপানো হয় তাতে যে প্রকাশ তারিখ দেওয়া থাকে, তার আগেই সেগুলো ছাপানো হয়ে যায় এমনি কি অনেক সময় পাঠানোও হয়ে যায়; যার ফলে যখন পত্রিকাটা এসে পৌছোয় তখন দেখা যায় যে হয়ত প্রকাশ তারিখের প্রায় সাথে সাথেই আমরা সেটা পাচ্ছি নয়তঃ বা আগেই পেয়ে যাচ্ছি। এ ধরণের ব্যাপার ঘটে বিদেশী পত্রিকার 'উড়োজাহাজ' সংস্করণের ক্ষেত্রে। এরকম পত্রিকার একটা উদাহরণ হচ্ছে 'নিউজউইক' পত্রিকা। টোকিও অফিস থেকে এর দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে প্রকাশকালের চার-পাঁচ দিনের মধ্যে যদি পত্রিকা এসে না পৌছোয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশক বা এজেন্টের

কাছে চিঠি মারফত জানিয়ে দিতে হবে। যদি প্রাপ্তি সপ্তাহের মধ্যে কোন পত্রিকা না এসে পৌঁছোয় তবে পাক্ষিক পত্রিকার ক্ষেত্রে আরও এক সপ্তাহ, মাসিক ও দ্বিমাসিকের ক্ষেত্রে আরও দুই সপ্তাহ, আর ত্রৈমাসিকের ক্ষেত্রে আরও তিন বা চার সপ্তাহ অপেক্ষা করে দেখতে হবে যে তার মধ্যে আসছে সংখ্যাটা কিনা। এর মধ্যেও যদি নির্দিষ্ট সংখ্যাটা না এসে পৌঁছোয় তবে যথাস্থানে চিঠি লিখে ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। প্রাপ্তি সপ্তাহের পরও কিছুদিন অপেক্ষা করার কারণ হচ্ছে যে ছাপা ব্যাপারে দেরী বা ডাকের দেরীর জন্য পেতে দেরী হয় তার জন্যই এই অতিরিক্ত অপেক্ষা। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে এমন হয় যে সংখ্যাটা পাওয়া যায়নি বলে চিঠি দেবার পরই উল্লিখিত সংখ্যা এসে পৌঁছোয়। ওদিকে আবার চিঠির জবাবে প্রকাশক আরেকটা কপি পাঠিয়ে দেন। তখন হয়ত মনে হতে পারে গ্রন্থাগারে একই সংখ্যা দুটো হয়ে যাচ্ছে আর তাছাড়া অকারণে প্রকাশককে বিরক্ত করা হল ; আরও কটাদিন অপেক্ষা করে চিঠি দিলেই দুটো ব্যাপারকেই এড়ানো যেতো। কিন্তু এই চিন্তাকে কখনই যুক্তিযুক্ত বলা যায় না কারণ বেশী দিন অপেক্ষা করে চিঠি দিলে এমনও হতে পারে যে প্রয়োজনীয় সংখ্যার বাড়তি কপি প্রকাশকের কাছে হয়ত আর থাকে না। এটা খুবই সত্যি যে একটা সংখ্যার একটা কপির জায়গায় দুই বা তিনটা কপি মোটেই বাঞ্ছিত নয়, কিন্তু পত্রিকার কোন একটা সংখ্যা গ্রন্থাগারে একেবারে না থাকাটা আরো অনেক বেশী অবাঞ্ছিত। সেজন্য নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষার পর সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি দেওয়া দরকার। 'আজ থাক, সব চিঠিগুলো একসাথে কাল পাঠানো যাবে' এই মনোভাব প্রায়ই নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে।

মোটামুটি প্রাপ্তির সময়টা ঠিক করার জন্যে প্রকাশ-স্থান ছাড়াও আর একটা বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্রকাশ সময় অর্থাৎ কোন সময় পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। একটা মাসিক পত্রিকা মাসের প্রথমে বা মাঝামাঝি বা শেষের দিকে প্রকাশিত হতে পারে। অতএব আমাদের আগে নিশ্চিত হতে হবে যে সাধারণত কখন এটা প্রকাশিত হয়। কোনও কোনও পত্রিকাতে চাঁদার হার ইত্যাদি খবরের সাথে এই খবরটা ছাপা থাকে, কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই আমাদের সেটা জেনে নিতে হবে নিজেদের। সুরুতে দু' একটা সংখ্যার প্রকাশের সময়টা লক্ষ্য করলেই এটা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত দেশীয় পত্রিকার বিষয় কিছু আলোচনা করা যাক। এদের ক্ষেত্রে প্রকাশস্থানের প্রশ্নটা তেমনভাবে দেখা যায় না। তবে প্রকাশের সময়টা এক্ষেত্রে সত্যিই একটা সমস্যা। ভারতীয় পত্রিকার মধ্যে খুব কম পত্রিকাই আছে যেটা প্রতি সংখ্যা প্রায় একই সময়ের ব্যবধানে ছাপা হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে বহু বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা পরিষদের তরফ থেকে প্রকাশিত এমন অনেক পত্রিকা আছে যেগুলো কখনও সময় মত প্রকাশিত হয় না যদিও পত্রিকাগুলোতে মাসিক, ত্রৈমাসিক বা অর্দ্ধবার্ষিক এধরণের নির্দিষ্ট প্রকাশকাল ছাপানো থাকে। মাসিক পত্রিকার ক্ষেত্রে দু'তিনটা সংখ্যার প্রকাশে কিছু দেরী হতেও পারে কিন্তু ত্রৈমাসিক বা অর্দ্ধবার্ষিক পত্রিকার ক্ষেত্রে এ ধরণের নিয়মিত দেরীর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে

১৯৬৩ সালের প্রথমে ১৯৬১ সালের শেষ সংখ্যা কিংবা ১৯৬২র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। সরকার-প্রকাশিত অনেক পত্রিকার মধ্যে মোটামুটি এই ধরণের অর্থাৎ যথাসময়ে না প্রকাশ করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে দেখা দেখা যায় একই সাথে পর পর দু'তিনটা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ অনিয়মিত প্রকাশ গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে কতবড় সমস্যার কারণ হতে পারে সেটা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন।

বিনামূল্যে সহযোগীতার স্মারক-হিসাবে যেসব পত্রিকা পাওয়া যায় সেগুলো সম্বন্ধে প্রায়ই বিভিন্ন সংখ্যা অনিয়মিতভাবে পাওয়ার অভিযোগ শোনা যায়। যদিও অনেকসময় স্থায়ী প্রেরণ তালিকায় (Mailing list) গ্রন্থাগারের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে বলে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ জানান তবু হয়তঃ অসাবধানতা বশতঃ কোনও কোনও সংখ্যা পাঠাতে ভুল হয়। কিছু প্রতিষ্ঠানে আবার কোন স্থায়ী প্রেরণ তালিকা থাকে বলে মনে হয় না কারণ তাঁদের কাছে চিঠি দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গত দু'/তিনটা সংখ্যা পাঠিয়ে দেন, কিন্তু তারপরের সংখ্যার জন্য আবার চিঠি দিতে হয়। এসব পত্রিকার ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান অন্যান্য গ্রন্থাগারে খবর রাখা যে তাঁরা সব শেষ কোন সংখ্যা পেয়েছেন। যদি এভাবে খোঁজ নেওয়ার কোন অসুবিধা থাকে, তবে প্রকাশকাল অনুসারে যে সময়ে পাওয়া উচিত সে সময়ের মধ্যে না পাওয়া গেলে সরাসরি চিঠি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে পত্রিকা বিভাগকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যথাসময়ে পত্রিকার কোন সংখ্যা না পেলে সে বিষয়ে চিঠি লিখে তদারক করা আর সময়মত চাঁদা দেওয়া যাতে পুরানো চাঁদার মেয়াদ আর নতুন চাঁদার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। ভিসিবিল পিরিওডিক্যাল রেকর্ড এই কাজগুলো পুরোপুরি সফলতার সঙ্গে সমাধান করতে পারে না। কোন কোন পত্রিকা যথাসময়ে এসে পৌছোয়নি তার হিসাব করতে হলে পত্রিকা বিভাগের কর্মীদের রেকর্ডারের সবকটা কার্ডই পরীক্ষা করতে হয়। যে গ্রন্থাগারে পাঁচশ বা তারচেয়ে বেশী পত্রিকা রাখা হচ্ছে সেখানে প্রত্যেকটা কার্ড নির্দ্দিষ্ট সময় পর পর পরীক্ষা করা কত সময় সাপেক্ষ হওয়ায় বিরক্তিকরও হয়ে পড়ে। তাছাড়া তাড়াতাড়ি করে কার্ড পরীক্ষা করার সময় যদি কোন একটা পত্রিকা যথাসময়ে না পাওয়ার ব্যাপারটা নজর এড়িয়ে যায় তবে আগামী সপ্তাহের পরীক্ষার সময়ের আগে ব্যাপারটা নজরে পড়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। চাঁদা পাঠাবার সময় হয়েছে কিনা সেটাও সব সময় মনে রাখা সম্ভব নয়। যদিও ভিসিবিল পিরিওডিক্যাল রেকর্ডারে করে চাঁদার মেয়াদ শেষ হবে সেটা লেখা থাকে তবু যখন তাড়াতাড়ি করে পত্রিকা এসেছে কিনা পরীক্ষা করা হয় তখন স্বভাবতই চাঁদার মেয়াদের নজর দেওয়া যায় না। সেজন্য প্রতিমাসে একবার যদি শুধু চাঁদার মেয়াদের ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যায় তবে সবচেয়ে ভাল।

রেকর্ডারে বা রেজিষ্ট্রারে সাধারণত যেভাবে পত্রিকার হিসাব রাখা হয় তার ফলে যে সব অসুবিধা দেখা যায় সেগুলোকে এড়াবার জন্য ১৯৩০ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন এক নতুন ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করেন। এই নতুন

ব্যবস্থায় যথেষ্ট ভাল ফল পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থাই রঙ্গনাথনের থ্রি কার্ড'স সিস্টেম (Three cards system) নামে পরিচিত।

নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই ব্যবস্থাতে প্রত্যেকটি পত্রিকার জন্য তিনটা কার্ড'এর ব্যবহার করা হয়। এগুলো যথাক্রমে রেজষ্ট্রি কার্ড চেক্ কার্ড ও ক্লাসিফাইড ইনডেক্স কার্ড নামে পরিচিত। প্রত্যেক কার্ডে'র চেহারা ও কাজ আলাদা। এবার দেখা যাক কেন কার্ডে'র কি কাজ।

রেজিষ্ট্রি কার্ডে'র কাজ হচ্ছে পত্রিকার যে সব সংখ্যা গ্রন্থাগারে এসে পৌঁছেছে সেগুলোর হিসাব রাখা। এই কার্ডে'র মাপ হচ্ছে সাধারণ ক্যাটালগ কার্ডে'র সমান অর্থাৎ ৫ × ৩ ইঞ্চি। এতে পত্রিকার নাম, সরবরাহকারীর নাম, সরবরাহের জন্য যে চিঠি দেওয়া হয়েছে তার নম্বর আর তারিখ, প্রকাশকাল (অর্থাৎ মাসিক না পাক্ষিক ইত্যাদি), কবে চাঁদা জমা দেওয়া হল আর কতদিনের জন্য, বিলের নম্বর তারিখ ইত্যাদি সব আলাদা আলাদা লিখবার জন্য কার্ডে'র উপরের অংশে নির্দিষ্ট স্থান আছে। কার্ডে'র বাকী অংশটায় চৌকো চৌকো ঘর কাটা থাকে। এখানে ঘরগুলিতে যথাক্রমে পত্রিকার বর্ষ, সংখ্যা, প্রকাশ তারিখ আর প্রাপ্তি তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়। এই কার্ড'গুলো পত্রিকার নামানুসারে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো থাকে। এই কার্ড'গুলোর সাথে ভিসিবল পিরিওডিক্যাল রেকর্ডিংএর কার্ডে'র তুলনা করা চলে। যে সব গ্রন্থাগারে এতদিন ভিসিবল রেকর্ডে'র পত্রিকার হিসাব রাখা হচ্ছিল, সে সব গ্রন্থাগারে যদি থ্রি কার্ডস ব্যবস্থায় নতুন করে হিসাব রাখার কাজ সুরু করা যায় তবে তখনকার মত রেজিষ্ট্রি কার্ড না ব্যবহার সুরু করে রেকর্ডা'র দিয়েই তার কাজটা চালানো যেতে পারে। পরে যখন সুবিধা হবে তখন রেজিষ্ট্রি কার্ড নতুন করে করা যেতে পারে যদি সেটা করা দরকার মনে হয়।

রঙ্গনাথন উপহার হিসাবে নিয়মিত পাওয়া পত্রিকাগুলোর জন্যে রঙ্গীন কার্ড ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা ভিসিবিল রেকর্ডা'রে রেজিষ্ট্রি কার্ডে'র কাজ চালান তারা কয়েকটা রঙ্গীন কার্ড ব্যবহার করেন পত্রিকার প্রকাশকাল অনুসারে। যাই হোক, চাঁদার মাধ্যম ছাড়া পাওয়া পত্রিকাগুলোর জন্য এমন কোন কোন কার্ড ব্যবহার করা উচিত যেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পত্রিকার কার্ডে'র থেকে আলাদা বলে চেনা যায়। তার জন্য রঙ্গীন কার্ড বা অন্য কোন চিহ্নযুক্ত কার্ড ব্যবহার করাটা ব্যবহারকারীর সুবিধার উপর নির্ভর করে।

চেক কার্ডে'র কাজ হচ্ছে যেসব পত্রিকা যথাসময়ে গ্রন্থাগারে এসে পৌঁছায়নি সেগুলো সম্বন্ধে গ্রন্থাগারকর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। থ্রি কার্ড'স ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ ইহচ্ছে এ কার্ড। ভিসিবিল পিরিওডিক্যাল রেকর্ডা'রের কোন অংশই এই চেক কার্ডে'র কাজ এত সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারে না। থ্রি কার্ডে'র সাফল্যের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে এই কার্ড। এখানেও কার্ডে'র মাপ হচ্ছে ৫ × ৩ ইঞ্চি এতে পত্রিকার নাম, প্রকাশকাল, আনুমানিক প্রাপ্তি তারিখের পর অতিরিক্ত কতদিন অপেক্ষা করা যেতে পারে ইত্যাদি লেখার জন্য স্থান নির্দিষ্ট আছে। কার্ডে'র বাকী অংশটা লম্বালম্বিভাবে কয়েকটা ভাগ করা

থাকে। এখানে পত্রিকার বর্ষ, সংখ্যা, সাম্ভাব্য প্রাপ্তি তারিখ, সরবরাহকারীর কাছে কোন সংখ্যা না পাওয়া সম্বন্ধে পাঠানো চিঠির তারিখ লেখার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকটি পত্রিকার জন্য একটি করে চেক কার্ড করা থাকে। সব চেক কার্ডগুলো একটা ট্রেতে রাখা থাকে। এই টেতে চেক কার্ড ছাড়া বাহান্নটা গাইড কার্ড থাকে। বাহান্ন সপ্তাহে এক বছর। বছরের এক একটি সপ্তাহের জন্য থাকে এক একটি গাইড কার্ড। সবচেয়ে প্রথম ঠিক করে নেওয়া হয় সপ্তাহের কোন দিনকে সপ্তাহের শেষ দিন ধরা যায়। সপ্তাহের শেষ দিন শনিবার ধরলে কয়েকটী অসুবিধা আছে। তারমধ্যে প্রধান হচ্ছে যে, যে সব পত্রিকা ঐ সপ্তাহের মধ্যে পৌছানো উচিত ছিল সেগুলো না পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশককে জানানোর সময় হাতে থাকে না তাই বুধবার বা বৃহস্পতিকে সপ্তাহের শেষদিন বলে ধরাটা সুবিধাজনক। তার ফলে ২।৩দিন সময় পাওয়া যায় চিঠি পত্র দেবার জন্য। ধরা যাক বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ দিন ধরা হল ; তাহলে গাইড কার্ডের ইনডেক্সে প্রথম বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার এমনি করে প্রত্যেকটার লেখা থাকে। যে বৃহস্পতিবারের মধ্যে পত্রিকার যে সংখ্যাটি এসে পৌছানোর কথা তারই গাইড কার্ডের পিছনে কার্ডগুলো রাখা হয়।

কোন একটা সংখ্যা না পেয়ে প্রকাশকের কাছে চিঠি দিলে, চিঠির তারিখ, কোন সংখ্যার জন্য চিঠি দেওয়া হল, কত তারিখের মধ্যে সংখ্যাটি পাওয়া উচিত ছিল এসব খবরগুলো যথাযথ সারিতে লিখে রাখা হয়। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম চিঠির পরও দ্বিতীয় আরেকটা চিঠি লেখার দরকার হয়ে পড়ে। মনে হয় দেশীয় প্রকাশকদের ক্ষেত্রে দু' সপ্তাহ আর বিদেশীদের ক্ষেত্রে তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে যদি কোন খবর বা প্রয়োজনীয় সংখ্যাটা না পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় চিঠিটা পাঠানো যেতে পারে। সাধারণত এই চিঠিগুলো ছাপানোই থাকে, শুধু পত্রিকার নাম আর প্রয়োজনীয় সংখ্যাটা জায়গামত টাইপ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম আর দ্বিতীয় চিঠির মধ্যে বক্তব্যের কোন পার্থক্য থাকার দরকার হয় না, শুধুমাত্র দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে সেটার আগের চিঠির তারিখ আর 'দ্বিতীয় চিঠি' এই কথাটা উল্লেখ করা থাকলেই চলতে পারে। এই ধরণের দ্বিতীয় বা তৃতীয় চিঠির হিসাব রাখার জন্য কার্ডে আগে যে কটা সারির (column) কথা বলা হয়েছে সেটা ছাড়াও আরো তিনটে সারির দরকার হবে। এগুলোতে যথাক্রমে দ্বিতীয় আর তৃতীয় বা শেষ চিঠির তারিখ লেখা হবে। তৃতীয় সারিতে প্রাপ্তি তারিখ লেখার ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য এই তারিখটা রেজিষ্ট্রি কার্ডেই পাওয়া যায় তাই চেককার্ডে এর খুব বেশী নয়, তবু কবে কবে চিঠি দেওয়া হয়েছিল আর কবে তার জবাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যাটা পাওয়া গিয়েছিল এই সবগুলি তারিখই চট্ করে পাওয়া যেতে পারে যদি প্রাপ্তি তারিখ চেক্ কার্ডে থাকে। এবারে চেক্ কার্ড কিভাবে একটা গাইড কার্ডের পর থেকে অন্য গাইড কার্ডের পিছনে চলে যায় সেটা দেখা যাক। একটা চেক কার্ড যে গাইড কার্ডের পরে থাকে সে সংখ্যাটা যদি সে সপ্তাহে না আসে তবে কার্ডটা আগামী সপ্তাহের গাইডকার্ডের পরে রেখে দেওয়া হয় শুধু আনুমানিক প্রাপ্তি সপ্তাহটা যথাস্থানে লিখে। এভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে এক সপ্তাহ পিছিয়ে যাবে। এই ভাবে সে পত্রিকার

জন্য অনুমোদিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে যদি সংখ্যা না আসে তবে সাথে সাথে প্রকাশকের কাছে চিঠি দিয়ে সেই চিঠির তারিখটা যথাস্থানে লিখে আগামী সংখ্যার আনুমানিক প্রাপ্তি সপ্তাহের গাইড কার্ডের পরে রাখা হয়। যদিও চেককার্ডে প্রথম চিঠির তারিখ লেখা থাকছে তবু যেহেতু যে সব পত্রিকার জন্য অনুরূপ চিঠি যাচ্ছে সেগুলোর কার্ড নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকায়, কবে দ্বিতীয় চিঠি দেবার সময় হচ্ছে সেটার হিসাব রাখা অসুবিধা। এর সমাধান করা যেতে পারে যদি দুটো ফাইল খোলা হয় যাতে এই চিঠিগুলোর কপি একটা করে তারিখ অনুসারে ফাইল করা হয়। প্রথম ফাইলটাতেরাখা হবে দেশীয় পত্রিকা সম্বন্ধীয় আর দ্বিতীয়টাতে বিদেশী পত্রিকা সম্বন্ধীয় চিঠিগুলো। এভাবে তারিখ অনুসারে সাজানো থাকায় শুধু সপ্তাহে একদিন চিঠিগুলো পরীক্ষা করে দেখলেই হবে যে কোনও পত্রিকার জন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় চিঠি পাঠাইবার সময় হয়েছে কিনা। একসাথে সব চিঠি থাকায় এই কাজ বেশী সময় লাগার কথা নয়। চিঠির জবাবে যখনই সংখ্যাটা আসবে, সেটার প্রাপ্তি তারিখ চেক কার্ডে যগন লেখা হবে তখনই সেখানে থেকে চিঠির তারিখটা দেখে নিয়ে চিঠির উপরে প্রাপ্তি সংবাদটা লিখে রাখলে সংখ্যা পাবার পর ভুলবশতঃ আর চিঠি দেবার সম্ভাবনা থাকবে না।

ক্লাসিফাইড ইনডেক্স কার্ড অর্থাৎ তৃতীয় কার্ডের মূল কাজ হচ্ছে কোন্ বিষয়ে কটা আর কি কি পত্রিকা গ্রন্থাগারে আছে সেটার সম্পূর্ণ একটা হিসাব রাখা। তাছাড়াও এই কার্ড থেকে আরও যে সব খবর জানতে পারা যায় তার মধ্যে আছে কোনও একটা পত্রিকা কোন সংখ্যা থেকে গ্রন্থাগারে রাখা হচ্ছে, পত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে কিনা, প্রকাশকের নাম, পত্রিকা কার মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে ইত্যাদি। নামেই বোঝা যায় যে কার্ডগুলেলোতে পত্রিকার বর্গীকৃত নম্বর থাকে। কার্ডগুলো এই নম্বর অনুসারেই সাজানো থাকে। এ কার্ডের মাপ অন্য দুটোর মতই। তিনটে কার্ড তিনটে বিভিন্নভাবে সাজানো থাকায় কোন বিশেষ পত্রিকা গ্রন্থাগারে আসে কিনা, কবে থেকে আসছে বা কোন বিশেষ বিষশে কটা পত্রিকা আসে ইত্যাদি সব প্রশ্নেরই উত্তর সহজে দেওয়া যেতে পারে।

নতুন কোন পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য চাঁদা পাঠানো বা চিঠি লেখা হলেই একটা রেজিষ্ট্রি কার্ড করে রাখা উচিত। তবে সে কাডটা একটা আলদা ট্রেতে রাখা উচিত, পরে প্রথম সংখ্যা গ্রন্থাগারে এসে পৌছালেই এ কার্ডটা রেজিষ্ট্রি কার্ডের ট্রেতে রেখে দেওয়া হবে। আগে কার্ড করা থাকলে সুবিধা এই যে, গ্রাহক হওয়া সত্ত্বেও এখনও কোন পত্রিকা পাওয়া যাচ্ছে না সেটা চট্ করে জানা যাবে আর সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

যদি কোন সংখ্যা পাওয়ার পর দেখা যায় যে তার কোন পাতা ছোড়া বা একটা পৃষ্ঠার সঙ্গে আর একটা পৃষ্ঠা প্রায় জুড়ে গেছে ইত্যাদি কোন খুঁত আছে তবে সে বিষয় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশকের কাছে চিঠি দিতে হবে যাতে তারা একটা ভাল কপি পাঠাতে পারে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে এ ব্যাপারে অনেকের একটা কুঁড়েমি থাকে অর্থাৎ তাদের মতে যখন পত্রিকাটা এসে পৌঁছেছে তখন "এ সব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে" আবার চিঠি লেখার

ঝামেলা করা কেন। কিন্তু এই মনোভাব ত্যাগ করা উচিত কারণ যেসব ক্ষেত্রে পত্রিকা-গুলো বাঁধিয়ে রাখা হয় সে ক্ষেত্রে হয়ত পরে যখন ঐ বিশেষ সংখ্যার সেই পৃষ্ঠার দরকার হবে তখন যথেষ্ট অসুবিধা হবে পাঠকদের। যেখানে বাঁধিয়ে রাখা হয় না সেখানেও যথেষ্ট অসুবিধা হবে পাঠকদের তবে পাঠকের সংখ্যা আগের ক্ষেত্রের তুলনায় হয়ত কিছু কম। পাঠকের জন্যই যখন গ্রন্থাগারের এত আয়োজন তখন নিজের কুঁড়েমির জন্য পাঠকের অসুবিধা করা মোটেই বাঞ্ছিত নয়।

অনেক সময় প্রকাশক হয়ত সামান্য ভুল ঠিকানায় পত্রিকাটা পাঠানোর জন্য পেতে অসুবিধা হয়। তাই প্রত্যেক পত্রিকার আবরণী বা খামের ওপর যে ঠিকানা ছাপা থাকে সেটা ঠিক আছে কিনা লক্ষ্য করা উচিত। যদি কোন ভুল চোখে পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ঠিকানা জানিয়ে প্রকাশককে সেই ঠিকানায় পত্রিকা পাঠাতে অনুরোধ করতে হবে।

থ্রি কার্ডস ব্যবস্থার সবচেয়ে অসুবিধা এই যে প্রথম প্রথম যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। মোটামুটি ঠিকভাবে চালু হতে তিন থেকে ছ'মাস সময় লাগে। অনেকের মতে এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। একই কাজ দুবার করার জন্য অর্থাৎ একই পত্রিকার জন্য একাধিক কার্ড করে বা পত্রিকা পাওয়ার পর চেক কার্ড পরবর্তী আনুমানিক প্রাপ্তি সপ্তাহে সরানো, রেজিষ্ট্রি কার্ডএ প্রাপ্তির তারিখ ইত্যাদি লেখা যেগুলো অন্যান্য ব্যবস্থায় এতটা সময় সাপেক্ষ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুবিধাজনকভাবে কাজটা সহজে সারবার সহায়ক হিসাবে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পত্রিকা পাওয়ার পর বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কোনও কোনও গ্রন্থাগারে পত্রিকা এলেই সেটাতে গ্রন্থাগারের ছাপাসহ আনুষঙ্গিক কাজগুলো সেরে নিয়ে সরাসরি ঐ বিষয়ের অধ্যাপক বা গবেষক যিনি বা যাঁরা সে পত্রিকাটি দেখতে চান তাঁদের টেবিলে দেখবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যে সব গ্রন্থাগারে পত্রিকার সংখ্যা অনেক আর পত্রিকাগুলো সম্বন্ধে 'উৎসাহী' গবেষকের সংখ্যাও মোটামুটি বেশ কিছু সেখানে এই ধরণের রীতি অনুসরণে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দেয়। সাধারণতঃ গবেষকরা তাঁদের গবেষণার ব্যাপার ছাড়া আর সব দৈনন্দিন কাজকর্মে একটু উদাসীন হয়ে থাকেন। সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় এদের টেবিলের পৌছানোর পর চট্ করে কখনই পত্রিকাগুলো ফেরৎ আসে না। সময় সময় খোঁজ করে তাদের কাগজের গাদার নীচে থেকে উদ্ধার করে আনতে হয়। এজন্য ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু ভাল করে ভেবে দেখা উচিত। যদিও এই ভাবে পাঠাবার পর পত্রিকাগুলো সবই ফেরৎ আসে দেরীতে হলেও তবু যদি কোন ক্ষেত্রে কোন একটা সংখ্যা ফেরৎ না আসে তবে সে ক্ষেত্রে আরেকটা কপি সংগ্রহ করা প্রায়ই খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। অথচ কোন একটা সংখ্যা ফেরৎ না আসার সম্ভাবনাটা যে খুব কম থাকে তা নয়।

এই অসুবিধাজনক সম্ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কোনও কোনও গ্রন্থাগারে পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক পুস্তিকা (Bulletin) প্রকাশ করা হয়। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সব পত্রিকা গ্রন্থাগারে এসেছে তার বর্গীকৃত সটীক (anotated classified) প্রবন্ধ তালিকাই এই বুলেটিনের বিষয়বস্তু। এই তালিকা দেখে যদি কোন নির্দিষ্ট প্রবন্ধ সম্বন্ধে আগ্রহ থাকে সেটা গ্রন্থাগারে জানালে প্রয়োজনীয় সংখ্যাটা দেখবার জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে খুব সীমিত সংখ্যক পত্রিকাই অধ্যাপকদের বা গবেষকদের কাছে যায়। পাঠাবার সময় কোন একটা খাতায় কবে, কার কাছে, কোন পত্রিকার কোন সংখ্যাটা পাঠানো হল সেটা লিখে রাখলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরৎ না এলে খোঁজ নেওয়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় একটা বড় অন্তরায় হচ্ছে এই যে প্রত্যেক প্রবন্ধ পড়ে সেটার টীকা সহ বর্গীকরণের জন্যে একজন বা দুজনকে সাড়া সপ্তাহ কাজ করতে হয়। আমাদের

দেশে যেখানে যথাসম্ভব কম সংখ্যক কর্মী দিয়ে গ্রন্থাগারের কাজ চালানোর একটা প্রবণতা আছে অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণে, যেখানে পত্রিকা বিভাগে এই কাজের জন্য দুজন কর্মী নিয়োগ প্রায় অসম্ভব! এছাড়াও স্বভাবতই এ কাজের জন্য প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞান থাকা প্রয়োজন নতুবা উচ্চতর চিন্তাসম্বলিত প্রবন্ধগুলির সঠীক বর্গীকরণে অসুবিধা হবে।

গ্রন্থাগারে পত্রিকার জন্যে যদি আলাদা বড় পাঠকক্ষ থাকে তবে এ সমস্যার সবচেয়ে সহজ আর ভাল সমাধান করা চলে। এই পাঠকক্ষে সব পত্রিকার (স্থানাভাবে প্রধান প্রধান পত্রিকার) সবচেয়ে নতুন সংখ্যা প্রদর্শনের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়। নিজ নিজ অবসরমত উৎসাহী পাঠকরা এখানে এসে পত্রিকাগুলো দেখে যেতে পারেন। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এগুলো এখানে রাখা হয়। তারপর যদি কেউ পড়তে চান তবে তাঁর কাছে সংখ্যাটা পাঠান হবে নয়ত পুরোনো সংখ্যার সাথে এটাও সেলফে চলে যাবে। যেখানে গ্রন্থাগার মূল গবেষণার বা প্রতিষ্ঠান থেকে বেশী দূরে থাকে সেখানে অবশ্য এই ব্যবস্থাতে তেমন সুফল পাওয়া পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে যদি যথেষ্ট যত্ন নিয়ে এই ব্যবস্থা চালু করা যায় তবে সমস্যার ভাল সমাধান করা যায়। হয়ত প্রথম প্রথম খুব কম পাঠকই পাঠকক্ষে এসে পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করবে কিন্তু যখন নিজের দরকারে দু'একবারে যখন পাঠকক্ষে আসতে হবে তখন আস্তে আস্তে সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। কেউ হয়ত বলতে পাবেন যে এই ব্যবস্থার ফলে তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই এই অভিযোগ শোনা যাবে কারণ এখানে তাঁরা তাঁদের নিজের প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ কিছু প্রকাশিত হয়েছে কিনা সেটাই শুধু দেখতে আসবেন। যদি দরকারী কিছু দেখতে পান তবে পত্রিকা বিভাগের কর্মীকে সে বিষয় জানিয়ে প্রত্রিকাটি যথাসময়ে তার কাছে পাঠাতে অনুরোধ করতে পারেন। এতে খুব বেশী একটা সময় লাগবার কথা নয়।

বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারে দেখা যায় পত্রিকাগুলো নাম অনুসারে বর্ণানুক্রমিক ভাবে প্রদর্শনের জন্য সাজানো হয়। বিশেষ গ্রন্থাগারে বোধ হয় এ-রকম বর্ণানুক্রমিকভাবে না সাজিয়ে বিষয় অনুসারে সাজানো হলে বোধ হয় ভাল হয়। এর ফলে পাঠকেরা শুধু তার নিজের বিষয়ের পত্রিকাগুলো আর কয়েকটা সাধারণ পত্রিকা (যে-গুলো কোন একটা বিশেষ বিষয়ের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করে) তাড়াতাড়ি দেখে নিতে পারেন সেগুলো কাছাকাছি থাকাতে। বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো থাকলে একই বিষয়ের পত্রিকাগুলো হয়ত শুধু নামের জন্যেই অনেক তফাতে ছড়িয়ে থাকে।

পত্রিকার এত সব সমস্যার সাথে আরও একটা সমস্যা আছে। সেটা নিয়ে হাজির হন হিসাব পরীক্ষক বা অডিটর। দোষ অবশ্য মোটেই তাদের নয়, দোষ হচ্ছে তাঁদের কাজের, তাঁরা অনেক সময় পত্রিকার কার্ডে রাখা হিসাব ছাড়াও প্রত্যেক পত্রিকায় কোন নম্বর (পরিগ্রহণ সংখ্যা অর্থাৎ একসেশন নম্বরের মত) দেওয়া আছে কিনা দেখতে চান; যদি না থাকে তবে কেন নেই ইত্যাদি জানতে চান। বছরের শেষে বাঁধানোর পর যেহেতু পরিগ্রহণ করা হয় সেজন্য আগের থেকে ও ধরণের কোন নম্বর প্রত্যেক সংখ্যায় দেওয়া যায় না। প্রত্যেকটা পত্রিকায় যদি গ্রন্থাগারের শীলমোহর দিয়ে বর্গীকরণের নম্বর দিয়ে দেওয়া হয় তবে তাতেই এঁদের সব জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া যেতে পারে। পত্রিকা গ্রন্থাগারে পৌছানোর পর যখন সেটার প্রাপ্তি রেজেষ্ট্রি, কার্ডে লেখা হয় তখনই পত্রিকার যে পৃষ্ঠায় সূচী আছে সেখানে অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে এই গ্রন্থাগারের ছাপ আর বর্গীকরণ নম্বরটা লিখে দেওয়া উচিত।

গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য পুস্তক

1s : 2381—1963. **Recomendations for bibliogaphic reference.** Indian Standards Institution.

কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার সময় সেই বিষয় সম্বন্ধে পূর্বসূরীদের মতামত বা মন্তব্যের উল্লেখ করবার প্রথা অনেকদিনের।

এই বক্তব্যের সূত্র সাধারণতঃ সেই পৃষ্ঠায় পাদটীকায় উল্লেখ করা হয় অথবা প্রবন্ধের শেষে পঞ্জী রূপে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে পাঠক এই সূত্র থেকে পত্র পত্রিকা অথবা পুস্তক .পুস্তিকা সংগ্রহ করে আরো অধিক তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারেন। এই সূত্র উল্লেখ করবার বিভিন্ন ধরণের প্রথা প্রচলিত আছে। অনেক পত্র পত্রিকা নিজ নিজ মান নির্ধারণ করে লেখকদের তা অনুসরণ করবার নির্দেশ দেন। ফলে একই লেখক যখন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পাঠান তখন তাকে সেই সমস্ত পত্রিকার বিভিন্ন ধরণের মান অনুসরণ করতে হয়। আবার পাঠকরাও এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হিমসিম খেয়ে যান।

এখানেও সঙ্গতির অভাব। কয়েকটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্র পত্রিকা থেকে এই অসঙ্গতি ও বৈচিত্র্যের কতগুলি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল :

1. Journal of Chemical Society.

Brown and Jungk, J. Chem. Phys. 1938, 6, 711. [লেখকের কেবল অন্তঃনাম, পত্রিকার সংক্ষিপ্ত নাম, বৎসর, খণ্ড সংখ্যা, যে পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটি সুরু হয়েছে।]

2. Journal of American Chemical Society.

D. W. Moore, Z. Natur forsch, 15,682 (19c0).

3. Nature. Journal of American Chemical Society-র অনুরূপ, তবে লেখকের অন্তঃনাম আগে পরে আগু নামের সংক্ষিপ্ত রূপ।

4. Indian Journal of Chemistry (এবং ভারতবর্ষের C. S. I. R. প্রকাশিত সমস্ত পত্রিকা) Ramachandran, B.V., Trans, Faraday Soc., 57 (1961), 425.

5. Journal of Indian Chemical Socity.

Mnkherjee, J. Sci. Ind. Res, 1960, 19B, 94.

পত্র পত্রিকা ব্যতীত পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সূচী (Index to Periodical Literature) অথবা সারাংশ সম্বলিত সূচী-(abstracts) তেও এ অনুরূপ বিভিন্নতা আছে। যে সমস্ত পত্র পত্রিকায় খণ্ড সংখ্যা থাকে না (যেমন Journal of the Chemical Society) এবং যে সমস্ত পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক পৃষ্ঠা সংখ্যা থাকে, তাদের উল্লেখ করবার প্রথাও বিভিন্ন ধরণের। পুস্তকের অংশ বিশেষ এবং পেটেন্টের উল্লেখের ব্যাপারেও তেমনি সমস্যা আছে।

আন্তর্জাতিক মানক সংস্থা (Internation Organization for Standardiziation [150]) এই ব্যাপারে একটি পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা করেছেন ১৯৫৮ এবং IS0/R 77-1958 সংখ্যক মানে তাদের সুপারিশ সমূহ প্রকাশ করেছেন।

সম্প্রতি ভারতীয় মানক সংস্থা এই সম্বন্ধে একটি মান প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সুপারিশ মুখ্যতঃ দুভাগে বিভক্ত : (১) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্র (২) প্রবন্ধ সূচী (index) এবং সারাংশ (abstracts) উল্লেখিত সূত্র।

উভয় ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে সম্পূর্ণ পুস্তক এবং পত্রপত্রিকা উল্লেখের পদ্ধতি, পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধ, পুস্তকের অংশ বিশেষ এবং পেটেন্টের উল্লেখের পদ্ধতি সম্বন্ধে সুপারিশ আছে।

—o—

সম্পাদকীয়

ছাত্রদের পাঠপ্রবৃত্তি সঞ্চার

স্কুলের বছর শেষ হ'ল। এখন থেকে মাসখানেক মাস দুই ছেলেদের স্কুলের পড়ার বিশেষ চাপ থাকবে না। এই সময়টা অনেকের কাছেই শেষের দিকে ভার হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেরা বাধ্য হ'য়ে শেষে তাস পাশার আশ্রয় নিয়ে সময় কাটায়। তাস পাশার এই রকম ব্যবহারের ফলে এ-গুলো আর বিনোদ থাকে না, ব্যসন হ'য়ে দাঁড়ায়; আর শেষে কু-অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। গ্রন্থাগারিকেরা এই সময় একটু সক্রিয় হ'লে ছেলেদের মধ্যে ভাল পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি ক'রে তাদের অশেষ উপকার করতে পারেন।

প্রত্যেক ছেলের মধ্যেই নেতৃত্ব করবার গোপন স্পৃহা আছে। তাদের দিয়ে যদি পাঠচক্র বা আলোচনা সভা গড়িয়ে নেবার চেষ্টা করা হয় তা'হলে তাদের ঐ নেতৃত্বস্পৃহাকে একটা ভাল কাজে লাগান যেতে পারে। গ্রন্থাগারিক কয়েকজন ছেলের একটা ছোটখাট দল এই রকমভাবে তৈরী করিয়ে নিতে পারলেই তাদের সার্থক পড়াশুনোর দিকে এগিয়ে নিতে পারবেন। সাপ্তাহিক বা পক্ষান্তিক আলোচনা-চক্রের জন্য ভাল বিষয় নির্বাচন করতে পারলে বিষয়-বিশেষে অভিজ্ঞতা লাভের উৎসাহ বোধ করবে। গ্রন্থাগারে সেই বিষয় সম্বন্ধে কয়েক খানা বই সংগ্রহ ক'রে ছেলেদের গোচরে আনতে পারলেই সেই বইগুলো পর্য্যায়ক্রমে পড়া হ'য়ে যাবে।

অবশ্য পাঠচক্র বা আলোচনা-চক্রের প্রতি ভাল ছেলে ছাড়া আর কেউ বিশেষ উৎসাহ বোধ ক'রবে না। সাধারণকে আকৃষ্ট ক'রতে হ'লে গল্পের বই দিতে হবে কিশোরদের কাছে দুঃসাহসিক অভিযান বা ডিটেক্‌টিভ উপান্যাসের আকর্ষণ খুব বেশী। সাধারণ অবস্থায় স্কুল খোলা থাকলে অনেক অভিভাবক ছেলেদের ঐসব বই পড়া পছন্দ করেন না। কিন্তু পরীক্ষা হ'য়ে গেলে ছেলেরা যদি তাঁদের অপছন্দের কয়েকখানা বই ছাড়া অন্য বই প'ড়তে চায়, তাঁরা সাধারণতঃ বাধা দেন না। যাই হোক বাইরের বই না পড়া পযন্ত ছেলেদের তাড়াতাড়ি পড়ার অভ্যাস হয় না—তারা স্বাধীনভাবে প'ড়তে শেখে না—আনন্দের জন্য প'ড়তে অভ্যস্ত হ'তে পারে না। বলা বাহুল্য ছেলেদের আনন্দের জন্য প'ড়তে অভ্যস্ত ক'রতে পারলে গ্রন্থাগারিক অনেকটা আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে পারবেন।

স্কুল-বছরের সমাপ্তির এই সময়ে গ্রন্থাগারিকদের দৃষ্টি তাই এদিকে আকর্ষণ করছি।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

ত্রয়োদশ বর্ষ | অষ্টম সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১৩৭০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৩শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ : ১৩৭০ [৮ম সংখ্যা

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

কলেজ-গ্রন্থাগার পরিচালনা

বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের মধ্যে কলেজ গ্রন্থাগারের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। জাতির নেতৃত্ব যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই কলেজের মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। কলেজের শিক্ষা গ্রহণের সময় হইতেই তাঁহাদের গভীরতর জ্ঞান লাভের অবকাশ ঘটিয়া থাকে। স্বাধীন চিন্তা, পাঠ্য বিষয়-সমূহ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানলাভ, পারস্পরিক আলোচনার সাহায্যে নিজেদের বিচার শক্তির উন্নয়ন এই সমস্তই কলেজ জীবনে আরব্ধ হয়। বস্তুতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত পাঠকের যেন শিক্ষানবীশ কাল। জ্ঞান-সরোবরে সাঁতার কাটিবার জন্য তাহাকে ততদিন শিক্ষা লইতে হইতেছে। অবলম্বনের সাহায্যে আগড় দেওয়া অংশের মধ্যে তাহাকে বিচরণ করিতে হয়। বিস্তৃততর দেশে আপন ইচ্ছায় যে আপন শক্তিমাত্রের নির্ভর করিয়া যাইবার স্বাধীনতা তাহাকে দেওয়া হয় না। কলেজে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে আসিলে তাহার এই বন্ধন কাটিয়া যায়। সে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তাহাকে অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগের অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে।

কিন্তু কলেজে প্রবেশের সময়েই সকল ছাত্রের বুদ্ধি পরিণত হইয়া যায় না। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত যে নিষেধের বেড়া তাহাকে ঘিরিয়া রাখিত তাহা উঠাইয়া দিলে অনেক ক্ষেত্রেই সে সঠিক চলার পথে পা না বাড়াইয়া ভ্রান্ত পথিক হইয়া পড়ে। উচ্চতর শিক্ষার আকর্ষণ অপেক্ষা নানাবিধ প্রলোভন তাহাকে প্রলুব্ধ করে। ছাত্রসমাজের মধ্যে অনেককেই কেন জানি না, অনেক সময়ই পড়াশুনা করি এ-কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত দেখা যায়। এবং এই কুণ্ঠাই তাহাদিগকে অবাঞ্ছিত নানা বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করে, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত করে, ফল কথা, বিভ্রান্ত করে।

আমার এই কথা বলার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে কলেজ-জীবনে ছাত্রদিগকে পাঠ্য-পুস্তক-সর্বস্ব জ্ঞানের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে হইবে। বরঞ্চ অবসর যাপনের সুষ্ঠু পদ্ধতি এই সময়েই ছাত্রকে আবিষ্কার করিতে হইবে। আপন আপন যোগ্যতা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাহাকেও বা লেখাপড়া, কাহাকেও বা সঙ্গীত, কাহাকেও বা জনসেবা, কাহাকেও বা বাগান করা বা অন্যবিধ বিনোদ ও ব্রত বাছিয়া লইতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেই হয়ত ইহার আরম্ভ। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার সময়েই ইহার ক্রম-পরিণতি হওয়া আবশ্যক। খেলাধুলা, খোস-গল্প বা নিদ্রা কর্মক্লান্ত মানুষকে পুনরায় কর্মক্ষম করিবার জন্যই অবলম্বিত হওয়া উচিত। ঐগুলি ব্যতীত অবসর বিনোদনের অন্য পন্থা যদি মানুষ খুঁজিয়া না পায়, তবে অত্যন্ত কার্যব্যস্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেরই জীবন ভারস্বরূপ হইয়া উঠে মাত্র। সুতরাং কলেজ জীবনে পাঠ্যপুস্তক পড়া ছাড়াও আমাদিগকে উপযুক্ত নাগরিক হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সঠিক বৃত্তির যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে এবং অবসর কাল যথোপযুক্তভাবে যাপনের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য উপরের কর্তব্যগুলি পাঠ্য পুস্তক মাত্রের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া সম্পন্ন করা যায় না। আমি পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্বের অপলাপ করিতে চাহি না। এ-কথা কে না জানে—ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষায় ভাল ফল করার উপরই ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি আমাদের জীবনের অন্যতম প্রধান পাথেয়। কিন্তু বৃত্তি নিরূপিত হইবার পর সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য পাঠ্য পুস্তকের নিকট হইতে আমরা যে সাহায্য পাই তাহার প্রভাব যথেষ্ট সীমিত। এইখানেই প্রয়োজন বহু বিষয়ের সহিত পরিচয় ও আপন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা। বলা বাহুল্য পাঠ্য-পুস্তকমাত্র হইতে এই দুইটির কোনটিই যথেষ্ট পাওয়া সম্ভব নয়।

আমার বিবেচনায় কলেজীয় শিক্ষার প্রধান অবদান শিক্ষকের শিক্ষা নহে, নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকও নহে—বিভিন্ন বিচিত্র চিন্তার সঙ্গে পরিচিতির সুযোগ। শিক্ষকের নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার মূল্যও যেমন কম নহে, সঙ্গীদের চিন্তাধারা হইতে আমরা যে অনুপ্রেরণা লাভ করি তাহার প্রভাবও তেমনই নগণ্য নহে। কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আলোচনা-চক্র, নানাবিধ বিষয়ের সহিত পরিচয়ের মত সহজ ভাষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এইগুলি হইবে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের সিংহদ্বার। প্রত্যেক ছাত্রই আপন আপন রুচি অনুযায়ী সঙ্গী নির্বাচন করিয়া থাকে এবং পরস্পরের আলোচনার মধ্য দিয়া আপন আপন চিন্তাধারাকে পরিণত করিয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থা জ্ঞান অর্জনের, স্বাধীন চিন্তার ক্রম পরিণতির, বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের পশ্চাৎ দ্বার, এইগুলি রুচি ও প্রয়োজন মত অনেকে ব্যবহার করে—অনেকে এইগুলি ঠিক্ মত গড়িয়া তুলিতে পারে না। তাই শিক্ষার কর্তৃপক্ষদের সকলের জন্য সিংহদ্বার খুলিয়া রাখিতে হইবে, নির্বাচিত বিষয়সমূহের মধ্যে ছাত্রদের জ্ঞান নিবদ্ধ না থাকিয়া বহু বিষয়ে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

কলেজীয় শিক্ষার যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা উপরে বর্ণিত হইল ইহার সহিত একমত হইতে পারিলে এই শিক্ষায় গ্রন্থাগারের স্থান ও প্রভাব নিরূপণ করা খুবই সহজ হইয়া যাইবে। ডিগ্রী-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে জ্ঞান-কেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিণত করিতে পারিলে ছাপ সর্বস্ব শিক্ষাকে বিকাশ-মূলক শিক্ষায় রূপান্তরিত করিতে কলেজ ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব যে অপরিসীম ইহা দ্বন্দ্বাতীত হইয়া উঠিবে। আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারগুলি অবহেলিত, কেন না ছাত্রের জ্ঞান অপেক্ষা, চিন্তাশক্তি অপেক্ষা অন্যবিধ যোগ্যতা অপেক্ষা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপকে সমধিক প্রাধান্য দিয়া থাকি। সুতরাং ছাত্রেরাও নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক, নোট, প্রশ্নোত্তর ব্যতীত কিছুর প্রতি আগ্রহান্বিত নহে। পাঠ্য পুস্তক প্রভৃতি চিন্তাশক্তির স্বাধীন বিচারের সহায়ক না হইয়া স্বয়ং প্রধান হইয়া গিয়াছে। কারণ যেখানে কার্যে পরিণত হয় সেইখানের বিড়ম্বনা তাই আমাদের শিক্ষা-জীবনের, তথা কর্মজীবনের সর্বত্র প্রতিফলিত হইতেছে। এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং যাহারা ঐ শিক্ষার প্রকৃত সাধন তাহাদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হইবে। বলা বাহুল্য এইরূপ চেষ্টার আরম্ভ করিতে হইলেই গ্রন্থাগারের দিকে আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে হইবে।

পাঠের অভ্যাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী ও কতটা, যাহারা কলেজীয় শিক্ষা লইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ প্রশ্ন নূতন করিয়া আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠের সময় হইতেই ছাত্রদের যাহাতে পাঠস্পৃহা সমুজ্জীবিত হয় সেই বিষয়ে শিক্ষকদের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনেকক্ষেত্রেই নানা কারণে আমরা ঐরূপ দৃষ্টি দিতে পারি না। ক্ষতি ইহাতে হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও যদি আমরা এই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখি তাহা হইলে ঐ ক্ষতি গভীরতর হইয়া উঠিবে। মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদলের বিপুল অংশ গতানুগতিক জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। কোনমতে কোন কাজ সংগ্রহ করিতে পারিলেই তাহারা লেখাপড়ায় ইতি করিয়া অতি সাধারণ জীবন যাপন করিয়া থাকে। ইহারা দেশের কোন বিষয়ে নেতৃত্ব করিতে অগ্রসর হয় না। অসাধারণ কয়েকজনকে বাদ দিলে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের পরবর্তী জীবনের এই পরিণতি লক্ষ্য করিয়া বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষাকালে পাঠস্পৃহার সঞ্চার করিতে না পারিলে যে ক্ষতি হইবে তাহা আপাতবিচারে জাতির জীবন পরিচালনার উপর মাত্র দৃষ্টি রাখিলে তাদৃশ গভীর প্রতিভাত না হইতেও পারে, কিন্তু কলেজীয় শিক্ষা যাহারা গ্রহণ করিতে আসিল তাহাদেরও যদি একই অবস্থায় থাকিতে হয়, ব্যক্তির পক্ষেও যেইরূপ জাতির পক্ষেও সেইরূপ পরিতাপের বিষয় হইয়া উঠিবে। সুতরাং সর্বপ্রযত্নে আমাদিগের ছাত্রদিগকে স্বাধীন পড়ায় অভ্যস্ত ও উদ্বুদ্ধ করিতেই হইবে।

কলেজ গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একমত হইতে পারিলে কলেজ গ্রন্থাগার পরিচালনার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্যা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। উচ্চতর শিক্ষা যাহারা গ্রহণ করিতে আসিল তাহারা সারা জীবন কোন না কোন ভাবে শিক্ষার সহিত সংযুক্ত থাকিবে ইহা আশা করাই স্বাভাবিক। আপন বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন

করিতে, দৈনন্দিন কার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে, এমন কি অবসরকালে আনন্দলাভ করিতেও তাঁহাদিগকে পুস্তকের শরণাপন্ন হইতে হইবে। সামান্য কয়েকজন লক্ষ্মীর বরপুত্র ব্যতীত আর কেহ আপন প্রয়োজনীয় সমস্ত বই আপন সঞ্চয়ের মধ্যে সংগ্রহ করিবার আশা স্বপ্নেও পোষণ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ ইহার প্রয়োজনও নাই। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে আজ যে কোটি কোটি পুস্তক লোক-লোচনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ইহাদের মধ্যে যেগুলি কালের কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া বর্তমান থাকিবে তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। অথচ স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের প্যাটার্ণের ফ্যাসানের মত নিত্য বিলীয়মান এই পুস্তকগুলির সহিত কিছু কিছু পরিচয় না রাখিলে পাঁচজনের একজন হইয়া বাস করাও যায় না। স্বর্ণকারদের পারিশ্রমিক দিবার সামর্থ্য যাহাদের আছে তাঁহারা ফ্যাসনের বিভিন্ন অভিজ্ঞান সংগ্রহ করুন। ইতর জনকে গ্রন্থাগারের বারোয়ারী ভাণ্ডার হইতেই প্রয়োজন মত সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে; অর্থাৎ নিত্যনিয়মিত জীবনে সমাজের সহিত তাল রাখিয়া আপন প্রতিষ্ঠা ও মহিমাকে অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে বিদ্যা-সবস্ব-বৃত্তি-অবলম্বনকারীদের গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হইতেই হইবে। সুতরাং কলেজীয় শিক্ষায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রথম পাঠ হওয়া উচিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবার পদ্ধতি বিষয়ে।

ডাঃ রঙ্গনাথন তাঁহার গ্রন্থাগার পরিচালনার বিধিপঞ্চককে যখন ভাষামুখর করিলেন তাহার পূর্ব হইতেই গ্রন্থাগার-কর্মীরা পাঠকদের তথা গ্রন্থাগারিকদের সময় বাঁচাইবার জন্য নানারূপে চেষ্টিত ছিলেন। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই চেষ্টা আরও তীব্র হইয়াছে। ফলে গ্রন্থাগার পরিচালনায় আজ নানাবিধ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে—যাহা আপতঃ দৃষ্টিতে জটিল ও অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু বস্তুগত্যা কর্মপরিচালনায় বিশেষ সহায়ক।

এক বিষয়ের পুস্তকগুলিকে একত্র রাখা, বিষয়গুলির বিভাগ নিরূপণ, অনুরূপভাবে সজ্জিত করা আজ পৃথিবীর সর্বত্র একই পদ্ধতিতে চলিতেছে। হয়ত বিষয়গুলির ক্রমবিন্যাসে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে পার্থক্য থাকিতে পারে, হয়ত পুস্তকগুলির বিভাগ সঙ্কেতগুলি বিভিন্ন হইতে পারে—কিন্তু একই বিষয়ের বইগুলিকে একত্র রাখা এবং অবান্তর বিভাগ স্থির করিয়া তদনুযায়ী ঐ বিষয়ের বইগুলির আবার বিষয়ের বইগুলির মধ্যেও একত্র করা, পুস্তক-বিন্যাসের এই মূল পদ্ধতি আজ সমস্ত গ্রন্থাগারেই গৃহীত হইয়াছে। পাঠক একটি গ্রন্থাগারে বিষয়টি বুঝিয়া নিলে সারাজীবন সমস্ত রকম গ্রন্থাগার হইতে প্রয়োজনীয় পুস্তক খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবেন।

গ্রন্থবিন্যাস পদ্ধতি ব্যতীতও গ্রন্থসূচী ব্যবহারও শিক্ষণীয়। অভিধান দেখিতে জানিলে, কিংবা পুস্তকাদির নির্ঘণ্ট ব্যবহার করিতে জানিলে যথাক্রমে অনুবর্ণ (Dictionary ও অনুবর্গ (classified) সূচী ব্যবহার করা কঠিন কিছু নহে। কিন্তু নির্দেশক পত্রকগুলির (Reference cards) যথাযোগ্য গুরুত্ব না বোঝা পর্যন্ত গ্রন্থসূচী ব্যবহারে পরিপূর্ণ অধিকার জন্মায় না। অথচ গ্রন্থসূচী ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারিলে প্রয়োজনীয় গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) প্রভৃতি নির্মাণ করা কঠিন হইবে না। যাহারা পরবর্তী জীবনে

সুশৃঙ্খল পড়াশুনা করিতে চাহেন গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণের এই শিক্ষালাভ তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই শিক্ষাও তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে কলেজে অধ্যয়ন কালেই ছাত্রদের বিভিন্ন কোষ গ্রন্থের (Reference Book) সহিত পরিচিত করা আবশ্যক। উত্তর-জীবনে কীভাবে এবং কোথা হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে তাহার সঠিক ধারণা না থাকিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে, উচ্চতর পাঠ পদে পদে ব্যাহত হইবে এবং স্বাধীনভাবে পড়িবার যোগ্যতাও অর্জিত হইবে না।

বিষ্ণুশর্মা তাঁহার কালেই শাস্ত্র অনন্তপার জীবন স্বল্পস্থায়ী বুঝিয়া জ্ঞানের নিষ্কর্ষ আহরণের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। আজ সারা পৃথিবী জ্ঞানের বিষয়ে একটি মাত্র দেশে পরিণত হওয়ায় এবং মুদ্রাযন্ত্র এই বিপুলা পৃথ্বীর অন্তরতম প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় সেই শাস্ত্র যে কতদূর দুস্তর হইয়া উঠিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এরূপ অবস্থায় জ্ঞানের নিষ্কর্ষ মাত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পাঠককে ছাত্রাবস্থায়ই এই বিষয়ে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

মোট কথা সংবাদ সংগ্রহের সহজ পন্থাগুলি, কোথায় কোন বিষয়ের আলোচনা আছে তাহা সন্ধানের পথ, পুস্তক-বিন্যাস পদ্ধতি, সূচী-ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে পাঠককে শিক্ষিত করিয়া তোলা কলেজ-গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রথম কাজ। এই কাজ যথোপযুক্তভাবে সম্পন্ন হইলে পাঠক গ্রন্থাগারে আসিতে এরূপ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবে, যে গ্রন্থাগার তাহার নিকট কখনই দূরের বস্তু থাকিতে পারিবে না।

পাঠকদের উপরোক্ত শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের নিয়ম প্রভৃতি গুলিও বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং সেইগুলি পালনে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে। অনেক ছাত্রের পক্ষেই আজিকার দিনে প্রয়োজনীয় সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। সুতরাং তাহাদের গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হইতেই হয়। অথচ গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রতি পুস্তক যতগুলি ছাত্র ততগুলি করিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। এমন অবস্থায় ছাত্রদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন পুস্তক হস্তগত করিতে পারিলে যথা সময়ে প্রত্যার্পণ করিবার অনিচ্ছা হওয়া হয়ত স্বাভাবিক। ছাত্রেরা অনেক সময়েই জরিমানার ভয় না থাকিলে ঐ পুস্তক সহজে ফেরৎ দিতে চায়ও না। অনেক ছাত্র জরিমানা না দিবার নানা মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে, অনেকে বা জরিমানা দিয়াও দেয়। অনেক সময় কয়েকজন ছাত্র মিলিয়া পর্যায় ক্রমে আদান প্রদান করিয়া কয়েকখানি বইকে ঐ দলের বাহিরে যাইতে দেয় না। আমার মনে হয় ছাত্রদের প্রয়োজনবোধ খুব সীমিত করিয়া দিবার ফলেই এই সব অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। ছাত্রেরা যদি বোঝে তিনখানা নহে, ত্রিশখানা বইয়ে তাহার প্রয়োজন তাহা হইলে তিনখানি মাত্র বইয়ের দিকে তাহার সমস্ত বুদ্ধি ধাবিত হইবে না। অবশ্য পারস্পারিক সুবিধা প্রভৃতির কথাও ছাত্রদের বুঝান প্রয়োজন, অনেক ক্ষেত্রেই একই বইয়ের বহু প্রতিলিপি সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোন কোন বই বাহিরে দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া গ্রন্থাগারেই পড়িবার-

ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যাহাই হউক এই বিষয়টির সমাধান কি করিয়া করিতে হইবে তাহা এ ক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। ছাত্রদের মধ্যে যথাসময়ে পুস্তক প্রত্যর্পণের, নির্দিষ্টকালের মধ্যে পুস্তকটির প্রয়োজন সম্পন্ন করিবার অভ্যাস সঞ্চার করিবার গুরুত্বই এখানে বিশেষভাবে আলোচ্য।

গ্রন্থগুলির যথাযথ ব্যবহার শিখানোও আবশ্যক। গ্রন্থের পাতা কাটা, যতদূর পড়া হইয়াছে সেইখানে চিহ্ন দেওয়া, গ্রন্থটিকে পড়িবার খুলিবার ও ধরিবার সঠিক পদ্ধতি এই সমস্তের উপর ইহার সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। পুস্তক মাত্রের বিশেষ করিয়া গ্রন্থাগারের পুস্তকের প্রতি যথোচিত যত্ন লওয়ার অভ্যাস সঞ্চার করা গ্রন্থাগার পরিচালনার বিশেষ অঙ্গ। সাধারণভাবে কোথায়ও কিছু ছিঁড়িয়া গেলে অনেক পাঠক গ্রন্থের সংস্কারের নামে ইহার সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। এই বিষয়েও পাঠকদের যথাযথ জ্ঞানদান আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত দুঃখের কথা বলিতে হয়। কলেজ গ্রন্থাগারে কখনও কখনও কোন নীচাশয় পাঠক আপনার সামান্য সময় ও পরিশ্রম বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে পুস্তকগুলির পাতা খুলিয়া ও কাটিয়া লইয়া যায়। ইহাতে আপাততঃ তাহার হয়ত সময় বাঁচে কিন্তু বইখানি (সাধারণতঃ দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য) চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়। পাঠককে এই অভ্যাসের কুফলের কথা বুঝান প্রয়োজন পুস্তকখানির অংশবিশেষ লিখিয়া লইতে সময় ও পরিশ্রম যায়, একথা সত্য কিন্তু এই পরিশ্রম ও সময় কি অপব্যয়িত হয়। লেখার ফলে ঐ বিষয় অধিগত করিতে কি কিছুই সাহায্য হয় না? কে না জানে, একবার লেখা কয়েকবার পড়ার সমান কার্যকরী? তাহা ছাড়া পাঠক লিখিবার সময় পত্রবিশেষের সমস্তই হুবহু নকল না করিয়া বুঝিয়া বুঝিয়া সারমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে পারে—ইহাতে একই সঙ্গে পড়া, বিষয়টি অধিগত করা এবং পরবর্তীকালের জন্য স্মারক সংগ্রহ সম্পন্ন হয়। অসাধুভাবে সংগৃহীত পত্রটি ঠিকমত বুঝিতে না পারিলেও পাঠক তাহা শিক্ষক বা অন্য কাহাকেও দেখাইতে পারেন না ফলে বুঝিবার সাহায্যও পান না। কিন্তু দুর্বোধ অংশ বিশেষ হুবহু নকল করিয়া লইলে এই সব অসুবিধা হয় না। এই সমস্ত বিষয়ে পাঠককে যথাযথভাবে প্রবোধিত করিতে পারিলে এই অভ্যাস আংশিক নিবারিত হইতে পারে বলিয়া মনে করি।

আমাদের এই অভ্যাসের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, যথোচিতভাবে গ্রন্থ অধ্যয়ন ও উহার সার-সঙ্কলনের অক্ষমতাই এইরূপ অভ্যাসের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কোন গ্রন্থ পড়িয়া পাঠক যদি তাহার মূল বক্তব্য বুঝিতে পারে এবং ঐ বক্তব্যে উপনীত হইবার জন্য গ্রন্থকার কোন্ কোন্ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন—কোন্ কোন্ আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন ও সেই আপত্তিগুলিকে কোন্ কোন্ যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়াছেন ইহা যে পাঠক বুঝিবার চেষ্টা করে, সেই পাঠক কখনই পত্রবিশেষকে পুস্তক হইতে অপসারিত করিতে চেষ্টিত হয় না। বিশল্যকরিণী চিনিতে পারিবে না বলিয়াই হনুমান্ গন্ধমাদন বহন করে। কিন্তু

ছাত্রদের বুঝিতে হইবে গন্ধমাদন বহন করিলে তাহাদের লাভ নাই, অপর কোন সুষেণ তাহাদের হইয়া বিশল্যকরণী খুঁজিয়া দিবে না—তাহাদেরই বিশল্যকরণী চিনিতে হইবে এবং খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। পত্রবিশেষকে অপসারণ করিয়া তাহারা এই খোঁজার কাজটিকে বিলম্বিত করিল মাত্র, সম্পন্ন করিল না।

ফলে স্বাভাবিক ভাবে গ্রন্থাগারিকের দায় না হইলেও গ্রন্থাগারের স্বার্থে গ্রন্থাগারিককে ছাত্রদের পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে কেবল গ্রন্থাগারের একটি বিপদ্ কিয়দংশে কমিবার আশঙ্কা আছে; তাহাই মাত্র নহে, এইরূপভাবে পড়িবার অভ্যাস করিতে পারিলে ছাত্রেরা অতি সহজে বিপুল অংশের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় অংশটুকু বাছিয়া লইবার শিক্ষা পাইবে। ইহাতে তাহাদের পাঠের গতি বর্ধিত হইবে, অধিকতর পুস্তক পড়িবার স্পৃহা জন্মিবে, পঠিত বিষয় মনে রাখিবার সুবিধা হইবে এবং ফলতঃ সার্থক পাঠের অভ্যাস জন্মিয়া যাইবে। স্বাধীন ভাবে পড়ার অন্যতম ফলই হইতেছে পঠিত বিষয় হইতে আপন বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করা। এই পাঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথমেই পাঠকদিগকে অবহিত করা প্রয়োজন।

পুস্তক সংরক্ষণের শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলাম। পত্রবিশেষ অপসারিত করার প্রয়োজনই যাহাতে না হয় পাঠকদিগকে সেইভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু তথাপি এই কার্যে পূর্ণ সাফল্য কখনই আশা করা যায় না। অনেক পাঠক এ শিক্ষা গ্রহণই করিবে না। অনেক পাঠক এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াও সাফল্য লাভ করিবে না। কিছু এখন পড়িতেছি না, পরে যদি বইখানি না পাই সুতরাং সংগ্রহ করিয়া লই এইরূপ ভাবিবে এবং আরও কিছু আর কাহাকেও পড়িতে দিব না এই মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইবে। ফলে গ্রন্থের পত্র-অপসারণের সমস্যা সার্থক পাঠ অভ্যাসের দ্বারাই নিবারিত হইবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র।

সেইজন্য গ্রন্থের পত্রগুলি সংরক্ষণের অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। অনেকে বলেন মধ্যে মধ্যে খণ্ডিত পত্র পুস্তকগুলির প্রদর্শনী করিয়া অপসারিত স্থানগুলির গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলে পরবর্তী পাঠকেরা এই অভ্যাসের কুফল সম্বন্ধে সজাগ হইবে, এবং অন্যান্য পুস্তক এই চৌর্যবৃত্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবে। অনেকে আবার বলেন, খণ্ডিতপত্র-পুস্তকগুলির এই প্রদর্শনী এইরূপ একটি অভ্যাস প্রচলিত আছে এবং ইহা করিলেও নিস্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে পাঠকদের মধ্যে এইরূপ একটি ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে, সুতরাং যাহারা হয়ত এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল তাহাদেরও চোর করিয়া তুলিতে পারে। যাহা হউক আমার বিবেচনায় আজ হউক, কাল হউক খণ্ডিত পত্র পুস্তকগুলি পাঠকদের গোচরে আসিবেই। এমন কি ঐ পুস্তকগুলিকে সাধারণ স্থান হইতে সরাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও অনভিজ্ঞ পাঠক ঐ পুস্তকগুলি চাহিবেন, চাহিয়া না পাইলে কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন এবং প্রকৃত তথ্য একদিন

জানিয়া লইবেন। সুতরাং ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করিয়া পুস্তকের পত্র অপসারণের কুফলগুলি বুঝাইয়া প্রদর্শনী করিলে ফল ভালই হইবে।

গ্রন্থাগার পাঠকদেরই সম্পত্তি এই বিষয়ে যথাযথ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারিলেও এই বিষয়ে কিছু ফল লাভ হইতে পারে। এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে একদিকে পাঠকের অপকর্ম করিবার ইচ্ছাই কিছুটা নিবারিত হইতে পারে অপর দিকে পাঠরত চক্ষুগুলিও আপন কর্মের ফাঁকে দুষ্কার্যকারী পাঠকের দিকে নজর রাখিতে পারে। একথা বলা বাহুল্য গ্রন্থাগার কর্মীরা পাঠগৃহের সমস্ত পাঠকদের সকল কর্মের দিকে নজর রাখিতে পারেন না বলিয়াই এই সমস্ত দুষ্কার্য সাধিত হয়। নানাবিধ কার্যে লিপ্ত কর্মীদের পক্ষে ঠিক দুষ্কৃতিকারীকে চিনিয়া ফেলা এবং তাহার দিকে অবিরাম দৃষ্টি রাখা সুকঠিন। পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কেহ কেহ যদি এই কার্যে ইঁহাদের সাহায্য করেন, তাহা হইলে ফললাভের আশা যে অধিকতর হয় ইহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কে না জানে ছাত্র সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক সহানুভূতি আছে? ঐ সহানুভূতি অনেক সময়ই আপন সীমার ঔচিত্যকে লঙ্ঘন করিয়া প্রশ্রয়ের কোঠায় উপনীত হইয়া যায়। ফলে একজনে অন্যায় করিলেও সেই অন্যায়কারীকে আর একজন ছাত্র সহজে ধরাইয়া দিতে চায় না। বিশেষ করিয়া এই দুষ্কৃতির ফলভোগী যখন ব্যক্তি বিশেষ না হইয়া সাধারণ সম্পত্তি হয় তখন প্রশ্রয়ও তাহার সীমা লঙ্ঘন করিতে চাহে। গ্রন্থাগার ব্যবহার শিক্ষার সময় ছাত্রদের যদি গ্রন্থাগারের প্রতি মমত্ববোধ সঞ্চারিত করিতে পারা যায় ও অন্যায় সহ্য না করার নীতি শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে কিঞ্চিৎ সুফল লাভ আশা করা যাইতে পারে।

কলেজ-শিক্ষার প্রথমেই পাঠকদের যথোপযুক্তভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষাদান একান্ত প্রয়োজনীয়। দুঃখের বিষয় অনেক কলেজ-কর্তৃপক্ষই বিষয়টির গুরুত্ব প্রণিধান করেন না। ফলে গ্রন্থাগার আমাদের উত্তর জীবনে সঙ্গী হইয়া উঠে না, ডিগ্রীর চৌকাঠ পার হইয়াই আমরা জ্ঞান-প্রাসাদের সর্বত্র বিচরণ করিবার অভিজ্ঞতা দাবী করি এবং নিকষ পাষাণে পরীক্ষিত হইলেই আমাদের শিক্ষার গৌরব অসার প্রতিপন্ন হইয়া যায়। কলেজীয় শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে গ্রন্থাগারের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং গ্রন্থাগারিকেরও কার্যের আরম্ভের প্রথমেই ছাত্রসমাজকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের রীতি-নীতি প্রকার-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

পরিষদ্ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

বিশেষ সাধারণ সভার বিবরণ

অনুষ্ঠান দিবস—২৯. ৯. ১৯৬৩ ; বেলা ৪-৩০ টা

স্থান—কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচ্য বিষয় :—

(১) পরিষদের চাঁদা বৃদ্ধি করা

(২) পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশানের (১৯৬১) নূতন নিয়মানুযায়ী পরিষদের বর্তমান সংবিধানটির অংশবিশেষ পরিবর্তন করা।

উপস্থিত ছিলেন—৮২ জন

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।

পরিষদের নিয়মাবলীর নিম্নলিখিত ধারা উপধারাগুলির পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল :—

(১) ৭ নম্বর ধারায় ৪৲ (চার) টাকার স্থলে ৫৲ (পাঁচ) টাকা হইবে।

(২) ১৩ (৩) ধারায় ৩৲ (তিন) টাকার স্থলে ৪৲ (চার) টাকা হইবে।

(৩) ধারা ১৪ (৪) সভ্যেরা পরিষদের সদস্য তালিকাভুক্তকরণ, হিসাব-নিকাশ ও সভার বিবরণ পরিষদ আফিসে দেখিবার অধিকার লাভ করিলেন। অবশ্য তাঁহাকে পূর্ণ দুইদিন সময় দান পূর্বক সম্পাদককে লিখিতভাবে ১৲ (এক) টাকা ফি দিয়া জানাইতে হইবে।

(৪) ১৭ নং ধারা : দুইটি বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনের সময় যেন ১৫ (পনের) মাসের অধিক না হয়।

(৫) পশ্চিমবঙ্গের সোসাইটিস্ ওফ রেজিষ্ট্রেশান এ্যাক্ট ১৯৬১ সালের নিয়মাবলী অনুযায়ী পরিষদের বার্ষিক এবং অন্যান্য কার্য বিবরণ রেজিষ্ট্রার অফ সোসাইটিসের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেশ করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৬) ৭০ নং ধারা সহিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সংযুক্ত হইল। "উপরি উক্ত কর্মধারা নির্দ্ধারণের বিষয় কার্য-নির্বাহক সমিতি পশ্চিমবঙ্গের সোসাইটি অফ রেজিষ্ট্রেশান এ্যাক্ট ১৯৬১ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রেজিষ্টারের অনুমতি লইবেন।

(৭) ২৭ (৯) ধারায় নিম্নলিখিত অংশটি সংযোজনা হইল :—

বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণের সংখ্যা সমিতির স্থিরীকৃত দিনে জেলার সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে ধার্য্য করা হইবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
২৮শ সাধারণ বার্ষিক সভার বিবরণ

স্থান—কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

অনুষ্ঠান দিবস—২৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ; অপরাহ্ন ৫-৩০ মিঃ

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

[উপস্থিত ছিলেন—৮২ জন]

"গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ৺তিনকড়ি দত্তের মৃত্যুতে এই সাধারণ সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে।"

(১) গত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণ অনুমোদিত হয়।

(২) ১৯৬২ সালের বার্ষিক বিবরণ অনুমোদিত হয়।

(৩) ১৯৬২ সালের পরীক্ষিত হিসাব নিকাশ অনুমোদিত হয়।

(৪) অদ্যকার সভায় (১) রায় শ্রীহরেন্দ্র নাথ চৌধুরী ও (২) শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয়-দ্বয়কে সম্মানিত সদস্য মনোনীত করা হয়।

পৃষ্ঠপোষক : শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন।

(৫) ১৯৬৩ সালের কাউন্সিল নিম্নলিখিত সভ্যদের লইয়া গঠিত হয়।

সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতিগণ :—(১) শ্রীঅরবিন্দ সেনগুপ্ত (২) শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার (৩) শ্রীফনিভূষণ রায় (৪) শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ও (৫) শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক : শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

যুগ্ম সম্পাদক : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক : শ্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ত।

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার : শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত।

গ্রন্থাগারিক : শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ।

সদস্যগণ

(১) শ্রীমতী বাণী বসু, (২) শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, (৩) শ্রীচঞ্চল কুমার বসু, (৪) শ্রীদেবজ্যোতি বড়ুয়া, (৫) দিলীপকুমার বসু, (৬) শ্রীমতী গীতা মিত্র, (৭) শ্রীগোবিন্দ লাল রায়, (৮) শ্রীকমলাকান্ত প্রামাণিক, (৯) শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, (১০) শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ, (১১) শ্রীপার্থ সুবীর গুহ, (১২) শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী, (১৩) শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক, (১৪) শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য, (১৫) শ্রীসুধাংশু কুমার মিত্র।

জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য

(১) ধ্রুবসংহতি, বালসী, বাঁকুড়া। (২) বীরভূমজেলা গ্রন্থাগার। (৩) মাখনলাল পাঠাগার, বর্দ্ধমান। (৪) বাণী মন্দির, বর্দ্ধমান। (৫) মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, কলিকাতা। (৬) হাইড রোড ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা (৭) ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান, কলিকাতা। (৮) শিশির স্মৃতি পাঠাগার, (৯) প্রিন্স ভিক্টর এন, এন, ক্লাব, কোচবিহার, (১০) দার্জিলিঙ্ জেলা গ্রন্থাগার, (১১) পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, (১২) মগরা সাধারণ পাঠাগার, হুগলী। (১৩) গরলগাছা সাধারণ গ্রন্থাগার। **কার্য্যকরী সমিতির সদস্য** (১৪) সুহৃৎ সংঘ, লক্ষ্মীপুর, হুগলী (১৫) মিলনমন্দির লাইব্রেরী, হাওড়া। (১৬) আজাদ হিন্দ পাঠাগার, জলপাইগুড়ি (১৭) বান্ধব পাঠাগার, হরিশ্চন্দ্রপুর। (১৮) বালিয়া পল্লীমঙ্গল সমিতি, কান্দি। (১৯) বিদ্যাসাগর পাঠাগার (২০) কান্দোয়া বিবেকানন্দ পাঠাগার (২১) গড় জয়পুর হরিপদ সাহিত্য মন্দির, (২২) নবজাতক পাঠাগার (২৩) হরিণবাড়ী সাধারণ পাঠাগার।

বিশেষ প্রতিষ্ঠান সদস্য

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (২) জাতীয় গ্রন্থাগার (৩) বিশ্ব-ভারতী (৪) শিক্ষা বিভাগ (৫) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (৬) বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (৭) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (৮) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (৯) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১০) কলিকাতা কর্পোরেশান (১১) মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ (১২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১৩) বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি, (১৪) পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশান (১৫) ষ্টেট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

নব-নির্ব্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম সভা

অনুষ্ঠান দিবস **১৭ই** অক্টোবর, ১৯৬৩ ; বেলা ৩ ঘটিকা

স্থান—৩৩নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা

সভায় সভাপতিত্ব করেন—**শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু**

উপস্থিত ছিলেন—২৯ জন

সভায় নিম্নলিখিত উপসমিতিগুলি গঠিত হয় :—

(১) **গ্রন্থাগার ও প্রকাশক কমিটি**

সভাপতি : শ্রীফণিভূষণ রায়

সম্পাদক : শ্রীঅরুণ কান্তি দাসগুপ্ত

সদস্যগণ : সর্ব্বশ্রী (১) সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (২) মঙ্গল প্রসাদ সিংহ (৩) পার্থ সুবীর গুহ (৪) নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়।

(২) সংগঠন ও সংযোগ কমিটি

সভাপতি : শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীগুরুশরণ দাসগুপ্ত

সদস্যগণ : সর্ব্বশ্রী (১) মঙ্গল প্রসাদ সিংহ (২) প্রবীর রায় চৌধুরী (৩) গীতা মিত্র (৪) জলি গুপ্ত (৫) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও (৬) সুভ্রাংশু মিত্র এবং পরিষদের প্রতিষ্ঠানগত সদস্যবৃন্দ।

(৩) গৃহ নির্মাণ

সভাপতি : শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সদস্যগণ : সর্ব্বশ্রী (১) গোষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায় (২) প্রবীর রায় চৌধুরী, (৩) কমলাকান্ত প্রামাণিক (৪) গোবিন্দ লাল রায় (৫) রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (৬) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (৭) পার্থ লাহিড়ী (৮) গুরুশরণ দাশগুপ্ত ও (৯) নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৪) গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণকমিটি

সভাপতি : পরিচালক : শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু

সম্পাদক : শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত

সদস্যগণ : সর্বশ্রী (১) বিমলেন্দু মজুমদার (২) প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় (৪) ফণিভূষণ রায় (৫) অরবিন্দ ভূষণ সেনগুপ্ত, (৬) বিনয়েন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত (৭) আদিত্য কুমার গুহদেদার (৮) গোবিন্দভূষণ ঘোষ (৯) সুশীলবিহারী ঘোষ ও (১০) গোবিন্দ লাল রায়।

(৫) গ্রন্থাগারকর্মী কল্যাণ কমিটি

সভাপতি : শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক : প্রবীর রায় চৌধুরী

সদস্যগণ : সর্বশ্রী (১) নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় (২) বিমলেন্দু মজুমদার ও (৩) ফণিভূষণ রায়।

(৬) কারিগরী পঠন পাঠন ও সহায়ক কমিটি

সভাপতি : শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক : বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

সদস্যগণ : সর্বশ্রী (১) ফণিভূষণ রায় (২) প্রবীর রায় চৌধুরী (৩) অভয় সরকার (৪) শান্তিপদ ভট্টাচার্য্য (৫) বিজয়পদ ভট্টাচার্য্য (৬) পার্থ সুবীর গুহ ও (৭) অরুণ ঘোষ।

(৭) হিসাব ও অর্থ সংক্রান্ত কমিটি

সভাপতি : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্যগণ : সর্বশ্রী (১) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (২) ফণিভূষণ রায় (৩) সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও (৪) গোবিন্দ লাল রায়।

(৮) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কমিটি

সভাপতি : শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্যগণ : সর্বশ্রী (১) দেবজ্যোতি বড়ুয়া (২) সুভ্রাংশু মিত্র (৩) অজিত কুমার পাল ও (৪) চঞ্চল কুমার সেন।

(৯) গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ কমিটি

সভাপতি : শ্রীঅরবিন্দ সেনগুপ্ত

সম্পাদক : শ্রীঅরুণ ঘোষ

সদস্যগণ : সর্বশ্রী (১) চঞ্চল কুমার সেন (২) দিলীপ কুমার সেন (৩) বিনয়ভূষণ রায় (৪) ফণিভূষণ রায় (৫) গীতা মিত্র ও (৬) কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী (হাইড রোড ইনষ্টিটিউট)

নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সদস্যভুক্ত করা হইল

কলিকাতা : আশুতোষ কলেজ,

,, : জি, এস, আই লাইব্রেরী

বর্দ্ধমান : রামলাল আদর্শ বিদ্যালয়।

মেদিনীপুর : মদনমোহন দাস, গড়বেতা পাবলিক লাইব্রেরী।

কার্যকরী সমিতি

(১) বাণী বসু (২) প্রবীর রায় চৌধুরী (৩) চঞ্চলকুমার সেন, (৪) গোবিন্দ লাল রায় (৫) গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় (৬) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক ও (৭) সুহৃৎ সঙ্ঘ, হুগলী, এবং কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ।

———

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত ১৯৬৩ সালের সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল

কৃতিত্বসহকারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন

২৩ দুলালচন্দ্র চক্রবর্তী
১৩১ তপনকুমার সেনগুপ্ত
১৭ নির্মল ভট্টাচার্য

সাধারণভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন

৩ ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায়
৬ শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়
৯ নিয়ামল বসির
১১ দীপ্তিকুমার বসু
১২ সিদ্ধার্থ বসু
১৬ গীতা ভট্টাচার্য
২৫ মুক্তি চক্রবর্তী
২৬ সাধন চক্রবর্তী
২৭ সুধাংশুশেখর চক্রবর্তী
৩০ ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়
৩২ মনোতোষ চট্টোপাধ্যায়
৩৩ সরস্বতী চট্টোপাধ্যায়
৩৬ প্রিয়রঞ্জন চৌধুরী
৩৮ সত্যরঞ্জন চৌধুরী
৪২ সুরেন্দ্রনাথ দাশ
৪৫ জহর দাশগুপ্ত
৪৬ জানা দাশগুপ্ত
৪৭ সুকুমার দাশগুপ্ত
৫০ জ্যোৎস্না দত্ত
৫২ রাধাকান্ত দত্ত
৫৩ শঙ্করমণি দত্ত
৫৫ মঞ্জু দে
৫৬ নন্দিনী দে (মিসেস্ সেন)
৬২ বিজয়লক্ষ্মী ঘোষ
৬৫ ইমাদুল ইসলাম
৭১ অরুণকুমার গুপ্ত
৭৮ সত্যানন্দ মজুমদার
৮১ দুর্গাপদ মান্না
৮২ নিতাইচরণ মান্না
৮৯ বৃন্দেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৯০ দীলিপকুমার মুখোপাধ্যায়
৯২ বীণা মুখোপাধ্যায়
৯৩ আরতি নাগ
৯৮ চিত্তরঞ্জন পাল
১০০ কবিতারাণী পাল
১০২ দীলিপকুমার পাটনায়ক
১০৬ অরুণকুমার রায়
১০৭ ভারতী রায়
১০৮ দীপশিখা রায়
১১২ তুষারকান্তি রায়
১১৪ শ্যামলকুমার রায়চৌধুরী
১১৭ তুষারকান্তি সান্যাল
১২১ কানন সরকার
১২৬ দেবকী সেন
১৩০ শম্ভুনাথ শীল
১৩৪ সত্যনারায়ণ সিংহ
১৩৬ নিলীমা ওয়ালিয়া
১৪৩ পল্লবকান্তি সিংহ

N২ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
N৪ দেবজ্যোতি বড়ুয়া
N৭ অশোক বসু
N১০ ঝর্ণা বসু
N১১ ললিতা বসু
N১৪ ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস
N১৫ স্মৃতিধর বিশ্বাস
N১৭ দীলিপকুমার চক্রবর্তী
N২১ নগেন্দ্রনাথ দাস
N২৩ প্রফুল্লচন্দ্র দাস
N২৭ মণিলাল ধর
N২৮ স্নিগ্ধা ধর
N২৯ অজিতরঞ্জন ঘোষ
N৩১ মালবিকা গুহ বিশ্বাস
N৩৩ সুলেখা মিত্র (মিসেস সেন)
N৩৮ বিশ্বনাথ রায়
N৩৯ দেবেশচন্দ্র রায়
N৪৩ সুধা রায়
N৪৬ নির্মলকুমার সরকার
N৪৭ সন্তোষকুমার সরকার
N৪৮ কল্যাণী সেন
N৪৯ যোগমায়া সেনগুপ্তা
N৫১ অনিমেষচন্দ্র সুর

কলিকাতা　　　　বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়
২৩শে নভেম্বর, ১৯৬৩　　　　সম্পাদক

আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

এবার আগামী এপ্রিল মে মাসে সিউড়ীতে অষ্টাদশ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত হইয়াছে. সদস্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্মেলন সম্পর্কে মতামত ও পরামর্শ পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতি সাদরে বিবেচনা করিবেন।

সাধারণ সভার নির্দেশমত ১৯৬৪ সাল হইতে
পরিবর্তিত চাঁদার হার
ব্যক্তিগত—৩৲ স্থলে ৪৲
প্রতিষ্ঠান—৪৲ স্থলে ৫৲

ইংরেজ আমলে পাঠনিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা ও পুস্তক

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ হইতে সতের বৎসর পূর্বে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। স্বদেশী সরকার ও জনগণের যুক্ত প্রচেষ্টায় দেশের আনাচেকানাচে বহু গ্রন্থাগার স্থাপিত হইতেছে ও হইবে। কিন্তু ইংরেজ আমলে গ্রন্থাগার স্থাপন ও উহার প্রসার সাধনের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে তেমন কোন প্রচেষ্টাই দেখা যায় নাই। দেশে গ্রন্থাগার স্থাপন ও উহার প্রসার সাধনের মূলে ছিল ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া সারা ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহাই গ্রন্থাগার স্থাপনে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। যে বিপ্লবীকুল দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য মরণপাগল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাই স্বকীয় প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত গ্রন্থাগারকে তাহাদের ভাবপ্রচারের বাহনরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে গ্রন্থাগার প্রকাশ্য ও গোপন এই দুই রূপ নিয়া জনগণের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। যে পত্রপত্রিকা ও পুস্তক পাঠনিষিদ্ধ ছিল তাহা সঙ্গোপনে থাকিয়াই লোকের হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়াইত। লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সে বই সাগ্রহে ও সযত্নে পড়িবার কী উন্মাদনা! সরকার যে ইহার সন্ধান রাখিত না তাহা নয়। ইহা রোধ করিবার জন্য তাহারা নিযুক্ত করিল গুপ্তচর। তাহাদের শ্যেনদৃষ্টি এমনই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিল যে গ্রন্থাগারে আনাগোনা করা এবং উহার সহিত যুক্ত থাকাই অনেকে বিপজ্জনক মনে করিত। গ্রন্থাগারে নিষিদ্ধ পুস্তকের সন্ধানে খানাতল্লাসীর ফলে কোন কোন গ্রন্থাগার দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয় আবার কোন কোন গ্রন্থাগার কর্মীকে নিষিদ্ধ পুস্তক প্রাপ্তির ফলে আইনের কবলে পড়িয়া কারাদণ্ডও ভোগ করিতে হয়। গ্রন্থাগারগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের এক অধিবেশনে সরকারকে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা মুদ্রিত করিয়া গ্রন্থাগারসমূহে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কারণ অনেক সময় এইরূপ দেখা যাইত যে বইটী পাঠনিষিদ্ধ কিনা তাহার খবর পাঠক ও গ্রন্থাগারিক কেহই রাখিত না। ফলে তাহাদের অজ্ঞাতসারেও তাহারা সরকারের হাতে নির্যাতন ভোগ করিতেন। পরবর্তীকালে বিক্রমপুর গ্রন্থাগার সম্মেলনেও এই সম্পর্কে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সরকারের কার্যের তীব্র নিন্দা করা হয়। এককালে যে পাঠনিষিদ্ধ পুস্তক দেশের অধিবাসীদিগকে শ্রেয়ের ও প্রেয়ের সন্ধান দিয়াছিল তাহারই তালিকা ক্রমশ প্রকাশ করিতেছি। আপাতত ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতেই এই তালিকা দেওয়া হইতেছে। ইহার পূর্ববর্তী কালের তালিকা প্রকাশের জন্য পরে সুযোগ গ্রহণ করা হইবে। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার ইণ্ডিয়ান প্রেস এ্যাক্ট-এর ১২ (১) ধারা ও পরবর্তী অন্য ধারা অনুসারে বিদেশের ও স্বদেশের যে সমস্ত পত্রপত্রিকা ও পুস্তক পাঠনিষিদ্ধ করিয়াছিল তাহারই তালিকা এখানে দেওয়া হইল।

পত্রপত্রিকা ও পুস্তকের নাম	ভাষা	পাঠনিষিদ্ধ করার সন
১ British Barbarities in India. Published from New York by Young India newspaper	ইংরেজী	১৯২০
২ Awakening of Asia. Published from New York by Hunduman	"	
৩ British Terror in India. Published from San Francisco by Surendra Karr	"	
৪ Day of the Martyr		
৫ English Massacres and Atrocities. Published by Gaelic American (পুনর্মুদ্রণ)	"	"
৬ Hindusthan and Ireland. Pamphlet published from San Francisco by Hindusthan Ghadr Party	"	
৭ India, a Graveyard. Published from New York. by Indian Labour Union of America.	"	
৮ India and Ireland. A speech published from New york by E. De Valera		
৯ India in Revolt. Published from San Francisco by Edward Gammon.		
১০ Labour Revolt in India. Published from New York by Friends of Freedom for India	"	
১১ The Present Time. Published from San Francisco by Hindusthan Ghadr Party	"	"

১২	True Verdict of India Published from Berlin by F. N. Berne	ইংরেজী	১৯২০
১৩	Independent Hindusthan Vol. I. No. 5. Monthly Magazine Published from San Francisco by Hindusthan Ghadr Party	"	"
১৪	Truth Pamphlets (No. 3). Monthly Magazine Published from Calcutta by Lieutenant Commander H. M. Fraser.	"	"
১৫	India's Problem and its Solution. Booklet published by M. N. Roy	"	১৯২২
১৬	Advance Guard (Vol. I, Nos. 1, 2, 3, 5,). Newspaper issued from Switzerland	"	"
১৭	Advance Guard (Vol. II)	"	"
১৮	Indian People. Leaflet published from Fresno, California by Mahendra Pratap Singh	"	"
১৯	Manifesto to the All India Congress Committee. Leaflet	"	"
২০	Programme for the Indian National. Issued from Switzerland	"	"
২১	Vanguard of Indian Independence (Vol. I, Nos. 2, 3, 4 and 5). Newspaper published from Liverpool	"	"
২২	Vanguard of Indian Independence (Vol. II). Newspaper published from Liverpool	"	"

২৩	An Appeal to the Labour Unions of India. Leaflet published by M. N. Roy.	ইংরেজী	১৯২৩
২৪	Advance Guard (Vol. 1, No. 7, 1st Jan. 1923). Newspaper Published by Emerald Press from London	,,	,,
২৫	Advance Guard (Vol. I, No. 8, 15th Jan. 1923). Newspaper published by Emerald Press From Dublin.	,,	,,
২৬	Chauri Chaura Judgment. Leaflet published by the Executive Committee of the Communist International.	,,	,,
২৭	Indian Independence (Vol. I, No. I, 15th Nov. and Nos. 2, 3, 4 and 5, 1923). Newspaper published from Berlin by M. N. Roy.	,,	,,
২৮	Open letter to Chittaranjan Das and his followers. Leaflet, published by M. N. Roy.	,,	,,
২৯	A Programme for the Indian National Congress. Leaflet.	,,	,,
৩০	The Vanguard (Vol. II, No. I, 15th Feb. and Nos. 5, 6 and 10, 1923). Newspaper.	,,	,,
৩১	Bande Mataram. Pamphlet issued from Calcutta.	,,	১৯২৪
৩২	Bande Mataram. (An Apology for our Appearance) Published by President in Council, 'Red Bengal'.	,,	,,
৩৩	S. G. P. C'S Communique (No. 1015, Enquiry by Balwant Singh Nalwas into Jails Massacre. Published from Amritsar by General Secretary, S.G.P.C.	,,	,,

৩৪	The Revolutionary (Vol. I, No. I, 1st. Jan. 1925). Newspaper commencing with the words 'Every honest Indian should read the whole of it and circulate it among his friends', "Manifesto of the Revolutionary Party of India—Chaos is necessary," and ending with the words "Sd. Vijay Kumar, President, Central Council, the R. P. of India."	ইংরেজী	১৯২৫
৩৫	An Appeal to the Young. Leaflet written by Raj Kumar, President, The Young Socialist Republican Association of India, commencing with the words "Young Comrades" and ending with the words "Long live Revolution."	"	১৯২৯
৩৬	India in Bondage: Her right to Freedom. Book written by J. T. Sunderland, Printed and Published by Sajani Kanta Das at the Prabashi Press, 91, Upper Circular Road, Calcutta.	"	"
৩৭	The Hindusthan Socialist Republican Association Manifesto, "The Philosophy of the Bomb". Leaflet	"	১৯৩০
৩৮	India..... Book compiled by Juananjan Niyogi printed by H. B. Chakravarty at Service Printing Co., 20-A, Gopi Bose Lane and published by Brajendra Nath Bhadra of 20-A, Gopi Bose Lane, Calcutta.	"	"

৩৯	Indian Republican Army and signed "By order, President in Council, Indian Republican Army, Chittagong Branch." Leaflet beginning with the words 'To the Students and Youths of Chittagong, Dear Brothers', Bengal.	ইংরেজী	১৯৩০
৪০	Indian Republican Army and signed "By order, President in Council, India Republican Army, Chittagong Branch." Leaflet beginning with the words "Indian Republican Army," Chittagong.	„	„
৪১	Indian War of Independence (Second Edition, parts I and II) Book written by Barrister Savarkar, printed at the Educational Printing Works, Lahore and published by R. Bhattacharya, 91 Upper Chitpur Road, Calcutta.	„	„
৪২	"Manifesto of the Young Comrades' League to the Youths of India." Pamphlet printed by N. Sen, Secretary, Young Comrade's League from the Jugabarta Press, 4 Chhaku Khansama Lane, Calcutta and published by him from 23 Mechuabazar St., Calcutta.	„	„
৪৩	Political Resolutions of the First All Bengal Young Comrades' League at Rajshahi, April, 1930. Pamphlet printed at the Sree Saraswati	„	„

	Press, Ramanath Mazumder St., Calcutta by N. Sen and published by him from 23 Mechuabazar St., Calcutta.	ইংরেজী	১৯৩০
৪৪	"To the Warring People of India" commencing with the words "Hark, Hark, the Sound of Revolution" and ending with the words "Revolutionary Student." A type-written manifesto.	,,	,,
৪৫	"To the Students of Bengal." Leaflet issued by Hem Chandra Ghose, Secretary, Bengal Provincial Congress Committee, Bengal.	,,	,
৪৬	'Workers, Students and Citizens of Calcutta." Leaflet	,,	,
৪৭	"Workers of Calcutta." Leaflet issued by the Calcutta Committee of the Communist Party of India.	,,	.
৪৮	"Workers of Calcutta" and ending with the words "Long live revolutionary uprising of toiling masses." Leaflet.	,,	.
৪৯	"What Our Students Should Do (India)" beginning with the words "It is not only an insult" and ending with the the words "Glory to the students of India—Revolutionist." Type-written leaflet.	,	.
৫০	"Liberty." Newspaper issues, 10th, 15th, 19th and 20th July, 1930	,,	,
৫১	"An Appeal to the Youth of India from the Hindusthan Socialistic Republican Army and the Communist Party, Bengal Branch." Leaflet.	,,	[illegible]

৫২	An Appeal ending with the words "Inquilab Zindabad", President Asfakulla. Leaflet.	ইংরেজী	১৯৩১
৫৩	"Attention". Leaflet.	"	"
৫৪	"Be aware" and ending with the words "Alishichakkar", Calcutta (B. B. Branch). Leaflet.	"	"
৫৫	E. Order No. 2, Feb., 15, 1931. "To action" ending with the words "Commander G. H. Q. H. R. A." Leaflet.	"	"
৫৬	"Friend" commencing with words "friend" and ending with words "Long live revolution". Leaflet.	"	"
৫৭	First Indian War of Independence. Leaflet under the signature of Ram Mangal Sing, Secretary, Rajput Nabajubak Dal, Calcutta and printed at the Ballidan Press, 1/1, Mechuabazar St., Calcutta.	"	"
৫৮	'India in World Politics' by Tarak Das. Printed at Sree Saraswati Press, Calcutta and published by S. N. Shaw, Saraswati Library, 9, Ramanath Mazumder St, Calcutta.	"	"
৫৯	"Inquilab Zindabad" and ending with the words "Long live our red Comrades." Leaflet.	"	"
৬০	Message of the Martyrs—A call to arms with pictures of Rajguru, Bhagat Singh and Sukdev. Published by Hindusthan Ghadr Party, 5 Wood St., San Francisco. Leaflet.	"	"

৬১	"Our Night of Revenge." Leaflet.	ইংরেজী	১৯৩১
৬২	"The good fight he fought for India's Independence." Leaflet.	"	"
৬৩	"Martyrs of the fame of shooting at Writers' Buildings (Calcutta)". Leaflet containing photographs of Dinesh Gupta etc. Printed and published by the Hindu Punch Press 84 Upper Circular Road, Calcutta.	"	"
৬৪	"Chittagong Armoury Raid Case," A booklet in a red paper cover.	"	"
৬৫	"An Appeal to the Revolutionary Students of Bengal". Leaflet.	"	১৯৩২
৬৬	Call to Revolt. Booklet.	"	"
৬৭	"Do you know" and ending with the words "Publicity officer, A. B. S. A. Cyclostyled unauthorised news-sheet.	"	"

(ক্রমশ)

সুপ্রকাশ গুপ্ত

গ্রন্থাগারিকের নতুন দৃষ্টি

সব দেশেই গ্রন্থাগারগুলোর প্রধান দায়িত্ব হ'চ্ছে বাঁধাধরা পড়াশুনা শেষ হয়ে যাবার পরও আরও পড়াশুনার সুবিধে ক'রে দেওয়া। যে সব দেশে অক্ষর জ্ঞান সব লোকেরই মধ্যে বিস্তৃত সে সব দেশে গ্রন্থাগারের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা কোন কঠিন কাজ নয়। জীবন-সংগ্রামের তাগিদেই মানুষকে আরও কিছু জানবার জন্যে উৎসুক হ'তে হয়। আর এই জানবার প্রাথমিক যোগ্যতা যাদের আছে জ্ঞানের রাজপথ তাদের জন্যে খোলাই থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক আজও নিরক্ষর। তাই গ্রন্থের হাজার আয়োজন ক'রলেও এই সব লোকেরা তার থেকে কোন সুবিধা পায় না। রাস্তা যতই প্রশস্ত বা পিচ্ ঢালা হোক্ না কেন খোঁড়া লোকের তাতে খুব বেশী কিছু সুবিধে হয় না।

আমাদের দেশ এখন একটা যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে র'য়েছে। দেশের কোটি কোটি বয়স্ক লোক প্রাচীন পদ্ধতিতে বড় হ'য়ে উঠেছেন। অক্ষর-জ্ঞান ছাড়া জীবন-যাপন যে অসম্ভব এই সংস্কার তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। জীবনের আদর্শ বা কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে হ'লে তাঁরা এখনও গুরুবাদ বা উপদেশ-বাদের উপর নির্ভরশীল। নিজের চোখ দিয়ে প'ড়ে তার উপর বুদ্ধি খাটিয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করার অভ্যাস আজও তাঁদের হয়নি। শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে কাজেই আজও তাঁদের কানই প্রধান ইন্দ্রিয়। শিক্ষানবিশী আর কানে শোনা ছাড়া অন্য কোন পথেই তাঁরা এগোন না। ফলে আমাদের জীবন ধারা প্রাচীন খাদের বাঁধা পথেই চ'লতে বাধ্য হ'য়েছে। ২৩ হাজার বছরেও আমরা আমাদের কৃষি, শিল্প কোন কিছুকেই আগের পদ্ধতির থেকে একচুল ন'ড়তে দি'নি'। এতে জীবন-সংগ্রামে আমরা তাল রাখ্‌তে পারছি না। স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে, দেশ বিশেষ থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু স্রোত বন্যার মত আমাদের রাজ্যের উপর আছ্‌ড়ে প'ড়ছে। কিন্তু সেই বিবে প্র ৩ ৬।৭ মনের ফলনকে কোন্ পদ্ধতিতে বাড়ানো যায় সে চিন্তা আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের মনকে পীড়িত করে নি'। আগ্নেয়গিরি আর ভূমিকম্পের দেশ জাপান লোকে লোকে ছেয়ে গেলেও কেমন ক'রে জাপানীরা তাদের সামান্য জমির উপর নির্ভর ক'রে সকলের খাদ্যের জোগান দিচ্ছে ত।' আমরা শিখ্‌তে যাই নি'। বাঁধের বাইরে অনেক নিচু জমি থাক্‌লেও বাঁধা পুকুরের জল যেমন সেদিকে যেতে পারে না, তেমনি সমস্যা সমাধানের অনেক নতুন উপায় বের হোলেও বাঁধা-পথের-যাত্রী আমরা তার খোঁজও নিতে যাই না আর তাতে উৎসাহও বোধ করি না।

এই ছিল আমাদের দেশের অবস্থা—এই হ'ল এখনও কোটি লোকের মধ্যে আমাদের স্থিতি। কিন্তু আজ আর বুঝি এভাবে চলা যাবে না। আকাশে বৃষ্টির জোয়ার নেমে এসেছে বাঁধা পুকুরের জল আজ পাশের জলের সঙ্গে একাকার হ'যে যাচ্ছে। শিল্প আজ দূর পাড়া-গাঁয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অসন্তোষের প্রবল আগুনে প্রাচীন জীবনের শুক্‌নো পাতাগুলো আজ পুড়্‌তে ব'সেছে। চাষীর নিরাবরণ গাত্র, সংক্ষিপ্ত বস্ত্র এবং নগ্ন পদ আজ শিল্প-মজুরের জৌলুষের সামনে লজ্জায় অন্তর্হিত হ'তে চেষ্টা ক'রছে; তাই দেশের সমস্যা চিন্তা ক'রে নয় সমাজের অন্যান্য সকলের সঙ্গে তাল রাখার উদ্দেশ্যেই আজ চাষীকে ভাব্‌তে হ'চ্ছে নতুন পদ্ধতির কথা। মহারাষ্ট্রের যে চাষী আজ আখ উৎপাদনে বিস্ময় সৃষ্টি ক'রেছে, সে ত' এই পরিবর্তিত যুগের সূচনাকেই আমাদের সাম্‌নে প্রতিষ্ঠিত ক'রল।

ফল কথা প্রাচীন জীবন ধারা এখনও দেশে র'য়েছে। কিন্তু নতুন ধারাও আজ প্রবাহিত হ'তে চ'লেছে। বাপ দাদারা যা' ক'রেছেন তারও উপরে কিছু করার ইচ্ছা, চেতনা আর

চেষ্টা আজ দেখা দিয়েছে। সুতরাং শিক্ষার নতুন প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। অনেকদিন চাষ-না-ক'রে-ফেলে-রাখা জমিতে চাষ করা সোজা নয়। হালের ফলা সেখানে ব'সতেই চায় না। কিন্তু আজ সুবৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আমাদের সমাজ-সেবীদের এই মাহেন্দ্রক্ষণটি নষ্ট ক'রলে চ'লবে না। কানে শোনার উপর যে অনন্যসাধারণ বিশ্বাস আর নির্ভরতা আমাদের ছিল আজ তার ভিত্তিমূল ন'ড়ে উঠেছে। এই সুযোগে চোখে দেখা আর বুঝে নেওয়াকে আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে।

কথাটা সহজ ক'রে ব'ল্‌লে ব'ল্‌তে হয়—আজ গ্রন্থাগারগুলোকে অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের দায়িত্ব নিতে হবে। উপযুক্ত জায়গায় ছবি চার্ট প্রভৃতি সাজিয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি ক'রতে হবে যাতে অক্ষর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা লোকে নিশ্চিত ভাবে বুঝ্‌তে পারে আর ঐ অক্ষর জ্ঞান লাভের জন্য উৎসুক হয়। এমন কর্মিদল গ'ড়ে তুলতে হবে যাতে উৎসুক লোকের এই-জ্ঞান লাভের কোন অসুবিধা না হয়। সম্প্রসারণের চেষ্টা গ্রন্থাগারের অবশ্য কর্তব্য ব'লে আজ সর্বত্র স্বীকৃত হ'য়েছে। লক্ষ লক্ষ নিরক্ষরের মধ্যে সম্প্রসারণের চেষ্টা ফলবতী হবার যে সম্ভাবনা রয়েছে কোনও গ্রন্থাগার কর্মীই তাকে উপেক্ষা করতে পারেন না।

আমাদের পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগারের আয়োজন কম নেই। বাংলা দেশের এমন কোন অঞ্চলই বোধ হয় আজ দেখান যাবে না, যেখানে গ্রামীণ গ্রন্থাগার একেবারেই অপরিচিত। কিন্তু এইসব গ্রন্থাগার আমাদের দেশের লোকদের কতটুকু সেবা ক'রছে তা' কি আজ ভাবার দিন আসে নি'? আমাদের গ্রন্থাগারগুলোর প্রধান লক্ষ্য আজ ভুল্‌লে চ'ল্‌বে না। ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া আর নিরক্ষর ও অল্পজ্ঞদের জ্ঞানপিপাসু ক'রে তোলা আজ আমাদের প্রধান কাজ। অন্যান্য কাজ যতই করি না কেন, এই দুটো বিষয়ে আমরা যদি সাফল্য লাভ করতে না পারি আমাদের গ্রন্থাগার-বিকাশের এত আয়োজন সবই নিরর্থক হযে যাবে।

আমরা গ্রন্থাগার আইনের কথা বেশ কিছু দিন ধ'রে শুনছি। দেশের লোকের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক কর ধার্যের কথাও আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু কর নিযে গ্রন্থাগার ক'রে লাভ কি হবে যদি পড়ার লোক আমরা তৈরী ক'রতে না পারি। গ্রন্থাগার যদি চিত্তবিনোদনের খোরাক মাত্র জোগায় তাহ'লে সব লোকের জন্যে সিনেমা দেখানোর আয়োজনই বা থাকবে না কেন? গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য উপন্যাসের জোগান দেওয়া নয়—জাতি গঠনের কাজে লাগা। ভবিষ্যতের নাগরিক গ'ড়ে তুলে, দেশে সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিযোজিত লোকদের আরও বেশী কুশল ক'রে তুলে, দেশ পরিচালনায় উপযুক্ত নায়ক নির্বাচনের যোগ্য নাগরিক গ'ড়ে তুলেই গ্রন্থাগার এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। একদিন আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছিল সমাজ সেবার প্রেরণায়। আজ সমাজ সেবীরা অনন্যচিত্ত হ'য়ে যাতে দেশ সেবায় নিযুক্ত হ'তে পারেন সেই জন্যে সরকার হয়ত তাঁদের কিছু কিছু ভাতা দিচ্ছেন। কিন্তু ঐ ভাতা কি সমাজসেবীদের সেবাপ্রবৃত্তিকে বিলুপ্ত ক'রে দেবে? এক সময় পাঠশালার গুরুমশায়কে লোকেরা পঞ্চমী প্রভৃতি উপলক্ষে পূজোর নাম ক'রে চাল, ডাল, তরকারি সাহায্য করত। তাতে গুরুমশায়ের অসম্মানও হ'তো না তাঁর উপকারের কথাও কেউ ভুলতো না। জন প্রতিনিধি রাষ্ট্র যদি আজ এই দায়িত্ব নেয় তা' হ'লে অবস্থার কেন পরিবর্তন হবে বুঝি না। বাংলার যে মহৎ সন্তানেরা দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে একদিন দেশ গঠনের জন্য আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন, তাঁদের কাছে আজ সবিনয় আবেদন—লগ্ন এসেছে, কিন্তু নায়ক নেই। সারা দেশ গঠনের জন্যে আজ আবার তোমরা আগুয়ান হও। বণিক্ বৃত্তির দ্বারা নয়, সেবার দ্বারাই মাত্র তোমরা দেশকে বাঁচাতে পারবে—নিজেকে সম্মানিত করতে পারবে। তোমাদের স্থানীয়গৌরব বোধ জাগ্রত হোক। যে বাংলা শিক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেছিল আজ সে স্থানচ্যুত হ'তে চ'লেছে

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে ভালভাবে পরিচালিত করিতে হইলে গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিকতম রীতি পদ্ধতির সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বিশ্বের সর্বত্র আজ জ্ঞানালোচনার একটি মাত্র মান প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়, কোনও গবেষণাকেন্দ্র আজ ঐ মান হইতে আপনার আয়োজনকে নামাইয়া আনিতে পারে না। যদি আনে, তাহা হইলে তাহার সম্মানাদির হ্রাসও অবশ্যম্ভাবী। বলা বাহুল্য শিক্ষা, আলোচনা ও গবেষণাকে সর্বত্র পরিগৃহীত মানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করিতে হইলে আমাদিগের গ্রন্থাগার ও পরীক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে যথাযথভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন, বহুত্র প্রকাশিত পাঠ্যবিষয়ের সারাংশ সঙ্কলন, সন্ধান রাখিবার পদ্ধতি অনুসরণ, যন্ত্রাদির ব্যবহার আজ যুগান্তর আনিয়াছে। অথচ আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষেরা এই পরিবর্তিত অবস্থার গুরুত্ব যথাযথ অনুধাবন করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। নচেৎ এই কলিকাতা সহরে, যেখানে নানা প্রকার গ্রন্থাগারের অপূর্ব সমাবেশ রহিয়াছে, যেখানে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু গবেষণাকেন্দ্র রহিয়াছে, সেখানে গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার রীতি পদ্ধতি শিখাইবার আয়োজন হইতেছে না কেন?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একবৎসর যাবৎ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান পড়াইয়া ডিপ্লোমা দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদ্যা এখানে প্রবর্তন করেন নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের প্রচেষ্টার কথা না হয় নাই তুললাম। খাস কলিকাতা সহরে তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বেশ কিছুদিন এই বিদ্যার চর্চা হইবার পর বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে সচেতন হইলেন। অবশ্য তখন হইতে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা অব্যাহত আছে এবং বহু গ্রন্থাগার ও বহু ছাত্র ইহার সুফল ভোগ করিতেছেন।

কিন্তু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের সমুন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব বুঝি আজও পরিবর্তিত হয় নাই। কোন অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশবাসীর মনে এই আশাই উদিত হয় যে অতঃপর আমাদের শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে এবং শিক্ষালাভ করিয়া আমরা আমাদের ক্ষেত্রে নিপুণতর হইয়া উঠিব ও ফলতঃ আমাদের মর্যাদা প্রভৃতিও বাড়িবে। বস্তুতঃ দেশবাসীর এই আশা পূরণ করিবার নৈতিক দায়িত্ব কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই অস্বীকার করিতে পারে না। সাময়িক অসুবিধার জন্য কোন শিক্ষা প্রবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য বিলম্ব হইতে পারে মাত্র। কিন্তু অনির্দিষ্টকাল এইরূপ বিষয়ে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করা কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে নিজের দায়িত্বজ্ঞানের পরিচায়ক নহে।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমার পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকটে নানাভাবে আবেদন নিবেদন করিয়া আসিতেছি। কখনও শুনি এই শিক্ষার ব্যাপ্তিকাল সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে পারেন না বলিয়া ইহা প্রবর্তিত হইতেছে না; কখনও শুনি স্থানাভাব, কখনও শুনি উপযুক্ত শিক্ষকাভাব প্রভৃতির কারণে ইহার প্রবর্তন সম্ভব নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ, খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এত দিনেও এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করিতে না পারা যে কতদূর দুঃখজনক ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার পক্ষে ক্ষতিকর তাহা বলিবার নহে।

আজ সর্বত্র শিক্ষায় অযথা কালক্ষেপ বন্ধ করিয়াও শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব হইতেছে। মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতম পাঠ এক বৎসরের মধ্যে শেষ করিতেছে। ভারতবর্ষে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ডিপ্লোমা স্তরের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে একবৎসরে উচ্চতম পাঠ পড়াইয়া দিতেছে। মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-এস্‌ ডিগ্রীপ্রাপ্তগণ প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন নহেন—এই কথা পৃথিবীর কুত্রাপি শোনা যায় নাই। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পাঠ সমাপনকারী স্নাতকগণ তাঁহাদের জ্ঞানের জন্য আদৃতই হইতেছেন। এদিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বকর্মার সুন্দর পুত্র নির্মাণের পণ করিয়া বসিয়া আছেন। প্রতি বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই আপন আপন ছাত্রদের জন্য যে মমত্ববোধ থাকে তাহাই তাঁহাদিগকে ইহাদের অধিকতর কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিষয়ের বিমুখতা আজ বাঙালী তথা ভারতের পূর্বাঞ্চলবাসী সকলের গ্রন্থাগারের উচ্চতম দায়িত্বশীল পদগুলি পাইবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত করিতেছে।

শিক্ষা ও গবেষণাকে বিজ্ঞান-সম্মত পথে পরিচালিত করিতে—চিন্তা ও চেষ্টার অপচয় নিরোধ করিতে গ্রন্থাগারের যে বিশেষ অবদান আছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে আমাদের দেশে জ্ঞানালোচনার নবযুগ আরম্ভই হইবে না। অথচ ইহা করিতে হইলে গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিকতম পন্থায় শিক্ষিত প্রকৃত বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক দল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকদের স্বার্থে না হউক অন্ততঃ গবেষণা কেন্দ্রগুলির স্বার্থে ও জ্ঞানালোচনার স্বার্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চতম শিক্ষা প্রবর্তন করিতে তৎপর হইতে পারেন না কি ?

যতদূর জানি মঞ্জুরী কমিশনও পূর্বাঞ্চলে অন্ততঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতম শিক্ষা প্রবর্তন করিবার জন্য সাহায্য দান করিতে অসম্মত নহেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে উৎসুক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ১৮ বৎসর যাবৎ ডিপ্লোমার অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়াও যদি এই সব সুযোগ না লইতে পারেন এবং ফলে যদি অন্যান্য কর্তৃপক্ষ এই দীর্ঘ সূত্রতার সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া অন্যত্র এই শিক্ষার প্রবর্তন করেন তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব রক্ষার নামে যাঁহারা এই কার্য ত্বরান্বিত হইতে দিতেছেন, না তাঁহাদের কী সান্ত্বনা থাকিবে ?

গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নগণ্য নহে। এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় সর্ববিধ সুবিধা দিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতম শিক্ষা প্রবর্তনে এই বিলম্বের জন্য দুঃখিত। অথচ লাল ফিতার ফাঁস, পরিবর্তিত অবস্থার সম্বন্ধে উদাসীনতা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট হইবার মিথ্যা আশঙ্কা পরিহার করিয়া সমষ্টিগতভাবে তাঁহারা এই কার্যটি করিতে পারিতেছেন না, ইহা বাস্তবিকই অদৃষ্টের পরিহাস। কলিকাতা সহরে যোগ্য শিক্ষকের অপ্রতুলতা নাই। অবশ্য হয়ত প্রথমেই তাঁহাদের পক্ষে আপন আপন কার্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব-সময়ের জন্য শিক্ষকতা গ্রহণ সম্ভব না হইতে পারে। সেই সেই অবস্থায় আপাততঃ সাময়িক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া কাজ আরম্ভ করা যায় এবং কয়েক বৎসর বিগত হইলে সর্বসময়ের জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। মোটের উপর কর্তৃপক্ষ তৎপর ও কৃতসংকল্প হইলে এই বৎসরেও এ-শিক্ষা প্রবর্তন করা অসম্ভব হইবে না।

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য়   গ্র ন্থা গা র   প রি ষ দ

এ ই   সং খ্যা য়

ত্রয়োদশ বর্ষ   নবম সংখ্যা   পৌষ ১৩৭০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৩শ বর্ষ] পৌষ ঃ ১৩৭০ [৯ম সংখ্যা

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

কোলন বর্গীকরণ প্রসঙ্গে

ভূমিকা

গত দু-দশকে বর্গীকরণ সম্পর্কে চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। যে বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলি এক সময় সমস্ত গ্রন্থাগারের উপযোগী বলে মনে হ'ত জ্ঞানবিজ্ঞানের অতি দ্রুত অগ্রগতি এবং নতুন নতুন জটিল বিষয় উদ্ভবের ফলে আজ তা অকার্যকরী হ'য়ে পড়েছে। অবশ্য খুব সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে বর্গীকরণ পদ্ধতির নির্বাচনে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু উচ্চশিক্ষা, বিশুদ্ধ অথবা প্রয়োগ বিজ্ঞানের গবেষণা, অথবা শিল্প-সংস্থার সাথে যুক্ত গ্রন্থাগারের পক্ষে সঠিক বর্গীকরণ পদ্ধতি নির্বাচন বর্তমানে কঠিন হয়ে পড়েছে। দীর্ঘকালের প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থক গ্রন্থাগারিকেরা বর্গীকরণের ক্ষেত্রে নতুন কোন পদ্ধতিকে স্বাগত জনাতে পরাঙ্মুখ। এ-সম্বন্ধে কোন আলোচনাও বিশেষ কোন চিন্তাধারায় প্রভাবিত—এই অপবাদে চিহ্নিত হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে এর অন্তর্ভুক্তি কোন কোন মহলে আবার নিষিদ্ধ।

কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি বর্গীকরণের চিন্তাধারাকে যে নতুন খাতে প্রবাহিত করেছে সে সম্বন্ধে এখন আর সংশয়ের অবকাশ নেই। সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারকে দশ ভাগে তারপর প্রতি ভাগকে আরও দশ ভাগ এইরূপে ক্রমান্বয়ে দশ দশ ভাগে বিভক্ত করবার যৌক্তিকতা এক সময় ছিল এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ এই পদ্ধতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ছিল। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য ছিল। 'মেলভিল ডিউই' এই অবদানের জন্য যথার্থভাবে আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত হয়েছেন।

কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংযোজিত নতুন নতুন বিষয় একাধিক বিষয়ের সংযোগে নতুন জটিল বিষয় এই দশ দশ ভাগের কক্ষে স্থান পায় না। কোন বিষয়ের কঠিনতম বিভাগের জন্য কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন (notation) পাওয়াও যায় না। মূল বিভাগের

জন্য নির্ধারিত চিহ্নে তাকে চিহ্নিত করতে হয়। এই সমস্যা বিশেষ গ্রন্থাগারে যেখানে জ্ঞানের সূক্ষ্মতম বিভাগকে চিহ্নিত করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেখানে অত্যন্ত প্রবল। ডকুমেণ্টেশনের কাজে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর তালিকা বর্গীকরণের জন্য এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ অচল। একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের সম্পর্ক নির্দেশ করবার কোন রীতি এই পদ্ধতিতে নেই। কেবলমাত্র বইয়ের তালিকা সংকলনের কাজেও এই পদ্ধতি যে অসম্পূর্ণ তার দৃষ্টান্ত হ'ল BNB, INB এই পঞ্জী দুটির প্রতি পৃষ্ঠায় ডিউই সাঙ্কেতিক চিহ্নর শেষে [I] এই অসম্পূর্ণতার সাক্ষী। INBতে আন্তর্বিষয় সম্পর্ক বোঝাবার জন্য UDC-র ধাঁচের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়েছে!

ডিউইর অসম্পূর্ণতা যখন প্রকট হ'ল তখন ডিউইর পরিবর্তিত রূপে এলো U D C। বিষয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা কালোপযোগী করে রাখবার জন্য এই পদ্ধতির পশ্চাতে আছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান F I D। U D C ডিউই-র দুর্বলতার আংশিক উন্নতি করলেও এটি সর্বাঙ্গীনভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। কারণ এর মূলে রয়েছে জ্ঞানকে দশ ভাগে বিভক্ত করবার অন্তর্নিহিত ত্রুটি। ফলে এই কাঠামোর উপর নির্মিত মূর্তিতে নতুন রঙের ত্রুটি ঢাকা পড়ে নি।

বস্তুতঃ যে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ডিউই পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তা বর্তমানের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে পারছে না। Dichotomy তত্ত্ব সঞ্জাত Tree of Porphyri এক সময় বিষয় বিভাগের চূড়ান্ত কথা ছিল। কিন্তু আজ তার স্থান কেবলমাত্র logic বইয়ের পৃষ্ঠায়।

১ কোলনের দুরূহ পরিভাষিক শব্দ

কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি এবং তার তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল যে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত দুরূহ। বিশেষ করে রঙ্গনাথন ব্যবহৃত দুর্বোধ্য শব্দ কণ্টকিত সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য। জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য নিজস্ব প্রমাণ পারিভাষিক শব্দ (standard terminology) থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেও এই রকম অনেক শব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রমাণ নয় এবং সর্বত্র একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

বিশেষ করে বর্গীকরণের ক্ষেত্রে এইরূপ পারিভাষিক শব্দের অভাব রয়েছে। রঙ্গনাথন এই ধরণের শব্দ চয়ন এবং ব্যবহারে সচেষ্ট হয়েছেন।

আপাতঃদুর্বোধ্য শব্দগুলি যত্ন সহকারে অনুধাবন করলে এর অর্থ এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হবে। রঙ্গনাথন ব্যবহৃত দুটি শব্দ Array এবং Chain এর ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হ'ল। এর দ্বারা এই বক্তব্য সুস্পষ্ট হ'বে।
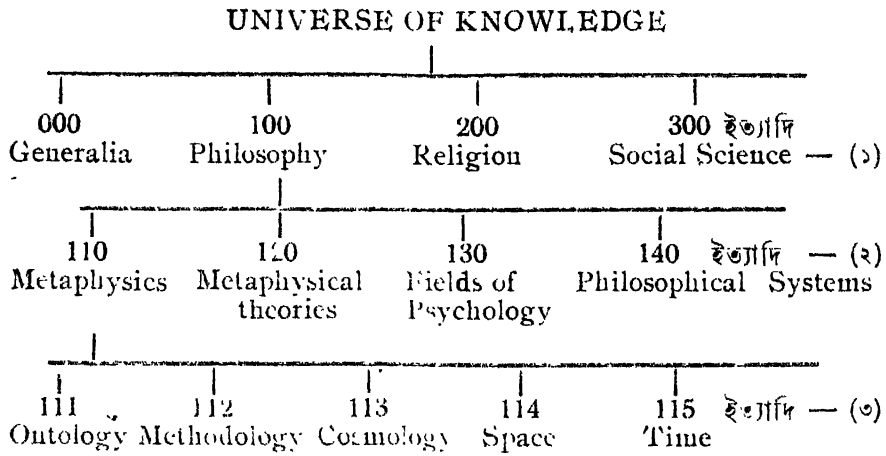
ডিউই বর্গীকরণের এই চিত্রটি আমাদের সুপরিচিত। রঙ্গনাথন এই বিভাগের এক পর্যায় কে Array বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ Universe of Knowledge এর 000, 100, 200, 300 ইত্যাদি বিভাগ হ'ল একটি array পুনরায় 100 এর 110, 120, 130, 140 ইত্যাদি বিভাগগুলি আর একটি array। অনুরূপ ভাবে 110 এর বিভাগগুলি আর একটি array। পর্যায়ক্রমে এগুলি হল (১) array of the first order, (২) array of the second order, (৩) array of the third order ইত্যাদি। রঙ্গনাথনের ভাষায় array হল, "... the sequence of the classes of a universe derived from it on the basis of a single characteristic and Co-ordinate arranged among themselves according to their ranks অর্থাৎ পদমর্যাদায় একই পর্যায়ভুক্ত বিষয়গুলি এক একটি array সৃষ্টি করে।

এবার Chain এর ব্যাখ্যা।

Philosophy (100)
|
Metaphysics (110)
|
Ontology (111)
|
ইত্যাদি
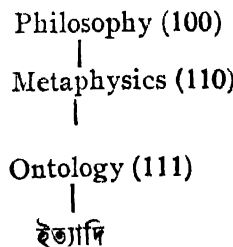
এই ধাপে ধাপে বিভাগগুলি Chain এর সৃষ্টি করেছে। 120 র বিভাগগুলি অনুরূপ ভাবে আর একটি Chain এর সৃষ্টি করবে। একটি Chain এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি পদমর্যাদায় কখনও একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। সর্বোপরি বিষয়টিকে রঙ্গনাথন first link এবং সর্বনিম্ন বিষয়টিকে last link বলে অভিহিত করেছেন। এই শব্দ দুটি summum genus এবং nifima species এর সঙ্গে তুলনীয়।

রঙ্গনাথনের ভাষায় Chain হ'ল "......a sequence of classes made up of any given class which forms the last link of the chain, its immediate universe, its immediate universe of the second remove, of the third remove...."

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পারিভাষিক শব্দ এবং আর নির্ধারিত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কি ?

বর্গীকরণ পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নের গুণাগুণ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে সাংকেতিক চিহ্নের অন্যতম কর্ম হ'ল যে তাকে নতুন নতুন বিষয়কে তালিকায় (schedule) যথাযোগ্য স্থান দিতে সক্ষম হ'তে হবে। নতুন বিষয়টি অন্য একটি বিষয়ের সমমর্যাদাসম্পন্ন অথবা অন্য কোন একটি বিষয়ের অধীনস্থ হতে পারে। সাংকেতিক চিহ্নের এই গুণকে রঙ্গনাথন যথাক্রমে Hospitality in array এবং Hospitality in chain বলেছেন। array এবং chain এই দুটি পারিভাষিক শব্দ দ্বারা সাংকেতিক চিহ্নের একটি মৌলিক গুণকে খুব সংক্ষিপ্ত অথচ যথার্থ রূপে প্রকাশ করা গেল।

রঙ্গনাথন-ব্যবহৃত বর্গীকরণ সম্বন্ধীয় পরিভাবিক শব্দ যে কোন পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। অবশ্য কতকগুলি নতুন শব্দ কেবল মাত্র কোলনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২ কোলন পদ্ধতির মূল ভিত্তি

কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির ভিত্তি হ'ল নতুন দৃষ্টিভঙ্গীজাত একটি বলিষ্ঠ তত্ত্ব, যা নতুন বিষয়ের চাপে কখনও বিপর্যস্ত হবে না। কোন একটি বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তা রঙ্গনাথন কথিত পাঁচটি মৌলিক শ্রেণীর (fundamental categories) বিভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি মাত্র। এগুলি হল :

Personality, Matter, Energy, Space এবং Time

প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে এই এক বা একাধিক শ্রেণী বা category বর্তমান। এই এক একটি রূপ হ'ল বিষয়টির এক একটি facet, যেমন Personality-র অভিব্যক্তি যে facet মারফৎ হয়েছে তার নাম Personality facet। অনুরূপ ভাবে Matter facet, Energy facet, Space facet এবং Time facet। এরপর এই facet গুলি বোঝানোর জন্য যথাক্রমে [P] [M] [E] [S] এবং [T] এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

বর্গীকরণের প্রথম ধাপে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করে এই facet গুলিকে অনুসন্ধান করতে হ'বে। এরপর এই facetগুলি বোঝানোর জন্য যথাক্রমে [P] [M] [E] [S] এবং [T] এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর এই facet গুলিকে একটি ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করতে হবে। প্রতিটি মূল বিষয়ের facet বিন্যস্ত করবার জন্য কোলন পদ্ধতিতে একটি সূত্র দেওয়া আছে। একে facet formula বলা হয়।

২১ P M E S T র উদাহরণ

একটি বিষয়ের মধ্যেই পাঁচটি মৌলিক শ্রেণী বিদ্যমান এমন একটি উদাহরণ হ'ল :

Cataloguing of Periodicals in the Indian University Libraries During 1950's.

এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় India—University Library—Periodicals —Cataloguing—1950's মূল বিষয় [রঙ্গনাথনের ভাষায় Basis class অথবা (Bc)] হল Library science এই (Bc) প্রথমে সংযুক্ত করলে দাঁড়ায় :

Library science—India—University Library Periodicals—Cataloguing—1950's ···(১)

এখন মূল বিষয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জন্য নিম্নলিখিত facet সূত্র প্রদত্ত হয়েছে :

2 [P] ; [M] : [E] [2P] ···(১)

এই সূত্রে 2 হ'ল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাঙ্কেতিক চিহ্ন, যেমন ডিউই এ 020। তারপর যথাক্রমে Personality facet, Matter facet এবং Energy facet। যতি চিহ্নগুলির এবং [2P]র ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

P M E S T র বিন্যাসক্রম ও সংযোজনী চিহ্ন

পাঁচটি মৌলিক শ্রেণীর অভিব্যক্তি পাঁচটি facet এর একটি নির্ধারিত বিন্যাসক্রম আছে এবং তাদের সংযুক্তি করণের জন্য পাঁচটি যতি চিহ্ন [Connecting Symbol অর্থাৎ (cs)] ব্যবহৃত হয় :

Facet	—	(Cs)
[P]		, (কমা)
[M]		; (সেমি কোলন)
[E]		: (কোলন)
[S]		. (ডট্)
[T]		. (ডট্)

যতি চিহ্ন সহ বিন্যাসক্রম :

[P] ; [M] : [E].. [S]. [T] ····(৩)

২৩ 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' বিষয়ে P M E S T র প্রয়োগ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের facet formula অনুযায়ী বিষয়টিকে তিনটি বৈশিষ্ট্যের (characteristics) ভিত্তিতে বিভক্ত করা চলে :

প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'ল গ্রন্থাগারের চরিত্র :—যেমন জাতীয় গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার ইত্যাদি। এগুলি হ'ল [P] শ্রেণীর facet।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই সমস্ত গ্রন্থাগারের পাঠ্যবস্তু। এই বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে প্রাপ্ত বিভাগগুলি হ'ল [M] facet এর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল গ্রন্থাগারের কাজকর্ম। যথা, পুস্তক নির্বাচন, বর্গীকরণ, সূচীকরণ লেনদেন, ডকুমেণ্টেশন ইত্যাদি। এই বিভাগ গুলি [E] শ্রেণীর facet।

এখন আলোচ্য বিষয় বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত facet গুলির [উপরে (১) এ] কোনটি কোন মৌলিক শ্রেণীভুক্ত তা নির্ধারণ করতে হবে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা মোটামুটি ভাবে শ্রেণীগুলি সনাক্ত করতে পারি।

Facet	শ্রেণী	
Library Science	(Bc)	
India	[S]	
University library	[P]	...(৪)
Periodicals	[M]	
Cataloguing	[E]	
1950's	[T]	

উপরোক্ত (১) এ [S] এবং [T] নেই। কিন্তু অতিরিক্ত facet আছে [2P]। (২) এবং (৩) এ [P] এর সংযুক্তিকরণ চিহ্ন, কমা ব্যবহৃত হয়নি (Bc) র পরে [P] থাকলে (Bc) র সঙ্গে [P] এর সংযুক্তিকরণের জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। অনেক জটিল বিষয় বিশ্লেষণ করলে [P] এবং [E] এর কয়েকবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। [P] এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে পূর্ববর্তী facet এর সঙ্গে (অবশ্য [E] বাদে) [E] এর সঙ্গে সংযুক্তির জন্য কোন চিহ্নের প্রয়োজন নেই। সংযুক্তির জন্য (,) কমা ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত (২) এ [2P] হচ্ছে [P] facet এর দ্বিতীয় পুনরাবৃত্তির নিদর্শন। এই সূত্রে [S] এবং [T] নেই। কিন্তু কোন সূত্রে [S] এবং [T] না থাকলেও প্রয়োজন মত এই দু রকম facet ব্যবহার করা চলে।

আরো কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ

এই প্রসঙ্গে রঙ্গনাথন ব্যবহৃত কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে প্রাপ্ত facetগুলির বিভাগকে focus (বহুবচনে foci) বা isolate focus বলা হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে [E] facet-এর নিম্নলিখিত বিভাগগুলি প্রদত্ত হয়েছে :—

1. Book Selection
2. Organisation
4. Co-operation
5. Technical treatment
   51 Classification
   55 Cataloguing

....

97 Documentation

Book selection, Organisation, Co-operation, Classification ইত্যাদি হ'ল [E] facetএর এক একটি focus বা isolate focus অথবা কেবলমাত্র isolate। আবার Book-selection, Organisation, Co-operation শব্দগুলিকে isolate term বলা হয়। 1, 2, 4, 5, 51, 56 ইত্যাদি সংখ্যাগুলি হ'ল isolate number।

অর্থাৎ focusগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করলে (রঙ্গনাথনের ভাষায় in the plane of language) তা হ'ল isolate term এবং সাংকেতিক চিহ্নে (plane of notation) প্রকাশ করলে তাকে বলা হয় isolate number। isolate term এবং isolate numberকে যথাক্রমে focal term এবং focal number ও বলা চলে।

উপরোক্ত (৪) এর facetগুলিকে এখন সূত্র অনুসারে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হ'ল :—

Library science (B C) University Library [P] ; Priodicals [M] : Cataloguing [E]. India [S] '1650's. [T] .... (৫)

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ ক'রে প্রাপ্ত facetগুলির isolate number সহ isolate term কোলন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে। এটিই হ'ল কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির তালিকা (Schedule)। এই থেকে তালিকা প্রয়োজনীয় isolate number facet সূত্রে বসিয়ে দিলে প্রয়োজনীয় কোলন বর্গীকরণ সংখ্যাটি (Colon Classification number) পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতি বীজগণিতের মান নির্ণয় অঙ্কের মত। উপরোক্ত (৫) এ isolate term এর স্থলে isolate number প্রতিস্থাপন করলে আলোচ্য বিষয়ের কোলন সংখ্যা হবে :

234 ; 46 : 55· 2. N 5

বিভিন্ন facet এর জন্য প্রদত্ত isolate number প্রয়োজন মত সংগ্রহ করে একত্রিত করে সংযোজনী চিহ্নের সহায়তায় কোলন সংখ্যা তৈরী হয় বলে কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিকে Mecano Setএর সঙ্গে তুলনা করা হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভৌগোলিক বিভাগ ([S] facet) এবং সময় বিভাগের ([T] facet) জন্য পৃথক তালিকা থেকে প্রয়োজনমত যে কোন বিষয়ের সঙ্গে এই isolate number করা চলে সেই তালিকা অনুযায়ী :—

2 ভারতবর্ষ (ভারতবর্ষের আসল চিহ্ন হ'ল 44। নিজের দেশ বোঝাতে গেলে 2 ব্যবহার করা যায়। গ্রেট বৃটেনের গ্রন্থাগারে ভারতবর্ষ বোঝাতে 44 ব্যবহৃত হবে। অনুরূপভাবে আমরা গ্রেট বৃটেন বোঝাতে 56 ব্যবহার করব, কিন্তু গ্রেট বৃটেনে 2 ব্যবহৃত হবে)।

N 5 1950—1959। 1900—1999 A. D, বোঝাতে N ব্যবহৃত হবে। 1950—1959 A. D. এই দশক (decade) বোঝাতে N 5। আবার কোন এক বিশেষ সালের জন্য আর একটি সংখ্যা যুক্ত করতে হ'বে। যেমন, N 55 = 1955।

P M E S T সনাক্তকরণ

এখন প্রশ্ন হ'ল যে একটি বিষয় বিশ্লেষণান্তে যে facet পাওয়া যাবে তার কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর (category) অন্তর্ভুক্ত তা কি করে বোঝা যাবে? রঙ্গনাথনের মতে [P] facet কে সনাক্ত করা একটু কষ্টকর। সেজন্য অন্য চারটিকে পৃথকীকরণের

পর যে অবশিষ্ট রহিল সেই হ'ল [P]। এই ধরণের অপ্রত্যক্ষ পন্থা (রঙ্গনাথনের ভাষায় Method of residues) রঙ্গনাথন সুপারিশ করেছেন। কারণ অন্য চারিটি facet সনাক্তকরণ সহজতর। [S] এবং [T] কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। [M] বস্তুবাচক facet অর্থাৎ দৃশ্যমান বস্তু এই facetএর অন্তর্ভুক্ত—যেমন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পাঠ্যবস্তু (বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি), সঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্র, চিত্রবিদ্যার অঙ্কনপট হিসেবে ব্যবহৃত কাগজ, পাথর, ক্যানভ্যাস ইত্যাদি। [E] যে-কোন প্রকারের কর্ম বা প্রক্রিয়া-সূচক facet। যেমন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সূচীকরণ, বর্গীকরণ প্রভৃতি কার্যবলী, খনিবিদ্যায় খননকার্য (excavation), আকরিক পরিকর্ম (ore dressing)। [E] কে সমস্যা-মূলক facet (Problem facet) বলা হয়। যেমন, চিকিৎসাবিদ্যায় (Medicine) ব্যাধি (disease) হল সমস্যামূলক facet। এ-গুলি [E] পদবাচ্য।

আপাতঃ দৃষ্টিতে এই বিশ্লেষণ বরং সনাক্তকরণ খুব জটিল বলে মনে হ'বে। কিন্তু পুস্তক বর্গীকরণে এই ধরণের বিশ্লেষণ কোন সমস্যা নয়। কোলন পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিষয় বিশ্লেষণান্তে যে facet formula এবং সেই facet অনুযায়ী বিভক্ত isolate term এবং isolate number প্রদত্ত হ'য়েছে, তার সাহায্যে বর্গীকরণ কার্য খুব সহজ।

ডকুমেণ্টেশনের জন্য সূক্ষ্ম বর্গীকরণ (Depth Classification) পদ্ধতির প্রয়োজন। তখন জটিল কোন বিষয়ের বিশ্লেষণ ও সনাক্তকরণ একটু শক্ত। কিন্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির মূলনীতির সঙ্গে পরিচিতি থাকলে অনুশীলনের মাধ্যমে এই কার্য সাধ্যাতীত নয়।

রঙ্গনাথন **Facet বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কয়েকটি সিদ্ধান্ত** বিশ্লেষণ কার্যের সুবিধার্থে কয়েকটি সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। (রঙ্গনাথন এই সিদ্ধান্তগুলিকে Postulates বলেন) সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত তা বলা যায় না, তবে সিদ্ধান্তগুলি বর্গী-করণের কর্মে সহায়ক এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতে রচিত। রঙ্গনাথন এ সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত করে মন্তব্য করেছেন : "A postulate is a statement about which we cannot use either of the epithets 'right' or 'wrong'. We can only speak of a set of postulates as 'helpful' or 'unhelpful'. The set of postulates given here have been found to be helpful in classifying documents". (**Elements,** Ed P 82) এই সিদ্ধান্তগুলি পাঁচটি মৌলিক শ্রেণী, তাদের বিন্যাসক্রম, [P], [M], [E] এর একাধিকবার পুনরাবৃত্তি, facet গুলির সংযোজনী চিহ্ন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত। এই ধরণের সিদ্ধান্তের সংখ্যা হ'ল ১৬। যেমন মৌলিক শ্রেণী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হ'ল :

There are five and only five Fundamental categories, viz. Personality, Matter, Energy, Space and Time.

এই শ্রেণীর বিন্যাসক্রম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত :

The five fundamental categories fall into the following sequence when arranged according to their decreasing concreteness :— P, M; E, S, T.

প্রত্যেকটি বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার ভিতর একটি মূল বিষয় (Basic facet = Basic class [Bc]). এবং উপরোক্ত পাঁচটি মৌলিক শ্রেণীর বিভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি বিদ্যমান। এক সম্বন্ধে দুটি সিদ্ধান্ত হ'ল :

১) Each subject has a basic facet.

২) A subject may have one or more isolate facets each of which can be deemed to be a manifestation of one and only one of the Five Fundamental Categories.

সুতরাং যে কোন একটি বিষয় কেবলমাত্র একটি মূল বিষয় অথবা একটি মূল বিষয় এবং পাঁচটি মৌলিক শ্রেণীর অভিব্যক্তি সূচক এক বা একাধিক facet নিয়ে সংগঠিত। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হল :

A subject consists either of a basic class or of a basic class and one or more manifestations of one or more of the Five Fundamental categories.

মূল বিষয় এবং মৌলিক শ্রেণীগুলির অভিব্যক্তি সূচক facet এর বিন্যাসক্রম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হ'ল :

The basic facet of the subject should be put first ; and the other facets should be arranged thereafter in the sequence of the decreasing concreteness of the fundamental categories of which they are respectively taken to be manifestations, provided there is not more than one basic facet and not more than one manifestation of any fundamental category.

প্রারম্ভিক আলোচনা প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আংশিক পরিচিত ঘটেছে।

শেষোক্ত সিদ্ধান্তে এই শর্ত আরোপিত হয়েছে। সেই শর্ত হল যে (Bc), [P] [M] [E] [S] এবং [T] facet এর উপস্থিতি মাত্র একবার ঘটলে এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হ'বে। কিন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে একটি বিষয়ে [P] [M] এবং [E] এর একাধিকবার উপস্থিতি ঘটতে পারে। এই পুনরাবৃত্তি কি ভাবে হ'তে পারে এবং হ'লে বিন্যাসক্রম কি হবে সে সম্বন্ধেও কয়েকটি সিদ্ধান্ত আছে। এ ব্যতীত বিন্যাসক্রম সম্বন্ধে পৃথক কয়েকটি নীতিও নির্ধারিত হয়েছে। এই জটিল বিষয় পরে আলোচিত হ'বে।

এর সবগুলিই facet-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি-ভিত্তিক-বর্গীকরণ-তালিকা। সবগুলিই কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে কোলন বর্গীকরণ অনুকরণে নয়, অর্থাৎ কোলনের বিষয় বিভাগ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি, তবে কোলন বর্গীকরণের মূলনীতি অনুসরণে রচিত। সম্পূর্ণভাবে

সুতরাং কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিটিই রঙ্গনাথনের একমাত্র অবদান নয়। সুধু একটি বর্গীকরণ পদ্ধতি রচনা করবার জন্য তিনি তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ভিত্তি সৃষ্টি করেছেন, এই ভিত্তি গড়ে উঠেছে কোলনকে কেন্দ্র করে। (ক্রমশঃ)

তপন সেনগুপ্ত

সূচীর রূপ

তুলনামূলক বিচারে কার্ড সূচী মুদ্রিত সূচীর চাইতে অনেক বেশী কার্যকরী ও সুবিধাজনক হওয়ার ফলে গ্রন্থাগারে কার্ড সূচীর ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু বর্তমানে লাইনোটাইপ যন্ত্রের উৎকর্ষের ফলে মুদ্রণ ব্যবস্থার উন্নততর পদ্ধতি মুদ্রিত সূচী সংকলনের যান্ত্রিক অসুবিধাগুলি অনেক পরিমাণে দূর করেছে। সেই সাথে প্রধান গ্রন্থাগারগুলিতে কার্ড সূচীর ক্রমবর্দ্ধমান আকৃতি এবং কার্ডসূচী সাজানোর বিভিন্ন প্রণালীর বিভিন্ন ধরণের জটিলতা, কার্ডসূচীর কার্যকরীতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে প্রশ্নের ঝড় তুলেছে। এই উভয়বিধ কারণে অধুনা মুদ্রিত সূচীর পুনঃপ্রচলন ও প্রসারের দিকে একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে এবং এবিষয়ে পাশ্চাত্যের প্রধান গ্রন্থাগারগুলি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে মুদ্রিত সূচী ও কার্ড সূচীর সুবিধা-অসুবিধাগুলির নিরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাব যে মুদ্রিত সূচীর প্রধান সুবিধা হল এই যে এই সূচী, যেহেতু স্থানান্তরিত করা চলে, গ্রন্থাগারের ভিতরে বা বাইরে যে কোন স্থানে ব্যবহারের জন্য অন্য পাওয়া যেতে পারে। সম্ভব হলে পাঠকের ব্যবহারের জন্য অন্য বইয়ের মত home issue করা চলতে পারে। একই পাতায় অনেকগুলি সংলেখ সাজানো থাকার ফলে এই সূচী ব্যবহার করতে সময় অপেক্ষাকৃত কম লাগে। মুদ্রিত সূচী গ্রন্থাগারের সংগ্রহ প্রকাশ করে, সুতরাং কোনও পাঠক তাঁর প্রয়োজনীয় বইয়ের জন্য গ্রন্থাগারে না গিয়েও অনুসন্ধান পেতে পারেন। মুদ্রিত সূচী Union catalogue তৈরীর কাজে সহায়তা করে। এই সূচী গ্রন্থাগারে খুবই অল্প স্থান অধিকার করে। এ ছাড়া মুদ্রিত সূচী একটী গ্রন্থাগারের সংগ্রহের স্থায়ী ইতিহাস যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার কাজে সহায়তা করে। আমাদের দেশে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় লং সাহেবের ক্যাটালগ, বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ক্যাটালগ প্রভৃতি বহু অজানা তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।

কিন্তু মুদ্রিত সূচীর প্রধান অসুবিধা হ'ল এই যে নতুন কোনও সংলেখ উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করা চলে না, সুতরাং মুদ্রিত সূচী কখনই গ্রন্থাগারের সংগ্রহের সম্পূর্ণ হিসাব দিতে পারে না। সব সময়ই কিছু বই তালিকাভুক্ত করতে বাকী থেকে যায় যা পরবর্তী মুদ্রণের আগে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এছাড়া খরচের দিক থেকেও মুদ্রিত সূচী কার্ড সূচী অপেক্ষা ব্যয়বহুল।

কার্ড সূচীর প্রধান সুবিধা এই যে প্রতিটি সংলেখের জন্য পৃথক কার্ড ব্যবহৃত হয়। তাই সংলেখগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী সাজানো যায়; যে কোন সময় নতুন সংলেখ যথাস্থানে সন্নিবেশ করা যায়; অপ্রয়োজনীয় সংলেখ সরিয়ে নেওয়া সহজ। কার্ডসূচী প্রতিনিয়ত

গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। কিন্তু এই সূচী শুধুমাত্র গ্রন্থাগারের ভিতরেই ব্যবহার করা চলতে পারে। গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সে ছাড় কার্ড সূচী গ্রন্থাগারের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকে এবং গ্রন্থাগারের সংগ্রহ বাড়ার সঙ্গে সংগে কার্ড সূচীর আয়তন বাড়তে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের প্রধান গ্রন্থাগার-গুলিতে কার্ড সূচীর ক্রমবর্দ্ধমান আকৃতি গ্রন্থাগারের পথে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

এছাড়া সাধারণ পাঠকের মনের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে অধিকাংশ পাঠকই কার্ড সূচী সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু নন। বরং আরও স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে তারা বই আকারে মুদ্রিত সূচীকে কার্ডসূচী অপেক্ষা অনেক স্বাভাবিক এবং নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেন। Public Library Enquiry রিপোর্টে Bernard Berelson বলেছেন যে শতকরা চারজন মাত্র পাঠক কার্ড সূচী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং ভালভাবে কার্যসূচী ব্যবহার করে থাকেন। Ernest Savage মন্তব্য করেছেন "Readers hate cards, refer to them as little as they can." কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতেও দেখা যায় অধিকাংশ পাঠকই মুদ্রিত সূচী ব্যবহার করেন। কার্ড কেবিনেটের সামনে খুব একটা দেখা যায় না।

ইদানীং গ্রন্থাগারিকদের মনেও কার্ড সূচী সম্পর্কে বিতৃষ্ণা ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। কার্ড সূচী প্রসঙ্গে A. E. Mercer সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন—"It is too big. But worse than that—it misbehaves.·······It is a great mystery ·······It's an impostor. It's an intruder. As a librarian, therefore, I do not, myself, like card catalogues." অনেকেরই মতে আজকাল কার্ড সূচীর ব্যবহার সীমিত হওয়া উচিত। কেউ কেউ এ-কথাও মনে করেন কার্ড সূচীর ব্যবহার দপ্তরের কাজ কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। অবশ্য ব্যক্তিগত মতামত যাই হউক না কেন একথা অনস্বীকার্য সাধারণ গ্রন্থাগারে কার্ডসূচী কিংবা মুদ্রিত সূচীর কোন একটিকে পুরোপুরি সরিয়ে রাখা চলে না। এই উভয় ধরণের সূচীর দোষগুণ বিচার করলে স্পষ্টই দেখা যাবে যে কোন একটির স্থান অপটির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত করা চলে না। বিভক্তসূচীর (Divided Catalogue) মাধ্যমে কার্ড সূচীর জটিলতা কিছু কমানো চলে মাত্র কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান আয় আয়তন রোধ করা সম্ভব নয়।

মুদ্রিত সূচীর ইতিহাস খুঁজলে আমরা দেখতে পাই যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি গ্রেট বৃটেন এবং আমেরিকায় লেজার বইয়ে হাতে লিখে বা স্লিপ জুড়ে যে সূচী রাখা হ'ত তার অনুপূরক হিসেবে মুদ্রিত সূচীর ব্যবহার ছিল। অবশ্য বড় বড় গ্রন্থাগারগুলি কখনই সম্পূর্ণ সূচী প্রকাশ করতে পারত না। তাছাড়া এই ধরণের সূচীতে সংলেখগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল। সাধারণতঃ Special Collections-এর মুদ্রিত সূচীর প্রচলন বেশী ছিল এবং এই সূচীগুলিতে সংলেখগুলি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা থাকত। উনিশ শতকের শেষ পর্য্যায় থেকে ব্যাপক পরিমাণে মুদ্রিত সূচী প্রকাশের চেষ্টা আরম্ভ হল এবং সেই সাথে অনুপূরক প্রকাশ করে ঐ সূচীগুলিকে যথাসম্ভব up-to-date রাখার চেষ্টা শুরু হ'ল। আমেরিকায়

the Boston Athenaeum, the Peabody Institute of Baltimore, the Astor Library, New york এবং the Carnegie Library, Pittsburg-এর মুদ্রিত সূচী উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংল্যাণ্ডে ১৯০৩ খৃঃ লণ্ডন লাইব্রেরী ক্যাটালগ প্রকাশিত হয় এবং তারপর আটটি বাৎসরিক অনুপূরক সংযোজিত হয়, ১৯০৯ খৃঃ তিন খণ্ডে Subject Index এবং ১৯১৩-১৪ খৃঃ নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮১—১৯০০ খৃঃ মধ্যে Catalogue of Printed Books in the Library of the British Museum published up to 1880 পঁচানব্বই খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং ১৯০০—১৯০৫ খৃঃ মধ্যে তের খণ্ড অনুপূরকের সাহায্যে এই সূচী ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বই তালিকাভুক্ত করে। এই সময়ে ১৮৯৭ সালে Bibliotheque Nationale প্যারী থেকে Catalogue General প্রকাশ করতে শুরু করে।

১৮৭৬ খৃঃ থেকে শুরু করে এই শতকের শেষ পর্যন্ত কার্ড সূচীর ক্রমপ্রচলন এবং মুদ্রিত সূচীর উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা সমান তালে চলতে থাকে। ১৮৭৬ খৃঃ প্রকাশিত Cutter's Rules for a Dictionary Catalogue মূলতঃ মুদ্রিত সূচীর জন্যে লেখা হয়। কিন্তু ১৯০৪ খৃঃ চতুর্থ সংস্করণে কার্ড সূচীর প্রয়োজন অনুযায়ী এই নিয়মগুলিকে পরিবর্ধিত করা হয়। এই সময়ে গ্রেট বৃটেনে কার্ড সূচীর ব্যবহার খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। বহু গ্রন্থাগার লেজারের পরিবর্তে শিফ্‌ সূচী ব্যবহার আরম্ভ করল। একটি পাতায় একটি মাত্র সংলেখ লেখা হ'ত এবং এই খোলা পাতাগুলি সময়য় উপযোগী বাঁধাইয়ের সাহায্যে রাখা হ'ত। ফলে নতুন সংলেখ যথাস্থানে সন্নিবেশ করা চলত।

১৯৪২ খৃঃ ১৬৭ খণ্ডে প্রকাশিত বিখ্যাত LC Catalog মুদ্রিত সূচীর জয়যাত্রা শুরু করল বলা চলে। ১৯৪৭ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর ৪২ খণ্ড অনুপূরক প্রকাশিত হয়। এর পর মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক Cumulation সহ Author Catalog প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৫৬ খৃঃ থেকে এই সূচী পরিবর্ধিত রূপে National Union Catalog নামে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সূচীগুলি মূলতঃ যে সব গ্রন্থাগার মুদ্রিত LC কার্ড ব্যবহার করে তাদের স্থান এবং সময় বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়েই মুদ্রিত হয়। লাইব্রেরী অফ্‌ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এই সূচী বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিয়ে মুদ্রিত হয়নি। LC মুদ্রিত কার্ডগুলির ফটোলিথোগ্রাফি মুদ্রণের সাহায্যে এই সূচী মুদ্রিত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে মুদ্রিত সূচীর একটি বড় অন্তরায় দূর করা সম্ভব হয়েছে। Cumulation বর্তমানে আর গুরুতর সমস্যা নয়। শুধুমাত্র LC মুদ্রিত সূচীর ক্ষেত্রেই নয়—লাইনোটাইপের উন্নত মুদ্রণ ব্যবস্থায় Cumulation আগের তুলনায় অল্প সময়ে স্বল্প পরিশ্রমে সম্ভব। তাই বর্তমানে মুদ্রিত সূচীকে আগের তুলনায় অনেক বেশী up-to-date রাখা সম্ভবপর হচ্ছে।

আমেরিকায় বহু গ্রন্থাগার কার্ড সূচীর সাহায্যে মুদ্রিত সূচী প্রকাশ করছে, যেমন King County Public Library, Seattle, Lamont Library, Los Angeles

County Public Library, ইত্যাদি। ইংল্যাণ্ডে গ্লাসগো, ওয়েষ্টমিনস্টার লিভারপুল, ব্রিষ্টল সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতেও মুদ্রিত সূচী ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকাশিত মুদ্রিত সূচীগুলি গ্রন্থাগারের ভিতরে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না—অন্ততঃ সাধারণ পাঠকের এই খোঁজার তাগিদ তো নয়ই। এই সূচীগুলির মধ্যে (1) Author Catalogue of Printed Books in European Languages, 4 Vols., A—L 1941-43,Vol. 5 : M 1953 এবং Subject Index, 4 Vols., 1908—39 ; (2) Author Catalogue of Printed Books in Bengali Language, 2 Vols., A—L, 1941-43 এবং (3) Catalogue of Sanskrit, Pali and Prakrit Books, Vol. 1, A—G, 1951 প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কার্ড সূচীর পরিবর্তে এগুলির ব্যবহার আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়—অন্ততঃ প্রকাশ তারিখ থেকে স্পষ্টই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই সূচীগুলি গ্রন্থাগারের সংগ্রহের সঠিক খবর বহন করে না। পাঠকেরা বিভক্ত সূচীর সাহায্যেই নিজেদের প্রয়োজনীয় বই বা অন্য তথ্যের অনুসন্ধান করে থাকেন।

এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে মুদ্রিত সূচী কি শুধুমাত্র bibliographical reference work-এর জন্যে ব্যবহৃত হবে, না পাঠকের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্য গ্রন্থাগার-সংগ্রহের সঠিক হদিস দেবার উপযোগী কার্ড সূচীর স্থান গ্রহণ করবে ?

মুদ্রণ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি এবং কার্ড সূচীর ক্রমবর্দ্ধমান আকৃতি ও জটিলতা মুদ্রিত সূচীর বহুল ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। অবশ্য কার্ড সূচীর সম্পূর্ণ অপসারণ সম্ভবপর বলে মনে হয় না। নিউজিল্যাণ্ডে বর্তমানে সর্বসাধারণের জন্য মুদ্রিত সূচীর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস বহু গ্রন্থের রচয়িতাদের, যেমন সেক্সপীয়র, কিছুদিন অন্তর মুদ্রিত সূচী প্রকাশ করেন। ঐ মুদ্রিত সূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সংলেখগুলি কার্ড ক্যাবিনেট থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে শুধু একখানি মাত্র কার্ডে কত তারিখের বই পর্যন্ত ঐ মুদ্রিত সূচীতে স্থান পেয়েছে জানানো হয়। এই মুদ্রিত সূচী সাধারণের ব্যবহারের জন্য কার্ড সূচীর পাশেই রাখা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে কার্ড ক্যাবিনেটে প্রচুর পরিসর বেঁচে যায়। Special Collection সম্পর্কে তো এই ব্যবস্থা খুবই সহজ প্রযোজ্য। আমাদের দেশের প্রধান গ্রন্থাগারগুলিতেও সম্ভবতঃ এই ধরণের মুদ্রিত সূচী প্রকাশ করা অসম্ভব নয়। LC বা IBM মুদ্রিত কার্ডের মত কোনও ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। তাই আমেরিকায় মুদ্রিত সূচী সংকলন যতটা সহজ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে আমাদের পথে মুদ্রিত সূচী সংকলনের কাজ ততটা সহজ নয়। কিন্তু কার্ডসূচীর ক্রমবর্দ্ধমান ভয়াবহতার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে মুদ্রিত সূচীর সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদে উন্নততর মুদ্রণ ব্যবস্থা মুদ্রিত সূচীর নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র গ্রন্থাগারগুলিতে কার্ড সূচীর সমস্যা সমাধানে এই নতুন সম্ভাবনার স্বীকৃতি গ্রন্থাগারে সূচীকরণের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করতে চলেছে বলে মনে হয়।

এই প্রবন্ধ লিখতে

1) New Zealand Libraries—bulletin of the N. Z. Library Association, Vol, 26, No. 3, April, 1963
2) The National Library of India Golden Jubilee Souvenir, Calcutta, 1953.
3) Mann, Margaret
Introduction to Cataloging and Classification of Books, A. L. A. Chicago, 1943-এর সাহায্য নিয়েছি।

গ্রন্থাগার সংবাদ

সুধাস্মৃতি পাঠাগার, বসিরহাট, ২৪ পরগণা

গত ২৯শে জুন বৈকাল ৫ ঘটিকায় বেলগড়িয়া সুধাস্মৃতি পাঠাগারের পক্ষ হইতে পাঠাগার কক্ষে যুগস্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রবোধানন্দ দাস, বি. এ. মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীফণীভূষণ ভট্টাচার্য এম. এ. মহাশয়। 'বন্দে মাতরম্' গীত শ্রীদাশ মহাশয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় এবং "সন্তান দলের" পক্ষ হইতে বঙ্কিম আলেখ্যে মাল্যদানপূর্বক শ্রীদাশ তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন শ্রীঅজিতকুমার লাহিড়ী বি. এল. মহাশয়। এই সভার প্রধান আলোচক ছিলেন শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত, বি. এ. মহাশয় এবং অন্যান্য আলোচকের মধ্যে সর্বশ্রী প্রবোধানন্দ দাশ, বি, এ. ; ফণীভূষণ ভট্টাচার্য, এম. এ. ; অমলকুমার ঘোষ ; কৃষ্ণদাস পাল ; দেবপ্রসাদ দে, বি. এ. ও কমল ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ জয়হরি মণ্ডলের কণ্ঠে সমাপ্তি সঙ্গীত গীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ঐ দিন তরুণসংঘ পরিচালিত সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রের অর্ধবর্ষ পূর্তি উৎসবে শ্রীদাশ উদ্বোধনী ভাষণ দেন। কেন্দ্রের পক্ষ হইতে শ্রীমতী তারা লাহিড়ী ও শ্রীযুগলকিশোর দেওয়ান মহাশয় সঙ্গীত শিক্ষার উৎকর্ষতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। উৎসবের শেষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগার, পানিত্রাস, হাওড়া।

গত ২৮শে জুলাই '৬৩ রবিবার সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে পানিত্রাস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জন্ম শতবর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে বাগনান আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীনয়নরঞ্জন মিত্র ও শ্রীমদনমোহন গরাই। শ্রীগরাই এক সুদীর্ঘ ভাষণে কবির জীবনদর্শনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। "শাজাহান" ও "মেবার পতন" নাটকের দৃশ্য অভিনয় করিয়া যথাক্রমে রূপায়ণী এবং বাণীবীথিকার সভ্যবৃন্দ দর্শকদের মুগ্ধ করেন। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅমিয়কুমার পালিত, অগ্রদূত ও রূপায়ণী সম্প্রদায়। শ্রীসুনীলচন্দ্র সিংহ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কুলকুড়ি বঙ্কিম গ্রন্থাগার, বীরভূম।

গত ২৮ জুন, ১৯৬৩ শুক্রবার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থাগারের সকল প্রকার সভ্যবৃন্দ এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আলোচনা ও তাঁহার দেওয়াল চিত্রে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। উৎসব সভায় পৌরহিত্য করেন গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতির সভাপতি মহাশয়। গ্রামস্থ জনসাধারণও উৎসব-বাটিতে যোগদান করেন।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থাগার প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার নামানুসারে "বঙ্কিম গ্রন্থাগার" নামে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মহম্মদবাজার থানার মধ্যে ইহাই একমাত্র সরকার অনুমোদিত গ্রামীন গ্রন্থাগার।

বর্তমানে গ্রন্থাগারটি, গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ হিসাবে ছয়টি গ্রাম্য গ্রন্থাগারে পুস্তক সরবরাহ করিতেছে। •

গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার, গরলগাছা, হুগলী

গত ৬ই জুলাই ১৯৬৩ সাল, রবিবার,, সাধারণ গরলগাছা, পাঠাগার (আঞ্চলিক পাঠাগার) ভবনে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ও চণ্ডীতলা (২নং) উন্নয়ন ব্লকের সহায়তায় উক্ত ব্লক এলাকার সকল পাঠাগার কর্মীগণের এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা শাখার উপমুখ্য পরিদর্শক শ্রীমন্মথনাথ রায় ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় উদ্বোধনী ভাষণের প্রারম্ভে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁহার কর্মময় জীবনের উল্লেখ করেন। তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন যে গ্রন্থাগারিককে সর্বদা পাঠকের সুরুচি দৃষ্টির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাঁহার দায়িত্ব তিনি পাঠক সৃষ্টি করিবেন। ইহার পরে হুগলী জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীনীতিশচন্দ্র বাগচী মহাশয় তাঁহার পরিসংখ্যান সম্বলিত ভাষণে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীগণের ভূমিকা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি গ্রন্থাগার সুষ্ঠভাবে পরিচালনার পথে বাধাবিপত্তির কথাও উল্লেখ করেন। ইহার পর স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীকানাইলাল দে মহাশয় তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগারে সরকারের ভূমিকা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। স্থানীয় সমাজ শিক্ষা সংগঠক শ্রীভোলানাথ দেবনাথ মহাশয়ের ভাষণে স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির একটি সুস্পষ্ট চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বয়স্ক শিক্ষা ও শিশু শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রন্থাগারে গ্রন্থ নির্বাচন সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীগণকে অবহিত করেন।

এই আলোচনাচক্রে ১৯টি পাঠাগারের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন ও স্থানীয় উন্নয়ন অধিকারিক মহাশয়ের উপস্থিতিতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বিভিন্ন পাঠাগার কর্মীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্য বিবরণী পাঠ করেন। সভায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলি সার্বিক উন্নয়ন সাধনের জন্য একটি ব্লক গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উক্ত দিবসে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠাগার প্রাঙ্গনে 'বনমহোৎসব' উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীমন্মথনাথ রায় ও শ্রীনীতিশচন্দ্র বাগচী মহোদয় পাঠাগার প্রাঙ্গনে একটি বৃক্ষ রোপণ করেন।

পরিশেষে গরলগাছা সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদক উপস্থিত সকল গ্রন্থাগার প্রতিনিধি ও অতিথিবৃন্দকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সর্বরূপে সহায়তা করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিষদ কথা

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-স্মরণে

১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৩ পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক পরলোক গমনে সকলেই মর্মাহত হয়েছেন। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য ২৩শে নভেম্বর বৈকাল ৫২ ঘটিকায় পরিষদ কার্যালয়ে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন বক্তা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তব্যনিষ্ঠা, সকলের প্রতি সুমধুর ব্যবহার এবং পরিষদের প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে পরিষদের সমস্ত কার্যাবলী শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নখদর্পণে ছিল। সম্মেলন, বার্ষিক সাধারণ সভা, গ্রন্থাগার দিবস, গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ ক্লাশ সমস্ত ব্যাপারের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি সম্পাদক ও অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের এই সমস্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই সজাগ করে দিতেন। এই সমস্ত কার্যে তিনি তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাকেও রেহাই দেননি। চিঠি পত্রে ডাক টিকিট লাগানো, ঠিকানা লেখা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁরাও সহায়তা করেছেন। তাঁর অভাব পূরণ যে কি ভাবে হবে তা তিনি জানেন না। সভাপতি শ্রীবসু বলেন যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে কেবলমাত্র পরিষদের কর্মী হিসাবে পরিচিত নন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী হিসেবেও তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ ছিল। তাঁর মৃত্যুকে তিনি ব্যক্তিগত ক্ষতি বলে অভিহিত করেন। পরিষদের পক্ষেও এ অপূরণীয় ক্ষতি।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

"নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত এবং দরদী গ্রন্থাগার কর্মী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার বিদেহী আত্মার ঊর্ধ্বগতি কামনা করিতেছে।

এই সভা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের বিয়োগদুঃখে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছে।"

বার্তা বিচিত্রা

পঞ্চম ইয়াসলিক সম্মেলন ঃ

পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ২১শে থেকে ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬৩ এস. পি. কলেজে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অফ স্পেশাল লাইব্রেরীজ এণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারস এর (I A S L I C) পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের ব্যবস্থার জন্য পুণা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যক্ষ ওয়াই এস মহাজনের সভাপতিত্বে পুণার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং নাগরিকদের নিয়ে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছিল।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ডাঃ রঘুনাথ পরাঞ্জাপে। সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি পুস্তক প্রদর্শনীরও তিনি উদ্বোধন করেন। জাতীয় রসায়ণ বীক্ষণাগারের অধ্যক্ষ ডাঃ কে. ভেঙ্কটরমণ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ডাঃ এস. আর. রঙ্গনাথন।

সম্মেলন উপলক্ষে Document and Data Processing এবং Problems and and Prospects of Library Associations in India এই দুটি বিষয়ের উপর আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। ডাঃ বি. ভি. রাঘবেন্দ্র রাও এবং ডাঃ জগদীশ শর্মা এই সভা পরিচালনা করেন। ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে প্রায় ২০০ শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

পুস্তক প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষে প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি পুস্তক সংগ্রহ ছিল। এই সংগ্রহে কয়েকখানি মারাঠী ভাষায় গ্রন্থ ছিল।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা সমিতি একটি মনোজ্ঞ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে ঐতিহ্যমণ্ডিত পুণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহামহোপাধ্যায় ডি. ভি. পোতদার লিখিত সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুণার অবদান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, মহারাষ্ট্রের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস, মারাঠী ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক ও পত্রিকার একটি সঠীক তালিকা উল্লেখযোগ্য।

মারাঠী ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত পুস্তকের সংখ্যা ৩১ এবং নিয়মিত পত্রিকার সংখ্যা ২।

অভ্যর্থনা সমিতি পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়কার গ্রন্থাগার, জাতীয় গবেষণা বীক্ষণাগার এবং খাড়াগভাসলায় অবস্থিত জাতীয় প্রতিরোধ শিক্ষালয় পরিদর্শনের আয়োজন করেছিলেন।

সম্মেলনের ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহ এবং বিশেষ করে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সক্রিয় সহযোগিতা পুণার সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের তালিকায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নাম পুণার গ্রন্থাগার আন্দোলনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। সম্মেলনের ব্যয় নির্বাহের জন্য পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় সরকার, মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার, পুণা পৌর-সভার আর্থিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য।

সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীকে, এস, হিংওয়ে এবং পুণা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এবং এস. পি. কলেজের গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দের কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবসের চিন্তা

২০শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। আজ হইতে প্রায় তিন দশক পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সমবেত চেষ্টায় গ্রন্থাগারের উন্নতি ও শিক্ষার বিস্তৃতি কামনায় গ্রন্থাগার পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে দেশের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। সরকারের বাধার স্থানে আজ সরকারী সহযোগিতা আমাদের কার্যকে অনেকাংশে সুকর করিয়াছে। তবুও যে উদ্দেশ্যে পরিষদ্ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা হইতে আজও আমরা দূরে—বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছি।

আজিকার গ্রন্থাগার দিবসে আমাদের আত্মচিন্তা করিতে হইবে। উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার ঠিক্ পথটি আমরা অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিতেছি কিনা বিবেচনা করিতে হইবে। গ্রন্থাগারগুলি পরস্পর সহযোগিতার পথ ধরিয়াছে কিনা দেখিতে হইবে। সর্বনাশকর প্রতিযোগিতা, এবং সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর গৌরবাকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়া আমরা সম্পূর্ণ দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেছি কিনা আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

গ্রন্থাগার পরিচালনা আজও আমাদের দেশে বৃত্তি নহে, ব্রত। এই ব্রতধারীরা একে অন্যের সহযোগিতায় কাজ করিবার পণ গ্রহণ করিলে স্বল্প সামর্থ্য লইয়াও নানা বিষয়ে জনসাধারণকে সাহায্য করিতে পারেন। ছোট ছোট অঞ্চলে তাঁহারা রীতিমত গবেষণার জন্য না হউক, অন্ততঃ পরিকল্পনানুযায়ী অধ্যয়নের সুব্যবস্থা করিতে পারেন।

গ্রন্থাগার-কর্মীদের এই দিবস উপলক্ষ্যে অধিকতর জনসংযোগ করা বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগারের সমুন্নতির জন্য অর্থসংগ্রহের মধ্যে এই সংযোগ প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, সাধারণে যাহাতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং গ্রন্থাগার জন-জীবনে কী সাহায্য করিতে পারে তাহা বুঝে সে বিষয়েও গ্রন্থাগারকে চেষ্টিত হইতে হইবে। লোক-সংগ্রহ ও সংগঠন সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতির মূল কথা। এই দুই বিষয়ে অধিকতর সচেতন হইবার জন্য আমরা আজ আমাদের সহকর্মীদের আহ্বান জানাইতেছি।

———

বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী

পশ্চিমবঙ্গে ছোট উচ্চ বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার কিভাবে চলিতেছে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তাহা পরিচালনা করা যায় কিনা, ছাত্রছাত্রীরা তাহা যথাযথভাবে ব্যবহার করে কিনা, না করিলে তাহার অন্তরায় কি, কোন ধরণের পুস্তক বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগারে নির্বাচিত হওয়া উচিত ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার চিন্তা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহুদিন হইতেই করিয়া আসিতেছে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগার পরিষদ উপসমিতিও গঠিত হইয়া কার্যারম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করিতে হইলে উহার কর্তৃপক্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। কাজেই আমরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নীচের প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য পাঠাইতেছি। আশা করি বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে কর্তৃপক্ষ আমাদের এই প্রচেষ্টার সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিবেন এবং প্রশ্নাবলীর পাশে প্রার্থিত উত্তর জানাইতে তৎপর হইবেন। উত্তর সহ প্রশ্নাবলীর পৃষ্ঠা কয়টি কাটিয়া সম্পাদক, বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগার উপ-সমিতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪ এই ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি—**শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**, সম্পাদক।

প্রশ্নাবলী

১ বিদ্যালয়ের নাম ঠিকানা—

২ ছোট উচ্চ (জুনিয়র হাই) /মাধ্যমিক/ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়—

৩ প্রতিষ্ঠাকাল—

৪ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—

৫ শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা—

৬ গ্রন্থাগারের পুস্তকের সংখ্যা—ইংরেজী—

বাংলা—

৭ পুস্তক তালিকাভুক্ত করার প্রণালী—

৮ গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য কি কি খাতাপত্র রাখা হয় ?—

৯ পৃথক গ্রন্থাগারগৃহ আছে কি ?

১০ ছাত্রছাত্রীদের বসিয়া পড়িবার ঘর আছে কি ?—

১১ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের খোলা ও বন্ধ থাকার সময়—

১২ দৈনিক পাঠকের সংখ্যা—

১৩ গ্রন্থাগার হইতে দৈনিক পুস্তক গ্রহীতার সংখ্যা·
১৪ কোন্ বিষয়ের বইয়ের চাহিদা বেশী—
১৫ বই নেওয়ার জন্ম জমা টাকার পরিমাণ—
১৬ ছাত্রছাত্রীরা কোন চাঁদা দেয় কি ?—
১৭ দীর্ঘ ছুটিতে বই বাড়ীতে নিতে পারে কি ?—
১৮ পুস্তক ক্রয়ের বার্ষিক বরাদ্দ—
১৯ সরকারী / অন্ম প্রকার সাহায্য—
২০ সংবাদপত্রের সংখ্যা—
২১ সাময়িকীর সংখ্যা—
২২ পৃথক গ্রন্থাগারিক আছেন কি ?—
২৩ তাঁহার মাসিক বেতন—
২৪ তিনি শিক্ষণপ্রাপ্ত কি ?—
২৫ শিক্ষণের মান—
২৬ শিক্ষক-শিক্ষিকাই কি গ্রন্থাগারিক ?—
২৭ তাঁহাদের কাজের সময়—
২৮ পৃথক পারিশ্রমিকের পরিমাণ—
২৯ বই খোয়া যায় কি ?
৩০ বৎসরে কতখানা ?
৩১ খোয়ান রোধ করার চেষ্টা হইয়াছে কি ?—
৩২ তাহার ফল কি ?
৩৩ গ্রন্থাগার পরিচালনে কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি ?—
৩৪ কোন শিক্ষাপ্রদ গৃহক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে কি ?—

———

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

ত্রয়োদশ বর্ষ | দশম সংখ্যা | মাঘ ১৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেসন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবৃতি:

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

২। প্রকাশের সময় ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ১০০।১, ভুপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪

৪। প্রকাশকের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ১০০।১, ভুপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪

৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ৩৩, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪

৬। স্বত্বাধিকারী—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

আমি সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সম্পূর্ণ সত্য।

তারিখ — স্বাঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩। — প্রকাশক গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৩শ বর্ষ]　　　　মাঘ : ১৩৭০　　　　[১০ম সংখ্যা

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

কোলন বর্গীকরণ প্রসঙ্গে

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সমস্ত বর্গীকরণ পদ্ধতির ন্যায় কোলনেও সমগ্র জ্ঞানের জগৎকে কতগুলি মূল বিষয়ে ভাগ করা হয়েছে। এগুলিকে Main Class (Mc) বলা হয়। কোলন এর সপ্তম সংস্করণে (শীঘ্রই প্রকাশিত হবে) নিম্নলিখিত (Mc) র তালিকা প্রদত্ত হয়েছে :

(1)

a Generalia Bibliography
k ,, Encyclopaedia
m ,, Periodicals
n ,, Serials
w ,, Biography
z Generalia

(2)

1 Universal Knowledge—Structure and Development
2 Library Science
3 Book Science which Comprehends Science of Authorship
4 Journalism
5 Standardizatiou
6 Museology
7 Exhibitionology

(3)

A Natural Scienecs
AZ Mathematical Sciences

হ'চ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ সমলোচনা পদ্ধতি বা জীবনী রচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ সম্বলিত কোন রচনার উল্লেখ করা চলে। এই ধরণের বিষয়ের অন্য কোন বিভাগে অন্তর্ভুক্তি সম্ভব নয়। রঙ্গনাথন এজন্য চতুর্থ একটি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। উপরের যে কোন বিভাগের বিষয় নির্দেশক কোন সাঙ্কেতিক চিহ্নকে বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করে সাধারণতঃ এই বিভাগের বিষয়গুলির সৃষ্টি।

তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিই এই বর্গীকরণ পদ্ধতির মূল অঙ্গ। তালিকাটির প্রথম অংশ হ'ল বিজ্ঞানের বিষয় সমূহ, দ্বিতীয় অংশে হ'ল Humanities এবং Social Science, Psychology পর্যন্ত Humanities এবং Education দিয়ে আরম্ভ হ'ল Social Science-এর বিষয়।

কোলনের মূল বিষয়ের তালিকার একটি বৈশিষ্ট্য খুবই উল্লেখযোগ্য। তা' হ'ল এই তালিকায় কতগুলি অংশতঃ ব্যাপক বিষয়ের (Partially Comprehensive (Mc)) অন্তর্ভুক্তি :

A Natural Sciences
AZ Mathematical Sciences
BZ Physical Sciences
G Biological Sciences
MZ Humanities and Social Sciences
MZA Humanities
NZ Literature and Language
PZ Religion and Philosophy
SZ Social Science

একই ধরণের বিষয় অথবা যার জন্য তালিকায় পৃথক স্থান আছে সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে ব্যাপক কোন পুস্তক অথবা পত্র পত্রিকার বর্গীকরণের জন্য এই ধরণের (Mc) প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

অংশতঃ ব্যাপক বিষয়ের জন্য রঙ্গনাথন পূর্বে গ্রীক অক্ষর ব্যবহার করেছিলেন কারণ এর জন্য এমন সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রয়োজন যা এই ব্যাপক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয়-গুলির ঠিক উপরেই রাখা যায়। যেমন Social Sciences-এর বিষয়গুলি সুরু হয়েছে Education T থেকে অর্থাৎ Psychology S এর পর। এখন কোন সাংকেতিক চিহ্ন S এবং T'র মধ্যে স্থান পেতে পারে যার দ্বারা সাংকেতিক চিহ্নগুলির বিন্যাসক্রম ব্যাহত হবে না। রঙ্গনাথন প্রথমে সমধ্বনি সম্পন্ন গ্রীক অক্ষরের ব্যবহার করেছিলেন। যেমন Social Sciences এর জন্য তিনি S এর ধ্বনির সঙ্গে সমতা রেখে গ্রীক Sigma অক্ষরটি ব্যবহার করেছিলেন। S-এর পর Sigma এবং তারপর T থাকায় বিন্যাসক্রম ব্যাহত হ'ল না।

কিন্তু এই গ্রীক অক্ষর ব্যবহারের অনেক ব্যবহারিক অসুবিধা আছে। সেজন্য রঙ্গনাথন নতুন একটি পদ্ধতি ব্যবহার সুরু করেছেন। T থেকে Z এই অক্ষরগুলিকে

রঙ্গনাথন Emptying Digit আখ্যা দিয়াছেন অর্থাৎ অন্য কোন অক্ষরের সঙ্গে এদের যে কোন একটিকে সংযুক্ত করলে অক্ষরটি যে বিষয়কে নির্দেশ করত তা আর করবে না। কিন্তু বিন্যাসক্রম বিঘ্নিত হবেন। যেমন,

S Psychology
SZ Social Sciences
T Education

উপরের তালিকাটির বিন্যাসক্রমে কোন ত্রুটি নেই, S এর পর S Z এবং তারপর T. কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে যে Social Science SZ হ'ল Psychology S -এর একটি উপবিভাগ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। Emptying Digit-এর তত্ত্ব অনুসারে Z কে S-এর সঙ্গে সংযুক্তকরণের ফলে S Psychology এই বিষয়টির সাঙ্কেতিক চিহ্ন রহিল না। S এবং Z একত্রিত হয়ে Social Sciences এর সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হ'ল। রঙ্গনাথন এই ব্যবস্থাকে Interpolation Device আখ্যা দিয়েছেন। এর ফলে তালিকায় যে কোন স্থানে নতুন বিষয় নির্দেশক সাঙ্কেতিক চিহ্ন সন্নিবিষ্ট করা সহজতর হ'ল। এই পদ্ধতি কেবলমাত্র অংশতঃ ব্যাপক বিষয় নয় নতুন বিষয়ের বেলায়ও প্রযোজ্য। যেমন,

J Agriculture
JX Forestry
K Zoology
KX Animal Husbandry
L Medicine
LX Pharmacognosy

Forestry Agriculture-এর সরাসরি উপবিভাগ নয় কিন্তু এদের মধ্যে বিষয়গত ঐক্য বিদ্যমান। সেজন্য তালিকায় এদের স্থান পাশাপাশি হওয়া বাঞ্ছনীয়; J-র সঙ্গে X যুক্ত হয়ে Forestry-র সাঙ্কেতিক চিহ্ন সৃষ্টি হ'ল।

কোলনের তালিকায় বিষয়গুলির বিন্যাসক্রমের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বিন্যাসক্রমে বিষয়গুলি বিমূর্ত থেকে ক্রমশঃ মূর্তে পৌঁছেছে (Abstract to Concrete)। যেমন,

A Natural Science
B Mathematics
C Physics
E Chemistry
F Technology

বিজ্ঞান দিয়ে তালিকা শুরু। তারপর অঙ্কশাস্ত্র। Mathematics হ'ল বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় সমূহের মধ্যে বিমূর্ত বিষয়ের চরম উদাহরণ এবং বিজ্ঞানের যে কোন·

বিষয় পঠন-পাঠনের অপরিহার্য অঙ্গ। Physics অঙ্কশাস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর মূর্ত, তারপর পর্যায়ক্রমে Chemistry ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের বিষয়গুলি বিন্যাসক্রমের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে তাত্ত্বিক বিষয়গুলির পরেই প্রযোগ বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। যেমন,

(১)	C	Physics
	D	Engineering
(২)	E	Chemistry
	F	Technology
(৩)	H	Geology
	HX	Mining
(৪)	I	Botany
	J	Agriculture
(৫)	K	Zoology
	KX	Animal Husbandry

(ক্রমশঃ)

অজয় রঞ্জন চক্রবর্ত্তী

"ডকুমেণ্টেশন"

বিজ্ঞান-সাহিত্যে পত্র-পত্রিকার প্রধান্য অস্বীকার করার উপায় নেই। বিজ্ঞানের বই তা সে যে শাখারই হোক না কেন, ছাপা হয়ে বেড়িয়ে গেলেই তা পুরণো হয়ে যায়। সেই বই ছাপাবার পর হয়ত ঐ বিষয়ে আরও অনেক তথ্যানুসন্ধান করা হয়েছে যা ঐ বইতে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অথচ এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকার সুবিধা অনেক বেশী কোন বিশেষ বিষয়ের পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বা মাঝে মাঝে ঐ বিষয়ে গবেষণার অগ্রগতির কথা প্রকাশ করা সম্ভব এবং তথ্যানুসন্ধী পাঠকও বিশেষ বিশেষ বিষয়ের গবেষণার অগ্রগতি বিশেষজ্ঞদের সর্বাধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় পান।

ডকুমেণ্টেশনের প্রয়োজনীয়তা

যিনি এক্স-রে সম্পর্কে গবেষণা করছেন, স্বভাবতঃই এক্স-রে নিয়ে কতটা কাজ হয়ে গেছে তা তার নানা দরকার, না হলে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর তিনি দেখবেন যে সে একই বিষয়ে আরও

একজন কাজ করেছেন আর তার পরিশ্রম হল শুধু বৃথা। অথচ কোন গবেষকের তথ্য বই-এর আকারে বেরোতে অন্ততঃ দুবছর সময়ের প্রয়োজন। সেজন্য পত্র-পত্রিকা গবেষকের ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতির মতই আজ অমূল্য। কেননা এরই মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার খবর, তার ফলাফল, গবেষকের মতামত অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

একশ বছর আগেও গবেষণা প্রধানতঃ 'প্রতিভাবানদের' মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এক এক দেশে একশ বছরে হয়ত একজন 'প্রতিভাবান' পুরুষ জন্ম গ্রহণ করতেন। তারা তাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেই বিষয়ের প্রকাশিত সকল তথ্য তাদের নখদর্পণে ছিল। আজকের পৃথিবীতে গবেষণা শুধু 'প্রতিভাবান'দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আজকে 'মেধাবী' যে কেহ গবেষণায় নিযুক্ত, আজকের বৈজ্ঞানিকযুগে প্রতিভাবান পুরুষদের জন্য অপেক্ষা করলে বিজ্ঞানের এ অগ্রগতি অনেকটা শ্লথ হয়ে যেত। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও বাড়ছে দ্রুত গতিতে। কোন গবেষকের পক্ষেই আজ আর অনির্দিষ্ট ভাবে পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে তথ্যানুসন্ধান করার সময় নেই। তাই গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান এঁদের সহায়তার জন্য জন্ম দিয়েছে "ডকুমেণ্টেশনের"।

ডকুমেণ্টেশনের অর্থ

এই পদ্ধতির জন্ম বেলজিয়ামে হলেও কথাটির জন্ম ফরাসীদেশে। কথাটা গ্রন্থপঞ্জীর সমার্থবোধক, জ্ঞানের যে কোন ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সংগ্রহ, শ্রেণী বিন্যাস, ও সুসংবদ্ধ উপস্থাপনকেই ডকুমেণ্টেশন বলা হয়ে থাকে। এই তথ্য মানুষের জ্ঞান প্রকাশের সর্ব্বাধুনিক মাধ্যম পত্র পত্রিকা রেকর্ড সময়িকী থেকে সংগ্রহ করা হয়।

জন্ম

জ্ঞানের বিজ্ঞান সমুদ্র থেকে গবেষকদের সহায়তার জন্য বেলজিয়ামের-এর কয়েকটি ভদ্রলোক ডকুমেণ্টেশনের পরিকল্পনা করেন। তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করে নিজস্ব বর্গীকরণের সাহায্যে প্রবন্ধ পঞ্জী তৈরী করতে শুরু করেন। কিছু দিনের মধ্যে জন্ম নিল International Institute of Bibliography of Belgium. যার আধুনিক নামকরণ হয়েছে International Fedaration for Documentation. আমেরিকাতে American Documentation Institute ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। British Institute-এর জন্মও সমসাময়িক। বছর ২০ বাদে রাশিয়ার ডকুমেণ্টেশন প্রতিষ্ঠান VINITI জন্ম নিল। ভারতের Insdoc Viniti-এর সমসাময়িক। এশিয়ার Japanese Institute of Technical Information আজও উল্লেখযোগ্য।

ডকুমেণ্টেশনের পদ্ধতি

ডকুমেণ্টশন পদ্ধতির কার্যক্রম চার প্রকার।

১) সুনির্দ্দিষ্ট উপায়ে তথ্য আহরণ।
২) তথ্যসমূহ প্রবন্ধ থেকে সূচীকরণ (indexing)
৪) প্রবন্ধ ও তথ্যগুলির সংক্ষেপীকরণ (abstracting)
৪) সহজে ও সর্বনিম্ন সময়ে তথ্যাদির সরবরাহ।

তথ্য সংগ্রহের পূর্বে অবশ্য নীতি নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন, ডকুমেণ্টশন সংস্থা কিরূপ তথ্যের পরিবেশনে ইচ্ছুক ; কোন বিশেষ বিষয়ে সব রকমের তথ্য অর্থাৎ সর্ব বিষয়ের কিছু কিছু তথ্য সরবরাহ করা হবে তা পূর্বে স্থির করা উচিত। রাশিয়ার VINITI মৌলিক বিজ্ঞান অপেক্ষা কল্পিত বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ভারতে Insdoc কিন্তু ফলিত বিজ্ঞান অপেক্ষা মৌলিক বিজ্ঞানের তথ্যের উপর গুরুত্ব অধিক দেয়। বিনিময় বা সরাসরি ক্রয় যে ভাবেই হোক তথ্য পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করা দরকার।

সংগৃহীত পত্রপত্রিকার সকল প্রবন্ধই কাজে নাও লাগিতে পারে। সেক্ষেত্রে অনাবশ্যক সমস্ত পরিশ্রম নষ্ট না করে প্রবন্ধ তথ্য প্রভৃতি বাছাই করা দরকার বাছাই তথ্যগুলি সূচী (index) করা হয়।

সংক্ষেপীকরণ (abstracting) প্রধাণতঃ দু'প্রকার, নির্দ্দেশ মূলক ও তথ্য মূলক। প্রথম প্রকারের সংক্ষেপীকরণে পাঠক বুঝতে পারবে, মূল প্রবন্ধ, তথ্য পড়া দরকার কিনা ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে মূল প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান, মূলনীতি, ইত্যাদি সম্পর্কে সহজে জানিতে পারে। অবশ্য দুই প্রকারের সংক্ষেপীকরণের মধ্যে আকৃতির পাথক্য থাকা স্বাভাবিক। ফলে ব্যবহারকারী পাঠক কোনটিতে কি ধরণের সংক্ষেপীকরণ করা হইয়াছে জানিতে না পারিলে অসুবিধায় পড়িতে পারে। সংক্ষেপীকরণের দৈর্ঘ্য দেখে দুই-এর মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানা যায় ; নির্দ্দেশমূলক সংক্ষেপীকরণ আকৃতিতে ছোট হতে বাধ্য। কিন্তু তথ্যমূলক সংক্ষেপীকরণের আকার কিছু বড় হওয়া স্বাভাবিক। সংক্ষেপী-করণের পর সংক্ষিপ্তসার কার্ডে বা শ্লিপে যে কোন প্রকারে সাজান সম্ভব, তবে কার্ডে সাজিয়ে প্রয়োজনীয় 'হেডিং' ব্যবহার করার সুফল আছে।

তথ্য সরবরাহে সময় সংক্ষেপ করা দরকার। এটী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ৫টি আইনের অন্যতম একটি। এর জন্য যান্ত্রিক সহায়তা গ্রহণ প্রয়োজন। পরে এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ডকুমেন্টেশনের সমস্যা

সময় সমস্যা ডকুমেণ্টেশনে বিশেষ বিচার করা দরকার। সর্ব নিম্ন সময়ে তথ্য সরবরাহ এর অন্যতম মূলনীতি। এর জন্য প্রয়োজনীয় পত্র পত্রিকাও তথ্যের আধার যাতে কম সসময়ের মধ্যে জড়ো করা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। Japanese Institute of technical information তাদের সকল পত্র পত্রিকাই বিমানডাকে (air mail) সংগ্রহ করে। Insdoc list তৈরী করার জন্য Insdoc বিদেশী পত্রিকার সূচীপত্র পত্রিকা ছাপার পূর্ব্বেই সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ লোকের অভাবও সময় সমস্যার কারণ। Insdocএ ১00 জন কর্ম্মচারীর সাহায্যে কাজ চালান হয় ; সেখানে VINITI-র কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৩০০০, অবশ্য উভয়ের সংগৃহীত পত্র পত্রিকার সংখ্যা যথাক্রমে ৬০০ এবং ২০,000। কুশলী লোকের অভাবে কখনই সময়মত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হইতে পারে না।

ভাষা সমস্যা ডকুমেণ্টেশনের আর একটি প্রধান সমস্যা। রাশিয়ার প্রকাশিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সম্পর্কে অন্যান্য দেশের আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। জাপানে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কেও অন্যান্য দেশে যথেষ্ঠ আগ্রহ আছে। সেজন্য বহু ভাষা

বিশেষজ্ঞ কর্ম্মী ডকুমেণ্টেশনের পক্ষে অপরিহার্য্য। আজকাল রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকায় ইংরাজী সংখ্যা অন্যান্য দেশে প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রীণল্যাণ্ডের ডেনিশ ভাষায় প্রকাশিত বইএর ইংরাজী তর্জমা সেইদেশেই প্রকাশিত হচ্ছে। কুশলী ভাষাবিদের সাহায্যে এ বাধা অনেকটা দূর করা যায় তবে সময়ের প্রশ্ন এখানেও আছে।

সংক্ষেপীকরণেও (abstracting) যথেষ্ঠ সমস্যা আছে—সংক্ষেপীকরণ কি ধরণের হবে তা স্থির করা, সংক্ষেপীকরণের জন্য উপযুক্ত লোকের সন্ধান, ইত্যাদি। কোন বিষয়ে দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু সেই বিষয়ের সংক্ষেপীকরণের জন্য নিযুক্ত হওয়া দরকার। কেননা যাঁর ভূ-পদার্থবিদ্যায় দক্ষতা নাই, তাঁর পক্ষে ভূ-পদার্থ বিদ্যার সংক্ষেপীকরণে সার্থক হওয়া কষ্টকর। বর্গীকরণের নীতিও নির্ধারণ করা দরকার। বর্গীকরণ ভাসা ভাসা না হয়ে সুক্ষ্ম হওয়া প্রয়োজন। কোশল প্রথা প্রচলন এ বিষয়ে সাহায্য করবে।

পত্র পত্রিকার নামের সংক্ষেপীকরণেও (abbreviation) বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত। World list of Scientific Periodical এ ব্যবহৃত নাম ব্যবস্থার করা যেতে পারে। এজন্য বিভিন্ন ডকুমেণ্টেশন সংস্থা মিলিতভাবে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মও চালু করিতে পারেন।

ডকুমেণ্টেশনের যান্ত্রিকতা

তথ্য সরবরাহ সহজ ও স্বল্প সময় করার জন্য ডকুমেণ্টেশনের বিভিন্ন স্তরে যন্ত্রের অধিক ব্যববার হচ্ছে ও ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুবাদ ও সংক্ষেপীকরণে যে সময় ব্যয় হয় তা কমাবার জন্য যন্ত্রের ব্যবহার করা যায়।

সংক্ষেপীকরণ (abstracting) সহজ করার জন্য যান্ত্রিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতি কোন প্রবন্ধে ব্যবহৃত শব্দগুলির ব্যবহারের হার ও প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। শক্তির রূপান্তর (Transformation of energy) এর সাহায্যে, প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া চুম্বকির ফিতায় আবদ্ধ করা হয়। চুম্বকীয় ফিতা হইতে একটি কম্পিউটারে সংযোগ করা হয়। এখানে প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন সর্ব্বনাম (pronoun), অব্যয় (artical, preposition) ইত্যাদি ছাটাই করা হয়। অবশিষ্ট শব্দগুলি আক্ষরিক ক্রমে সাজাবার পর পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে চুড়ান্ত সংক্ষেপীকরণ পাওয়া যায়। এবিষয়ে যতটা পরীক্ষা করা হয়েছে তার ফল আশাপ্রদ।

ভাষার প্রাচীর বহু ক্ষেত্রই জ্ঞান প্রকাশ ও লাভের পরিপন্থী। ভাষার সমস্যা দূরীকরণের জন্য সুসংগঠিত অনুবাদ-সংস্থা গঠন প্রয়োজন, অধিক যন্ত্রের ব্যবহার এক্ষেত্রেও অনেক সময় সংক্ষেপে সাহায্য করতে পারে। এ বিষয়েও গবেষণা চলছে।

তথ্যের সরবরাহে যান্ত্রিকতা যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। মাইক্রো ফিল্ম, মাইক্রো কার্ড এর কয়েকটি ধাপ মাত্র। আজকাল Thermo Fan যন্ত্রে একই সঙ্গে মাইক্রো ফিল্ম পড়া ও প্রতি ৩ সেকেণ্ডে সেই পৃষ্ঠার হুবহু অনুলিপি পাওয়া সম্ভব। Xerography ও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। একটি আমেরিকান কোম্পানীর জন্য তৈরী বৈদ্যুতিক কার্ড সন্ধানকারী (Electrical card shorter) চমৎকার কাজ দেয়। এতে যে শুধুমাত্র

কার্ড সাজান যায় তাই নয়। বিভিন্ন বোতাম টিপে প্রয়োজনীয় কার্ড এর থেকে বের করা যায়। এর কোন ট্রেতে মনে কর শুধু পদার্থ বিদ্যার কার্ড সাজান আছে—একটি বিশেষ বোতাম টিপলে শুধুমাত্র পারমাণবিক বিদ্যা সংক্রান্ত কার্ডগুলি অন্যসকল কার্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে। এইভাবে বিভিন্ন বোতামে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। এর দ্বারা তথ্য সন্ধান অনেক সহজ হয়ে গেছে।

ডকুমেণ্টেশনের বিবিধ ক্ষেত্র

এখন পাঠকের মনে ধারণা জন্মাতে পারে যে ডকুমেণ্টেশনের কার্য্যক্ষেত্র শুধু বিজ্ঞানকে নিয়ে, তা নয়: জ্ঞানের সকল শাখায়ই ডকুমেণ্টেশনের কার্যক্ষেত্র। যেমন ধরুণ প্ল্যানিং, প্ল্যানিং-এর উপর প্রচুর লেখা বেরুচ্ছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। কোন ডকুমেণ্টেশনিষ্ট বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে প্ল্যানিং উপর বিভিন্ন লেখকের লেখা সংগ্রহ করে ঠিকমত সূচীকরণ (indexing), বর্গীকরণ করে প্রয়োজনীয় হেডিং দিয়ে সাজিয়ে রাখতে পারেন। ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকারিরা আগেকার পরিকল্পনা বা তার দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতের জন্য নিশ্চয়ই ব্যগ্র হবেন। তখনই ডকুমেণ্টেশনের সার্থকতা প্রমাণ হবে। এ প্রয়োজন কলাবিদ্যার যে কোন শাখার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভারতে ডকুমেণ্টেশন

ভারতে ডকুমেণ্টেশন প্রবর্তনের ও বর্তমান রূপদানে ডঃ রঙ্গনাথনের দান অতুলনীয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক থাকাকালীন বিভিন্ন শাখার গবেষণার সুবিধার জন্য তিনি পৃথক পৃথক গ্রন্থপঞ্জী ও প্রবন্ধপঞ্জী তৈরী করেছিলেন। তারই উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় Insdoc-এর জন্ম হয়। Indian statistical Institute, বাঙ্গালোর, শাখার DRTC (Documentation Research and Training Centre) তে ডকুমেণ্টেশনের শিক্ষার যে বন্দোবস্ত হয়েছে সেখানে তিনি অবৈতনিক অধ্যাপক। ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গ্রন্থাগারেও বর্তমানে ডকুমেণ্টেশনের কাজ চলছে। ভারত সরকারের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ডকুমেণ্টেশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সরকারী, বে-সরকারী গ্রন্থগারিকেরা স্বীয় উদ্যোগে ডকুমেণ্টেশন সুরু করেছেন। এদের মধ্যে রেল এর DRSO (Design Research and Standardisation Organisation), Geological Survey of India, Indian Statistical Institute ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

Reference :—

1) Herald of Library Science. vol. 2, no-4.
2) N M L Technical Journal. vol. 3, no-2.
3) Annales of Library Science. vol. 7, no-2.
4) Lucknow Librarian. vol. 2, no-2.

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার

অমলাংশু সেনগুপ্ত

পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা সদর বালুরঘাট। এর মধ্যস্থলে প্রায় ২½ বিঘা জমি নিয়ে জেলা গ্রন্থাগার। ১৯৫৫ সনে এর প্রতিষ্ঠা। অবশ্য এই জেলা গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা একক ভাবে গড়ে ওঠেনি। যে গ্রন্থাগার তার নিজস্ব পাকা দালান, জমি আর গ্রন্থাগার সমগ্র নিয়ে বৃহত্তর স্বার্থের প্রেরণায় জেলা গ্রন্থাগারের অংগীভূত হয়ে গেছে তার নাম 'বালুরঘাট সাধারণ গ্রন্থাগার'। অবশ্য এটাও মূল নাম নয়। প্রকৃতপক্ষে এর সূচনা ১৯১৪ সনে। তদানীন্তন নাম 'দি এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল এণ্ড লাইব্রেরী'। প্রথম সম্পাদকের নাম শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর ১৯৪৯ এর ১৮ই ডিসেম্বর সাধারণ সভ্যদের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে এর নাম পরিবর্ত্তন করে রাখা হয় 'বালুরঘাট সাধারণ গ্রন্থাগার'। সে সময় সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়।

তারপর ১৯৫৫ সনে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হলে 'বালুরঘাট সাধারণ গ্রন্থাগার' পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগারের সংগে মিশে যায়।

সাধারণ ভাবে এই গ্রন্থাগারটি বেশ জনপ্রিয় এবং আদর্শস্থানীয়। বালুরঘাটে দ্বিতীয় কোন সাধারণ গ্রন্থাগার না থাকায় এর গুরুত্ব আরো বেশী। পত্র পত্রিকা পাঠের জন্য শতাধিক পাঠক নিয়মিত গ্রন্থাগারে যাতায়াত করেন।

দশ সহস্রাধিক বই 'ডিউই' এবং বাংলা বর্গীকরণ পদ্ধতিতে শ্রেণী বিভক্ত ও ক্রমিক পর্যায়ে সাজানো। Open Accession. লেখক ও বইয়ের শিরোনামা ভিত্তিক কার্ড ক্যাটলগ। গ্রন্থ-ঋণ বিভাগের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত সংখ্যা এবং শ্রেণীর একটি পরিসংখ্যান নিয়মিত যত্ন সহকারে রাখা হচ্ছে। ১৯৬৩ সনের ১১ মাসের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

১)	সাধারণ	২২
২)	দর্শন	১২১
৩)	ধর্ম	২০৯
৪)	সহজ বিজ্ঞান	১৯৭
৫)	ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব	৪১
৬)	বিজ্ঞান	৯৯
৭)	ললিত কলা	৪৫
৮)	সাহিত্য	১৩৪৫৭
	শিশু সাহিত্য	২৭৫৩
৯)	ইতিহাস	২৮৩
১০)	ভূগোল	২৪৮
১১)	জীবনী	৩৭৩
		১৭৮৪৮

[পাঠগৃহে ও ভ্রাম্যমান শাখায় ব্যবহৃত সংখ্যা ধরা হয় নি]

জেলা গ্রন্থাগারের সভ্য তালিকায় ৮৩টি Rural & Institutional member এর নাম রয়েছে। ভ্রাম্যমান শাখা আশানুরূপ কাজ করতে পারছে না গত কয়েক বছর ধরেই। প্রথম ও প্রধান কারণ আর্থিক। সরকার থেকে গাড়ী দিয়েছেন অথচ গাড়ীর খরচ দেওয়া

হয় না। তাছাড়া এই শাখার জন্য যে 'বাবু' গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে (Land Rover—7 seater) সেটা Mobile Service এর অনুকূল নয়। উপরন্তু গাড়ীটা কিছু পুরোন হয়ে যাওয়ায় নিত্য নতুন খরচের ধাক্কায় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বিব্রত। এই বিভাগের সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার অদূর ভবিষ্যতে (সরকারী নীতি পরিবর্ত্তিত না হলে) সম্ভাবনা কম।

অন্যান্য জেলা গ্রন্থাগারের মত এখানেও নিঃশুল্ক ব্যবস্থা নয়। গ্রন্থ-ঋণ বিভাগের সভ্যদের মাসিক ৫০ নঃ পঃ হিসাবে চাঁদা দিতে হয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার চাপে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এই হার বৃদ্ধি করার কথা চিন্তা করছেন।

এই গ্রন্থাগারের একটা বড় ফাঁক—Compound wall এর অভাব। প্রায় ৯ বছর হতে চললো গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে, অথচ এই বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশটি এখনো গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অথচ সব রকম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার প্রাংগনে ফুলের বাগান করা হয়ে ওঠছে না। গ্রন্থাগারের গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে এটার অভাবে।

উল্লেখ বাহুল্য, তবু জানাচ্ছি চরম হতাশার মধ্যে কাটাচ্ছে সারা জেলার গ্রন্থাগার কর্মীরা। তাদের এই হতাশা শুধু যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিপর্যয় টেনে আনছে তা নয়; জেলা গ্রন্থাগার আন্দোলনে এর অশুভ প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে এবং ব্যাপকভাবে দেখা দিচ্ছে। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই সব গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছিল, পরিকল্পনার এক চরম দুর্বল দিকটির ছিদ্রে সে উদ্দেশ্য ক্রমেই ব্যর্থতার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

তবু বলবো এই জেলার গ্রন্থাগার পরিষদ বেশ যুক্তিনিষ্ঠ ও ন্যায় পরায়ণ। ক্ষমতা ও সাধ্যের মধ্যে যতটা সম্ভব সুযোগ সুবিধা গ্রন্থাগার কর্মীদের দিয়ে থাকেন। গ্রন্থাগারিক এবং পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক নিজ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রসংগত আর একটি বিষয় উল্লেখ করে এ প্রবন্ধের শেষ করছি। জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করেছেন যথাক্রমে শ্রীনিশীথ গংগোপাধ্যায়, শ্রীঅনিল দত্ত, শ্রীসুবল চৌধুরী, শ্রীপ্রণব কুণ্ডু এবং বর্ত্তমানে অমলাংশু সেনগুপ্ত।

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার দিবস

প্রতি বৎসরের ন্যায় বৎসরও ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলাদেশের গ্রন্থাগারানুরাগী জনসাধারণ এবং গ্রন্থাগার সমূহের নিকট আবেদন জানিয়ে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করেন :

প্রতি বৎসর যে দিনটি গ্রন্থাগার দিবস (২০-এ ডিসেম্বর) হিসাবে পালিত হয় তাহা আগতপ্রায়। ঐ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস এবং ঐদিন হতে পরবর্ত্তী সপ্তাহটিকে গ্রন্থাগার সপ্তাহ হিসাবে পালনের জন্য আমরা পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার সমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

২০-এ ডিসেম্বর তারিখটি বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ। এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে বেলগাঁওতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে এক সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। সম্মেলন এই অনুভব করেছিল যে নতুন দেশ ও সমাজ গড়ে তুলতে হলে চাই সমাজ সচেতন নতুন মানুষ এবং শিক্ষাই মানুষ তৈরীর প্রধান উপকরণ। সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার গভীর ও ব্যাপক বিস্তারের জন্য চাই গ্রন্থাগার। সকলকে গ্রন্থমনা ও গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার জন্যে প্রয়োজন গ্রন্থাগার আন্দোলন। উক্ত সম্মেলনে সুসংঘটিত পথে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনের জন্যে প্রতি প্রদেশে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। তদনুযায়ী ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০-এ ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন এই পরিষদের প্রথম সভাপতি।

রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে দেশের প্রতিটি গ্রন্থাগারের সম্পর্ক অপরিহার্য। ছোট বড় সকল গ্রন্থাগারের স্বার্থ নিহিত রয়েছে রাজ্যের সুসংবদ্ধ এই আন্দোলনের সাফল্যের উপর। আন্দোলনকে ত্বরান্বিত ও সফল করে তোলার দায়িত্ব সকল গ্রন্থাগার ও তাদের কর্মীদের।

যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ৩৮ বৎসর বাংলা দেশের সুসংগঠিত আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এই দিবসটি সে পথে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি তার হিসাব নিকাশ ও পর্যালোচনার দিন। এই দিনটিতে আমাদের অসম্পূর্ণ কর্মসূচীকে সার্থক করবার সংকল্প ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবসে এই রাজ্যব্যাপী কর্মসূচীতে প্রতি গ্রন্থাগারই সাধ্যানুযায়ী অংশ গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়। নিম্নলিখিত কর্মসূচীটি গ্রন্থাগার দিবসে পালনের জন্যে আমরা আবেদন জানাচ্ছি :

- নিজ গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা বিধান
- প্রভাতফেরী, অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ
- স্থানীয় পুরাবস্তু, পুঁথি ও গ্রন্থ এবং চারু ও কারুশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন
- স্থানীয় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীদের আলোচনা বৈঠকের আয়োজন এবং পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতামূলক কর্মপন্থা গ্রহণ
- জনসভার আয়োজন
- চলচ্চিত্র, অভিনয় ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন
- নিজ গ্রন্থাগারের উন্নতি ও স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকতর গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার জন্যে অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ

গ্রন্থাগার দিবসের জনসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রস্তাবের অনুলিপি রাজ্যসরকার, সংবাদপত্র, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট প্রেরণ করতে অনুরোধ করছি :

১। এই সভা সর্বসাধারণের উপযোগী নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক স্বচ্ছলতা বিধান এবং উন্নত প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনতিবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করতে অনুরোধ জানাইতেছে।

এই সভা কলিকাতা মহানগরীতে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে এবং রাজ্য সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে নিঃশুল্ক করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

২। এই সভা ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে আরও ডে ষ্টুডেন্টস্ হোম খুলিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।

৩। এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অধুনা দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট বাংলা গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণে সহায়তা করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

৪। এই সভা মনে করে যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে এবং সুপরিচালিত করিতে হইলে গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন প্রদান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত আবশ্যক; এই সভা সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা তাঁহাদের নিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের যথোপযুক্ত বেতন এবং মর্যাদা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করুন।

কেন্দ্রীয় সভা

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে স্টুডেন্ট'স হলে পরিষদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সভার আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় সভাপতিত্ব করেন।

গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন—যে মহান উদ্দেশ্যে নিয়ে ৩৮ বৎসর পূর্বে পরিষদের সৃষ্টি হয়ে হয়েছিল এই দিবসটি সে পথে আমরা কত দূর অগ্রসর হয়েছি তার হিসাব নিকাশের দিন। প্রতিবৎসর গ্রন্থাগার দিবসে আমরা নানা রকম সংকল্প করি কিন্তু সেই সংকল্প কতটা কার্যকরী করতে পেরেছি তারও আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় আমাদের পরিষদের কাজ অনেক ভাল হয় শুধু—এই আত্মসন্তুষ্টিতে আত্মহারা হলে চলবে না। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলির অগ্রগতির সহিত কার্যাবলীর উন্নতির বিচার করতে হবে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রাথমিক কর্তব্য গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা। এ সম্পর্কে পরিষদের প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে এমন কথা বলা চলে না: তবে পরিষদ এই কাজটিকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়নি। তবে, আশার কথা কেন্দ্রীয় সরকার একটি আদর্শ বিলের খসড়া প্রণয়ন ও প্রচার করেছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে এই আইন বিধিবদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে বলে আশা করা যায়। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের জনমতকে আরও সচেতন করা প্রয়োজন আছে বলেই পরিষদ প্রতিটি সম্মেলনে এবং গ্রন্থাগার দিবসে এই আইন প্রণয়নের গুরুত্ব সম্বন্ধে পরিষদের বক্তব্য জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করে থাকেন। এই সভার কাছে পরিষদের প্রথম প্রস্তাব হল তাই গ্রন্থাগার আইনের বিধিবদ্ধ-করণ এবং নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ।

শ্রীমুখোপাধ্যায় অতঃপর 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন উপলক্ষ্যে প্রচারিত আবেদনের অন্তর্ভুক্ত চারটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবগুলির সমর্থন করে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দান করেন এবং প্রস্তাবগুলি সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতি শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় মহাশয় বলেন : আমাকে এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে বহু কথা বলতে হয়েছে এবং হয়ত আমার এই কথাগুলি পুনরাবৃত্তিরূপেই দেখা দেবে। সারা ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিষদের তুলনায় আমাদের এখানকার পরিষদ অনেক কর্মঠ এবং শক্তিশালী। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে কোন রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন এখানেও নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

কিন্তু কতকগুলি ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েছে। দিল্লীর ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার-গুলিতে আমি বহু গ্রামের পুরুষ এবং মহিলা বই নিতে আসতে দেখেছি। আমি কৌতুহলী হয়ে তাদের পেশা সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে তাঁরা কেউ কৃষাণ কেউবা মজদুর এবং এদের অধিকাংশই সদ্যসাক্ষর সম্প্রদায়ের লোক। তাই আমার মনে হয় ওরা আমাদের চেয়ে অনেক সচেতন। আমরা ওদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের এই ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। আমাদের হাতে যে প্রায় ৭০০০ গ্রন্থাগার আছে তাদের আমরা শিক্ষার সম্প্রসারণে কাজে লাগাতে পারি। গ্রন্থাগারিকদের পারিশ্রমিক ও মর্যাদা দান যে সমাজ স্বীকার করে না সে সমাজের কোনদিনই উন্নতি সম্ভব নয়। পাঠক, গ্রন্থাগারিক ও সরকার এই তিন শক্তির পরিপূর্ণ সহযোগিতায়ই আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারে।

শিশু পাঠকদের আমরা অনেক গ্রন্থাগার থেকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে দেখেছি। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। সুতরাং তাদের সব সময়ই উৎসাহিত করা উচিত। শিশুদের পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাব অত্যন্ত তীব্র। এদিকে লেখক এবং প্রকাশকের নজর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন সর্বশ্রী সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীলবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনাথবন্ধু দত্ত।

গ্রন্থাগার দিবসের সভার পূর্বে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের ১৯৬৩ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডাঃ গোলাপচন্দ্র রায় চৌধুরী অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে তাঁরা গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে প্রবেশ করে গ্রন্থাগারের পাঠকদের যথাযথ ভাবে সাহায্য করে এই শিক্ষার যথার্থ মর্যাদা দেবেন।

এই বৎসর শ্রীদুলাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় পদক লাভ করেছেন।

পুণর্মিলন উৎসব

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের পুণর্মিলন উৎসব ডিসেম্বর স্টুডেণ্টস হলে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবার জন্য বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডাঃ বি ডি নাগ চৌধুরী সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ তিনি উপস্থিত হতে না পারায় পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র এবং সম্পাদক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। এই বারের অনুষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের মঞ্চে উপস্থিত হ'য়ে নিজ নিজ পরিচয় দান।

সঙ্গীতানুষ্ঠান দিয়ে উৎসব শেষ হয়। পুণর্মিলন উৎসব উপলক্ষ্যে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

—o—

গ্রন্থাগার সংবাদ

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া

সবুজ গ্রন্থাগার (নিজবালিয়া, হাওড়া) কর্তৃক ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার ভবনে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার আইন এবং গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সংস্কৃতি সংসদ গ্রামীণ গ্রন্থাগার (ভগবানপুর) কর্তৃক ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে একটি গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের অন্যতম সদস্য শ্রীরাধারমণ অধিকারী সভায় পৌরহিত্য করেন। পরিষদ প্রচারিত প্রস্তাবগুলি সহ নিম্নলিখিত দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয় :

(১) স্থানীয় পুরাবস্তু, পুঁথি, গ্রন্থ এবং চারু ও কারুশিল্প সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হউক এবং স্থানীয় প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া (নিজ নিজ অঞ্চলের) উহার একখণ্ড নকল এই সংসদ ভবনে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হউক।

(২) এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অধুনা দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট বাংলা গ্রন্থের পুণর্মুদ্রণে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছে।

গত ২০শে ডিসেম্বর সবুজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় শিক্ষক শ্রীসমীর রঞ্জন সরকার এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন মাইতি। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন

জানা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা ও সদাশয় সরকারের নীতি ও পরিকল্পনাকে জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীসরকার বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর জোর দেন এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ডে স্টুডেন্টস্ হোমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। প্রধান অতিথি তথা বিশিষ্ট বক্তাগণের মধ্যে শ্রীনির্মলেন্দু মান্না শিশু গ্রন্থাগারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জান। সভা সমাপনান্তে গ্রন্থাগারিক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভাস্কুর আনন্দময়ী সাধারণ পঠাগার, বলুহাটী, হাওড়া

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে এই পাঠাগার কর্তৃক ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগার সপ্তাহ বিশেষ নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। ২০শে ডিসেম্বর স্মরণীয় গ্রন্থাগার দিবসটি গঠনমূলক কার্য্য, পাঠাগারের পরিচ্ছন্নতা বিধান আলোক সজ্জা এবং আলোক চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে উদ্বোধিত এবং পালিত হয়। ২২শে ডিসেম্বর পাঠাগার প্রাঙ্গণে পুস্তক, পোষ্টার ও বিভিন্ন প্রকারের কারু শিল্পের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং সারাদিন ব্যাপী ১০ নঃ পঃ কুপণ প্রথায় অর্থ সংগ্রহের এক অভিযান চালাইয়া পাঠাগারের কর্ম্মীগণ ১৮ টাকার উপর সংগ্রহ করেন। ২৫শে ডিসেম্বর পাঠাগারে একটি কর্ম্মী ও কিশোরদিগের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ব্লক সমাজ শিক্ষা আধিকারিক মাননীয় শ্রীদিলীপকুমার দাস মহাশয়। তিনি এই পাঠাগার কর্তৃক গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালিত হইতে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, এবং সাবলীল ভাষায় পাঠাগারের পুস্তক নির্বাচণ, পুস্তক সংগ্রহ সাপ্তাহিক আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ দেন। সম্পাদক মহাশয় পাঠাগারের নানা সুবিধা অসুবিধার কথা ব্যক্ত করিয়া পল্লী অঞ্চলে যাহাতে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হয় তজ্জন্য দাবী জানান। সভায় সর্ব্বশ্রী জয়দেব মুখোপাধ্যায় (সভাপতি নারসা মণ্ডল কংগ্রেসকমিটি), জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুবীর কোনার, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় পাঠাগারের কর্ম্মীগণের প্রচেষ্টায় উৎসাহ দান করেন এবং সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ দেন।

নারিকেল ডাঙ্গা সার গুরুদাস ইনষ্টিউটের (২৭ সার গুরুদাস রোড, কলিকাতা) উদ্যোগে ৫ই জানুয়ারী ১৯৬৪ গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ইনষ্টিটিউট ভবনে গ্রন্থাগার ও জনসাধারণ বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌরপিতা ডাঃ সুখবিহারী মুখোপাধ্যায়। পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, যুগ্মসম্পাদক সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রবীর রায় চৌধুরী বক্তৃতা করেন।

সোনা জাগৃতি পাবলিক রুরাল লাইব্রেরী, সোনাখালি, মেদিনীপুর

সকাল ৮ টায় :—গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোনাখালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীলক্ষ্মণ চন্দ্র নাথ মহাশয়। তিনি

প্রথমে গ্রন্থাগারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠানের পতাকোত্তলন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখর করে তোলেন গ্রন্থাগারের সভ্য-সভ্যাবৃন্দ। তারপর গ্রন্থাগারের সম্পাদক মাননীয় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শাসমল মহাশয় পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার পরিকল্পনার গুরুত্ব, নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের যথোপযুক্ত পদ মর্য্যাদা ও বেতন প্রদান প্রভৃতি সম্পর্কে এক দীর্ঘ ভাষণ-দান করেন। ইঁহার পর গ্রন্থাগারের সভ্যদের মধ্যে অনেকেই এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীসুবলচন্দ্র মাইতি গ্রন্থাগারের পরিবেশ এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে গ্রন্থাগারের প্রতি দেশের সমস্ত জনসাধারণ আকৃষ্ট হন সেই সম্পর্কে ক্ষুদ্র ভাষণ দান করেন। সর্বশেষে মাননীয় সভাপতি মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং গ্রন্থাগারকে আরও বেশী করে জনসাধারণের প্রয়োজনে লাগানো এবং বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে এবং গ্রন্থাগারের আর আর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া অনুষ্ঠান কার্য্য শেষ করেন।

বিকাল ৪ টায় :—বিকাল ৪ ঘটিকায় গ্রন্থাগার কক্ষে ক্ষুদ্র পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে প্রায় ৩০০ তিন শত লোক সমবেত হইয়াছিল।

দেবেন্দ্র পাঠাগার

২০শে ডিসেম্বর, ৬৩, বেলা—২ ঘটিকায় অত্র দেবেন্দ্র পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস-পালন উপলক্ষ্যে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতে সর্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বি, এম, মজুমদার (B. D. O.) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে স্থানীয় মোহন সিং উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাননীয় শ্রীযুক্ত সরোজ বিহারী নন্দী মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে আলোচনা করেন, এবং গ্রন্থাগারটি সম্প্রসারণের জন্যে জনসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করেন।

গ্রামসেবক শ্রীকালীপদ ঘোষ মহাশয় গ্রন্থাগারের উন্নতি কল্পে যাহা করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে নীতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করিয়া গ্রন্থাগারটিকে তালে তালে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি জনসাধারণের সহানুভূতি কামনা করেন।

অতঃপর মাননীয় সভাপতি মহোদয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থাগারের উপযোগিতা এবং কিরূপে ইহার ক্রমোন্নতি হইয়া পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী বৃন্দের মধ্যে যাহাতে গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত হয় তাহা বুঝিয়ে দেন। তিনি জনসাধারণকে উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের জন্যে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন।

অতঃপর পরিষদ প্রচারিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এড়গোদা আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী গৃহীত হয় :—

২০শে ডিসেম্বর শুক্রবার—এড়গোদা কেন্দ্রে সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধনী সভা।

২১শে ডিসেম্বর শনিবার—তুলসীবনি শাখা গ্রন্থাগারে বৈকাল ৫টায় আলোচনা সভা।

২২শে ডিসেম্বর রবিবার—আন্তাপাড়া শাখা গ্রন্থাগারে বৈকাল ৫টায় আলোচনা সভা।

২৩শে ডিসেম্বর সোমবার—কাদোডিহা শাখা গ্রন্থাগারে বৈকাল ৫টায় আলোচনা সভা।

২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার—পড়িহাটি সাধারণ পাঠাগারে বৈকাল ৫টায় আলোচনা সভা।

২৫শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার—চঁড়শর বেলিয়াগুড়ি শাখা গ্রন্থাগারে বৈকাল ৫টায় আলোচনা সভা।

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগারের পক্ষ হইতে ২২শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। ঐ দিন সকালে পাঠাগারের কর্মীগণ গ্রামে ঘুরিয়া পুস্তক সংগ্রহ করেন। বৈকালে পাঠাগার ভবনে জনসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়।

কাকাটিয়া সাধারণ পাঠাগার, জেলা—বাঁকুড়া

গত ২০শে ডিসেম্বর শুক্রবার কাকাটিয়া সাধারণ পাঠাগারে সাড়ম্বরে "গ্রন্থাগার দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতে পাঠাগার কক্ষটি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয় এবং পাঠাগারের পুস্তকসমূহ সুবিন্যস্ত করা হয়।

বৈকাল ৩ ঘটিকায় পাঠাগার প্রাঙ্গণে "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষ্যে জনসভার আয়োজন করা হয়। পাঠাগার-সভাপতি শ্রীযুক্ত কানাইলাল দে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীঅনাথবন্ধু নন্দী ও শ্রীকানাইলাল দে। সভায় সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, বর্ত্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক স্বচ্ছলতা বিধান এবং উন্নত প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সক্রিয় হইতে অনুরোধ জানান হয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তক ভাণ্ডার বৃদ্ধিকল্পে উপস্থিত সদস্যগণের নিকট হইতে ১০ (দশ) খানি পুস্তক ও নগদ কুড়ি টাকা সংগ্রহ করা হয়।

অগ্রণী পাঠাগার, দমদম, কলিকাতা।

অগ্রণীর পাঠাগার বিভাগ ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' সাফল্যের সহিত পালন করেছে। এই উপলক্ষ্যে ৫০ খানারও অধিক নানারকম পুস্তক সহ কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

সন্ধ্যায় একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাকারদের মাল্যদান সহ গ্রন্থাগারিকতার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এক সপ্তাহ ধরিয়া পুস্তক সংগ্রহ অভিযান চলে। গণ-স্বাক্ষর সহ প্রস্তাবের মাধ্যমে পরিষদের বক্তব্য সমর্থিত হয়।

মাড়তলা বাণী পাঠাগার, মেদিনীপুর।

মেদিনীপুর জেলার ডেব্‌রা থানার অন্তর্গত মাড়তলা বাণী পাঠাগারে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালিত হয়। সকালে প্রভাত ফেরীর পর গ্রন্থাগারটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করা হয়, এবং বিভিন্ন পুরাতন ও নূতন গ্রন্থাদি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগারের উন্নতি তথা স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রন্থাগার সুখী করে তোলার জন্য সদস্য ও

স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে বিকালে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সত্যপুর ৩নং অঞ্চলের অঞ্চলপ্রধান শ্রীঅনিল কৃষ্ণ কামিল্যা মহাশয় সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; এবং উক্ত অঞ্চলের গ্রামসেবক শ্রীরামচন্দ্র দে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পাঠাগারের আবশ্যকতা পাঠাগারের উন্নতি, পাঠাগারের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সভায় শ্রীনলিনী রঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ মাইতি প্রভৃতি অন্যান্য বক্তাগণও আলোচনা করেন। নলিনীবাবু বলেন যে, পাঠাগার হইল একটি বহুমুখী শিক্ষার আধার, এখানে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই আনায়াসে বহুবিধ জ্ঞানলাভে সক্ষম হবেন, তিনি এই পাঠাগারের উন্নতিকল্পে জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান। পরে পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীগজেন চক্রবর্ত্তী ভাষণ দেন এবং ঐ সভায় পরিষদ প্রচারিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

———

বার্তা বিচিত্রা

কানপুর পাব্লিক লাইব্রেরী

কানপুরে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। কানপুর পৌর প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্যে একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। উত্তর প্রদেশ রাজ্য সরকারও ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে এককালীন দান হিসাবে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। স্থানীয় জনসাধারণও গ্রন্থাগার তহবিলে একলক্ষ টাকা দান করেছেন। ১৯৬৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত এই গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন।

কিং এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল বিল্ডিংস এ এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এর সমস্ত আসবাব পত্র ভারতীয় মানস সংস্থার নির্ধারিত মান অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে। গ্রন্থাগারের আসবাব পত্র সম্পর্কিত মানটি হ'ল Is : 1829 (Part I)—1961 Specification for Library Furniture and Fittings: Part I Timber।

গ্রন্থাগারটি সংগঠিত করতে আর যে দুটি মানের সাহায্য গৃহীত হয়েছে তা হ'ল :

(১) Is : 1553-1960 Code of Practice Relating to Primary Elements in the Design of Library Building.

(২) Is : 1883—1961 ষ্টীলের পুস্তক মঞ্চ প্রস্তুত করার জন্য এই মানটি অনুসরণ করা হয়েছে।

ভারতীয় মানক সংস্থার কানপুর শাখা গ্রন্থাগার সংগঠনে সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

সূত্র : ISI bulletin. Vol. I5 ; 1963 ; 279-281

পুস্তক ফেরৎ না দেবার অপরাধে

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে এক মধ্য রাত্রে পুলিশ তের জনকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে এঁরা পুস্তক ঋণ নিয়েছিলেন কিন্তু ফেরৎ দেননি।

অন্য কোন দেশে এই ধরণের অপরাধীদের এত চরম দণ্ড দেওয়া হয় না বোধ হয়। গ্রেট বৃটেনে প্রতি বৎসর প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের পুস্তক গ্রন্থাগারে ফেরৎ আসে না।

জরিমানার ভয়ে অনেক পাঠক পুস্তক ফেরৎ দিতে আসেন না। জরিমানা করা হবে না এই অভয় দানের ফলে দেখা যায় দীর্ঘকাল বাদে অনেক পুস্তক আবার জমা পড়েছে। এই ধরণের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য :

নরউইচে ষোল বৎসর বাদে একজন ২৯০ খানি পুস্তক ফেরৎ দিয়েছিলেন। বেডফোর্ড-শায়ারের লুটনে অবশ্য জরিমানা রেহাই ঘোষণা সত্ত্বেও ৪০ হাজারের মধ্যে মাত্র ৩০০ খানি পুস্তক ফেরৎ পাওয়া যায়। নিউ হ্যাম্পশায়ারস্থ এক গ্রন্থাগারে ৫৮ বৎসর পরে একখানি পুস্তক ফেরৎ আসে। [সূত্র : রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা]

প্রাক্তন রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রাজভবন থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একখানি পুস্তক উদ্ধার করে ফেরৎ দেবার ঘটনাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসের গ্রন্থপঞ্জী

কাউন্সিল অফ সায়েন্টেফিক এ্যাণ্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের উদ্যোগে একটি "বিজ্ঞানের ইতিহাস বিভাগ" স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থাটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুঁথির একটি পঞ্জী সংকলণ করবেন। এর ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের ইতিহাস রচিত হবে। এবং বিজ্ঞানের সামজিক দিক এবং ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হবে।

কেনেডী স্মরণে

কেনেডীর স্মৃতি রক্ষার জন্য গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। নিউইয়র্কের North Bellemore-স্থ সাধারণ গ্রন্থাগারে কেনেডীর নামে আমেরিকার ইতিহাসের একটি পৃথক সংগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমেরিকার প্রকাশকগণও কেনেডীর স্মরণে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য বিদেশস্থ বিভিন্ন Peace Corps এর মারফৎ পুস্তক বিতরণ করতে মনস্থ করেছেন। উদ্যোক্তাগণ আশা করেন যে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ সমন্বিত অন্ততঃ চারটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা সম্ভব হবে।

অশ্লীল সাহিত্য বিতরণের দায়ে

ফিলাডেলফিয়ার *Eros* নামক পত্রিকার প্রকাশক Ralph Ginzburg (বয়স ৩৪) সম্প্রতি অশ্লীল সাহিত্য বিতরণের অপরাধে কারাদণ্ড এবং ৪২ সহস্র ডলার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত

হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'ল যে এই সমস্ত সাহিত্য মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি এবং যুবসমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অনুরূপ অপরাধে লণ্ডনের Mayflower Books কর্তৃক প্রকাশিতব্য *Fanny Hill, Memoirs of a Woman of Pleasure* নামক বহু বৎসর পূর্বে লিখিত পুস্তকের প্রচার নিষিদ্ধ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি London Comiitee Against Obscenity নামক নব গঠিত সংস্থা অশ্লীল সাহিত্য প্রচার বন্ধ করবার জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন দাবী করেছেন। তাঁদের মতে আমেরিকা থেকে এই ধরণের সাহিত্য গ্রেট বৃটেনে সরবরাহ করা হয়।

রোগ নিরাময়ে পুস্তক

Bibliotherapy বিষয়টি গ্রন্থাগার জগতে একটি নতুন সংযোজন। আমেরিকার *Library Trends* (October, 1962) এই বিষয় সম্বন্ধে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির ভিত্তিতে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এর বার্ষিক সম্মেলনের প্রাকালে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক

FOSKETT (D J). *Classification and indexing in the social sciences.* London, Butterworths, 1963. 200 p. 35s.

বর্গীকরণ সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামতের জন্য Foskett এর খ্যাতি আছে। ইনি বর্গীকরণ সম্বন্ধে রঙ্গনাথনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত। লণ্ডনের Classification Research Group এর অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন Foskett। তিনি যখন Metal Box এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন (বর্তমানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Education এর গ্রন্থাগারিক) তখন কোলন বর্গীকরণ থেকে F53-Food Technology বিষয়টির একটি পরিবর্ধিত তালিকা সংকলন করে নিজ গ্রন্থাগারে প্রয়োগ করেন। ILO-র আমন্ত্রণে তিনি Occupational Safety and Health Documents Classification Scheme সংকলন করেন। এটি কোলন বর্গীকরণের মূল নীতির (Faceted Classification) ভিত্তিতে রচিত। ILO সাফল্যের সাথে এই বর্গীকরণ পদ্ধতির সহায়তায় বিভিন্ন দেশে এই বিষয় সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সারাংশ সম্বলিত বর্গীকৃত সূচী প্রকাশ করছেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত সমাজ বিজ্ঞানের প্রবন্ধাদি বর্গীকরণ এবং সূচীকরণ সমস্যা সম্পর্কিত পুস্তকখানি বর্গীকরণ সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রথমে বিষয় সূচীকরণের সাংগঠনিক দিক এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যাদির ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রচলিত বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলিতে সমাজ বিজ্ঞানের স্থান এবং বিভিন্ন documentation সংস্থা অনুসরিত সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত সমকালীন সাহিত্যের বিষয় বিশ্লেষণ রীতির পরীক্ষান্তে সমাজ বিজ্ঞানের জন্য বিশেষ বর্গীকরণ তালিকা প্রস্তুতের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

SEWELL (P H), **ed.** *Five year's work in Librarianship* 1956-1960. London, Library Association, 1963. 567 p.

গ্রেট বৃটেনের লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের year's work in librarianship গ্রন্থাগার জগতের গতি প্রগতির একটি মূল্যবান বার্ষিক দলিল। প্রতি বৎসর বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ পর্যালোচনা করেন। যেমন, বর্গীকরণ সম্বন্ধে Sayers এর সুচিন্তিত অভিমতসহ প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। ১৯৫১ সাল থেকে এই বর্ষপঞ্জীটি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রকাশিত হতে সুরু করেছে। পূর্ববর্তী প্রকাশনটি ১৯৫১-৫৫ সালের জন্য এবং বর্তমান প্রকাশনটি ১৯৫৬-৬০ সালের জন্য।

প্রত্যেক রচনার অন্তে রচনাপঞ্জীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান।

———

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের সমস্যা

পুণায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম ইয়াসলিক সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল ভারতের গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ। আলোচনায় উপস্থাপিত ১৭টি প্রবন্ধের সারাংশ প্রতিনিধির মধ্যে বিতরিত হয়েছিল।

অধিকাংশ প্রবন্ধ সুরু সর্বভারতীয় এবং রাজ্য ভিত্তিক পরিষদ সমূহের ইতিহাস দিয়ে। অনেক লেখকই কয়েকটি পরিষদ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেননি; তাঁদের প্রবন্ধে কিছু ত্রুটি পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে হয়তো কোন লেখক ত্রুটিপূর্ণ তথ্যকে অভ্রান্ত বলে ইতিহাস রচনা করবেন। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের তারিখ কোন কোন প্রবন্ধে ১৯২৯, ১৯২০, ১৯২৫ বলে উল্লেখিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বরোদা গ্রন্থাগার পরিষদ সৃষ্টির তারিখ ১৯১০ এবং ১৯২৬ বলে উল্লেখিত হয়েছে।

পরিষদ সমূহের দায়িত্ব এবং কর্মধারা সম্বন্ধে কোন কোন প্রবন্ধে আলোচনা হয়েছে। গ্রেটবৃটেন এবং আমেরিকার পরিষদসমূহের মানদণ্ডে এই সমস্ত পরিষদের বিচার করা হয়েছে। সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে রাজ্যভিত্তিক পরিষদ সমূহের কি সম্পর্ক থাকা উচিত সে সম্বন্ধেও মতামত প্রকাশিত হয়েছে। পরিষদ উদ্যোগে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত নয় এরূপ মন্তব্যও আছে।

প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার পরিষদের সমস্যা গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তি সম্বন্ধে অনীহা নয়? এর সঙ্গে আছে পরিষদের কর্মপরিচালনায় যথোপযুক্ত অর্থাভাব। অধিকাংশ পরিষদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মীর উৎসাহের ফলে পরিষদটি জীবিত থাকে। দৈনন্দিন ধরা বাঁধা কাজ কর্মের জন্য অর্থাভাবে কোন কর্মী নিয়োগ সম্ভব হয় না। ফলে তাঁরাই কায়ক্লেশে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তিকা বহন করে চলেন। কোন সুসংবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ সম্ভব হয় না।

শক্তিশালী গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমেই গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভবপর—তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

পরিষদের অর্থের সূত্র হ'ল সদস্যদের চাঁদা। সরকারী সাহায্য তো ভাগ্যের কথা। কিন্তু অধিকাংশ পরিষদের কর্মকর্তাদের অভিমত হ'ল যে অনেক সদস্য নিয়মিত চাঁদা পরিশোধে তৎপর নন। প্রতিবৎসর গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে যোগদানকারীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। কিন্তু পরিষদের নতুন সদস্যের সংখ্যার হার সেই তুলনায় অনেক কম।

কর্মীর অভাবে নতুন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের "লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী"টির বিলম্বিত প্রকাশের কারণ মুখ্যতঃ কর্মীর অভাব। সম্প্রতি প্রকাশিত ডাইরেক্টরীটি এক নজরে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে যে এই বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ, বাছাই, বিন্যাস এবং মুদ্রণের সমস্যা কি বিরাট। অথচ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগঠনে এই ডাইরেক্টরীটি একখানি মূল্যবান সহায়ক।

নতুন যাঁরা এই বৃত্তি গ্রহণ করেছেন তাঁরা কি পরিষদের বহুমুখী সমস্যার অন্ততঃ এই দিকটি সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন?